banglabooks.in

উপন্যাস

উত্তাল সময়ের ইতিকথা

pathagar.net

প্রফুল্ল রায়

এই উপন্যাস 'কেয়াপাতার নৌকো' ও 'শতধারায় বয়ে যায়'-এর পরবর্তী পর্ব। কাহিনির মূল চরিত্র বিনয় পূর্ব-বাংলার উদ্বাস্তুদের সঙ্গে আন্দামানে চলে এসেছে। দক্ষিণ আন্দামানের দু-প্রান্তে এমন অঞ্চলে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়েছে যার চারদিকে গভীর অরণ্য আর সমুদ্র। জঙ্গলে রয়েছে এখানকার আদিম জনগোষ্ঠী জারোয়ারা, সমুদ্রে হিংস্র হাঙরের দল। রয়েছে কালাপানির সাজা নিয়ে যারা ব্রিটিশ আমলে আন্দামানে এসেছিল তাদের ছোট ছোট কলোনি। অরণ্য নির্মূল করে ছিন্নমূল মানুষ অনন্ত পরিশ্রমে গড়ে তুলছে তাদের নতুন বাসভূমি। বিনয় এদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। সে জেনেছে ঝিনুক এসেছে অনেক দূরের মধ্য আন্দামানে। তাকেও খুঁজছে সে। অপরাজেয় মানুষের অনন্য সংগ্রামের কাহিনি 'উত্তাল সময়ের ইতিকথা'। এখানে তার একটি অংশ প্রকাশিত হল।

বিনয় তাকিয়েই আছে, তাকিয়েই আছে। পলকহীন। বুঝিবা শত বর্ষ ধরে।

সামনের দিকে যতদূর চোখ যায়, ছোট বড় মাঝারি—চৌকো, তেকোণা, লম্বাটে, নানা আকারের কত যে দ্বীপ! সবই জনহীন, নিঝুম। একসময় ঝিনুকদের নিয়ে 'স্টিমশিপ চলুঙ্গা' একটা দ্বীপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

banglabooks.in

অগুনতি দ্বীপ, প্রতিটি দ্বীপে উঁচুনিচু পাহাড়। পাহাড়গুলোর গায়ে ডালপালাওয়ালা প্রাচীন মহাবৃক্ষের সারি। আকাশে উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে সি-গাল। এত গাছ, এত পাখি, সমুদ্র থেকে মাথা তুলে থাকা এত দ্বীপ! তবু বিনয়ের মনে হয়, বিশাল সমুদ্র জুড়ে হঠাৎ অপার শূন্যতা নেমে এসেছে। আর সেই শূন্যতা তার বুকের ভেতরেও ছড়িয়ে পড়েছে।

কতক্ষণ পর খেয়াল নেই, বিনয়ের চোখ চলে যায় পশ্চিম দিকটায়। উপসাগর, যার নাম সেসোস্ট্রেস বে—তার ওপারে যে পাহাড়টা অন্য সব পাহাড়ের মতোই গাছ-গাছালি ঝোপঝাড়ে লতাপাতায় তীব্র সবুজ হয়ে আছে সেটাকে খুব চেনা চেনা মনে হল। আন্দামানের মানচিত্রে এর ছবি দেখেছে বিনয়। নিশ্চয়ই মাউন্ট হ্যারিয়েট। একটা ধবধবে সাদা ক্রস ওটার চূড়োয় সটান দাঁড়িয়ে আছে। আবছাভাবে বিনয়ের মনে পড়ে, আঠারোশো বাহাত্তরে পরাধীন ভারতের ভাইসরয় লর্ড মেয়ো এই দ্বীপমালায় নির্বাসিত বন্দিরা কী ধরনের দুর্দশা আর নির্যাতনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, স্বচক্ষে দেখার জন্য এখানে এসেছিলেন। এক পাঠান কয়েদি, শের খান, মাউন্ট হ্যারিয়েটের তলদেশে, সমুদ্রের ধারে তাঁকে হত্যা করে। ক্রসটা বছরের পর বছর নীরবে সেই শোকের বার্তা ঘোষণা করে চলেছে।

এদিকে 'রস' দ্বীপের ধার ঘেঁষে উপসাগরের জল ফুঁড়ে ফুঁড়ে লাফিয়ে উঠছে শ'য়ে শ'য়ে উড়ুক্কু মাছ। রুপোলি ঝিলিকের ম্যাজিক তৈরি করে পনেরো কুড়ি ফিট দূরে ফের সমুদ্রে ঝাঁপ দিচ্ছে। উড়ন্ত মাছেদের এই খেলাটা চলছে অবিরাম। ক্লান্তিবিহীন।

বিনয় যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে বাঁ ধারে কোনাকুনি উপসাগরের ওপারে চড়াই-উতরাইতে ঢেউ খেলানো শহর পোর্ট ব্লেয়ার। তারই একটা উঁচু টিলার মাথায় সেলুলার জেল। আকাশ-ছোঁওয়া একটা টাওয়ার মাঝখানে রেখে সেটার গা থেকে পাঁচ দিকে পাঁচটা লাল রঙের বিশাল তেতলা উইং বা ইমারত চলে গেছে। এগুলোর প্রতিটি তলায় সেলের পর সেল। মোটামুটি সাত

banglabooks.in

ফিট বা ছ'ফিট মাপের একেকটা খুপরি। উনিশশো পঁয়তাল্লিশের আগে মোট উইং ছিল সাতটা। জাপানি বোমায় দু'টো পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পরই ইংরেজরা সাত সমুদ্র তেরো নদীর এপারের ভারতীয় কলোনি থেকে চাটিবাটি গুটিয়ে চলে গেছে। দেশ এখন স্বাধীন। তবু আদিগন্ত কালাপানির মাঝখানে দক্ষিণ আন্দামানের রুক্ষ, ভীতিকর, দমবন্ধ করা এই বন্দিশালার দিকে তাকালে বুকের ভেতরটা আমূল কেঁপে যায়। কুখ্যাত এই জেলখানা ঘিরে হাড় হিম করা নানা ঘটনা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারও জানতে বাকি নেই। ব্রিটিশ রাজত্বের অসীম দম্ভ এবং নির্যাতনের স্মৃতিস্তম্ভ এই সেলুলার জেল। আন্দামান নিয়ে যত বই বেরিয়েছে তার প্রায় সবগুলোতেই এর ছবি চোখে পড়বে। একেকটা শহরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে চোখ ধাঁধানো প্রাচীন কোনও সৌধ বা অন্য কোনও ল্যান্ডমার্ক যা দেখলে লহমায় শহরটাকে চিনে নেওয়া যায়। প্যারিসের যেমন আইফেল টাওয়ার, লন্ডনের বিগ বেন, বম্বের গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া বা কলকাতার হাওড়া ব্রিজ। আন্দামানের তেমনি সেলুলার জেল।

জেলখানাটার অনেকটা নিচে, উপসাগরের ধার ঘেঁষে আঁকাবাঁকা রাস্তা ডাইনে এবং বাঁয়ে বহুদূর চলে গেছে। সেখানে কিছু লোকজন চোখে পড়ছে। দূর থেকে ছোট ছোট পুতুলের মতো মনে হয়। যেন মানুষের বনসাই।

উপসাগর থেকে হুহু করে উঠে আসছে তুমুল ঝোড়ো বাতাস; 'রস' আইল্যান্ডের সারি সারি নারকেল গাছগুলোর ঝুঁটি ধরে সমানে ঝাঁকিয়ে চলেছে।

সমুদ্র, পাহাড় এবং হাজার হাজার বছরের মহা অরণ্য দিয়ে সাজানো এই দ্বীপপুঞ্জের চারিদিকে কত অবাক করা দৃশ্য, হাওয়ার সাঁই সাঁই অবিরল শব্দ—কিছুই শুনতে বা দেখতে পাচ্ছে না বিনয়। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায়, পাক খেয়ে খেয়ে নিরুদ্দেশে চলে যাওয়া অসংখ্য গলিঘুঁজির গোলকধাঁধায়, কলকাতার সীমানা ছাড়িয়ে উদ্বাস্তুদের কলোনি আর রিলিফ ক্যাম্পগুলোতে ভোর হতে না হতেই উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে গেছে। পাগলের মতো খুঁজে বেড়িয়েছে ঝিনুককে। না, তাকে পাওয়া যায়নি। হতাশ, ব্যর্থ, হা-ক্লান্ত বিনয় ফিরে এসেছে সন্ধের পর। দিনের পর দিন। তারপর ধীরে ধীরে কবে যেন ঝিনুকের মুখ স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে গেছে। তার জন্য সারাক্ষণ যে আবেগে বুকের ভেতরটা উতরোল হয়ে থাকত তার তীব্রতা ক্রমশ জুড়িয়ে এসেছে। যে মেয়ে নিজের ইচ্ছায় হারিয়ে গেছে তার জন্য কতকাল আর একইরকম ব্যাকুলতা টিকে থাকে? 'নতুন ভারত'-এ চাকরি নেবার পর সে বিনয়ের জীবনের নতুন পরিধি থেকে দূরে, আরও দূরে সরে যাচ্ছিল।

কিন্তু চকিতের জন্য সে দিন খিদিরপুরের বাইশ নম্বর ডেকে ঝিনুককে দেখার পর পুরনো ব্যাকুলতা বুকের গভীর স্তর খুঁড়ে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। জাহাজের খোলে হাজারটা ছিন্নমূল মানুষের ভেতর আতিপাতি করে তার সন্ধান করেছে বিনয়। না, তাকে পাওয়া যায়নি। পরে বিনয় ভেবেছে, হয়তো চোখের ভুল, নেহাতই ক্ষণিকের বিভ্রম। হয়তো মুখের আদলে খানিকটা মিল আছে, তাই মনে হয়েছে ঝিনুক। বিনয় নিজেকে বোঝাতে চেয়েছে, সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আন্দামানেই যাবে কেন ঝিনুক? কার সঙ্গেই বা যাবে? কলকাতার মতো মহানগরে তার চেনাজানা এমন কেউ নেই যার সঙ্গে সে আন্দামানের জাহাজে উঠতে পারে।

কিন্তু এই কিছুক্ষণ আগে বিনয়ের সব ভ্রান্তি কেটে গেছে। অন্য কেউ নয়, ঝিনুকই ইস্টার আইল্যান্ড সারভিসের 'চলুঙ্গা' জাহাজে পাঁচশো উদ্বাস্তুর সঙ্গে মিডল আইল্যান্ডে চলে গেল।

কে বলে পুরনো আবেগ মরে যায়? তা-ই যদি হত, হৃৎপিণ্ড এত উথাল পাথাল হচ্ছে কেন? কেনই বা শিরাস্নায়ু ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছত্রখান হয়ে যাচ্ছে? একটা দম-আটকানো কষ্ট ডেলা পাকিয়ে গলার কাছে আটকে গেছে। তারই মধ্যে বিনয় ভাবছিল, যেমন করে হোক মিডল আন্দামানে ঝিনুকের কাছে তাকে যেতেই হবে। কাল হোক, পরশু হোক বা দশ বিশ দিন পরে। ঝিনুকের সঙ্গে দেখা তো করবেই, তাকে না নিয়ে কলকাতায় ফিরবে না। হঠাৎ দূর থেকে ভট ভট শব্দ কানে এল। চমকে বিনয় দেখতে পায়, সেসোস্ট্রেস বে আধখানা বৃত্তের আকারে বেঁকে যেখানে সেলুলার জেলের তলা দিয়ে ডাইনে বহু দূরে চলে গেছে সেখান থেকে দু'টো বড় লঞ্চ এদিকে এগিয়ে আসছে।

পেছন থেকে কেউ ডেকে ওঠে, 'বিনয়বাবু, বিনয়বাবু—'

ঘাড় ফেরাতেই চোখে পড়ে—নিরঞ্জন। সে বলল, 'আপনের মালপত্র গোছগাছ কইরা রেডি হন। লঞ্চ আইতে আছে। এইবার পোর্ট ব্লেয়ার টাউনে যামু—'

মালপত্র আর কী। একটা চামড়ার স্যুটকেস, মাঝারি একটা হোল্ড-অলে তোশক, হাওয়া বালিশ, কম্বল, চাদর আর মশারি গুছিয়ে বেঁধে দিয়েছে 'শান্তিনিবাস' মেসের সুবল। সেগুলো গার্ডেন আমব্রেলা ধরনের মস্ত একটা ছাতার তলায় একধারে রেখে দিয়েছে বিনয়। সে অন্যমনস্কর মতো পা ফেলে ফেলে তেজি রোদ ঠেকাতে যেখানে গার্ডেন আমব্রেলাগুলো ডানা মেলে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে এগিয়ে গেল।

এদিকে বিভাস এবং উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের চার পাঁচজন কর্মী মুখে টিনের চোঙা লাগিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে শরণার্থীদের সমানে তাড়া দিচ্ছিল। পোর্ট ব্লেয়ার যেতে হবে। পনেরো কুড়ি মিনিটের ভেতর সবাই যেন প্রস্তুত হয়ে নেয়। নিরঞ্জন বিনয়কে যা বলেছে, বিভাসরা ঠিক তা-ই বলছে উদ্বাস্তুদের।

কলকাতা থেকে আসার পথে সমুদ্রে সাইক্লোনের মুখে পড়েছিল বিনয়দের জাহাজ 'এস এস মহারাজা'। তুমুল রোলিং জাহাজের খোলে হাজারখানেক উদ্বাস্তুকে অবিরল একবার ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে, পরক্ষণে নিচে আছড়ে ফেলে, দুমড়ে মুচড়ে তাদের শরীরগুলোকে ময়দা ঠাসার মতো তালগোল পাকিয়ে ছেড়েছিল। যা খেয়েছিল পাকস্থলী থেকে হড়হড় করে বমি হয়ে ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। পরে সমুদ্র শান্ত হলেও তারা এতটাই কাহিল হয়ে পড়ে যে খাওয়ার কোনওরকম ইচ্ছাই ছিল না; বাঙ্কে চোখ বুজে নির্জীব শুয়ে থেকেছে তারা।

কিন্তু 'রস' আইল্যান্ডে পৌঁছবার পর পায়ের তলায় মাটি পেয়ে খিদেটা ফের ফিরে আসে। পেট জ্বলে যাচ্ছিল তাদের। যেন দাউদাউ আগুন জ্বলছে। জাহাজেই চানটান সেরে নিয়েছিল। 'রস'-এ নেমে ভাত ডাল মাছ তরকারি দিয়ে গলা অবধি ঠেসে তবে শান্তি। খাওয়াদাওয়া চুকলে ভালো করে যে জিরিয়ে নেবে তেমন ফুরসত পাওয়া যায়নি। এর মধ্যে ছ' ছ'টা বিয়ে হল। তারপর শ' পাঁচেক উদ্বাস্তু তুলে নিয়ে 'চলুঙ্গা' জাহাজ মিডল আন্দামানে চলে গেল। বাকি যারা রইল, এতসব ঘটনার পর অপার ক্লান্তিতে তাদের চোখ জুড়ে এসেছে। ঝাড়ালো প্যাডক কি চুগলুম গাছের ছায়ায়, কিংবা বিরাট বিরাট পাথরের চাঁইয়ের আড়ালে—যে যেখানে পেরেছে, শুয়ে পড়েছে।

বিভাসদের হাঁকাহাঁকিতে তারা ধড়মড় করে উঠে বসে। তারপর কলকাতার রিলিফ ক্যাম্পগুলো থেকে পার্থিব সম্পত্তি বলতে—টিনের তোবড়ানো বাক্স, কাঁথাকানি, ছেঁড়া শতরঞ্চিতে জড়ানো বিছানা, হাতা খুন্তি কড়াই—যে যেটুকু পেরেছে নিয়ে এসেছে, সব জড়ো করে নিল।

এদিকে উপসাগরের জল তোলপাড় করে, গম্ভীর ভোঁ বাজিয়ে সেই লঞ্চ দু'টো 'রস' আইল্যান্ডের জেটিতে এসে ভিড়ল। দুই লঞ্চেরই খালাসিরা লোহার শেকল দিয়ে জলযান দুটোকে জেটির মোটা মোটা লোহার থামের সঙ্গে বেঁধে ফেলল। তারপর রেলিং লাগানো চওড়া কাঠের পাটাতন ফেলে লঞ্চের সঙ্গে জেটি জুড়ে দিল। এই ছোট পুল দিয়ে লঞ্চে উঠতে হবে।

বিভাস, নিরঞ্জন এবং রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টের ছেলেরা দারুণ করিৎকর্মা। হাতে পায়ে তাদের যেন বিদ্যুৎ খেলতে থাকে। ছোটাছুটি এবং হাঁকডাক করে উদ্বাস্তুদের জেটির কাছে জড়ো

banglabooks.in

করে একে একে তাদের লঞ্চে তুলতে লাগল। সমস্ত কাজটার মধ্যে রয়েছে নিখুঁত শৃঙ্খলা।

একটা লঞ্চ বোঝাই হয়ে গেলে বিভাস সেটায় উঠে পড়ে। লঞ্চটার নাম 'সিগাল'। 'সিগাল' আর দাঁড়াল না, জল কেটে কেটে পোর্ট ব্লেয়ারের দিকে চলে গেল।

প্রথম লঞ্চটা চলে যাবার পর পরের লঞ্চ 'নটিলাস'-এ একই প্রক্রিয়ায় উদ্বাস্তুদের তুলে ফেলল নিরঞ্জনরা। সবাই উঠলে আন্দামানের চিফ কনজারভেটর অফ ফরেস্ট ব্রজদুলাল মণ্ডল, চিফ মেডিকেল অফিসার ডাক্তার চট্টরাজ, হারবার মাস্টার সোমনাথ সেন, ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট ও রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টের ইন-চার্জ বিশ্বজিৎ রাহা এবং আরও কয়েকজন বড় মাপের অফিসার।

অফিসার এবং পুনর্বাসন দপ্তরের কর্মীরা ছাড়াও পোর্ট ব্লেয়ারের আরও অনেক পুরনো বাঙালি বাসিন্দা উদ্বাস্তুদের স্বাগত জানাতে এসেছিল। বোঝাতে চেয়েছিল বঙ্গোপসাগরের মাঝখানে সুদূর এই দ্বীপপুঞ্জে পূর্ব পাকিস্তানের ছিন্নমূল মানুষগুলোকে নির্বাসনে পাঠানো হয়নি। এখানেও তাদের অগুনতি শুভাকাঙ্ক্ষী রয়েছে। সবসময় আত্মীয় পরিজনের মতো এরা পাশে থাকবে। দুটো মোটরলঞ্চে এই আন্দামানবাসী বাঙালিদের জায়গা হয়নি। 'রস' আইল্যান্ডের জেটিতে একজোড়া মোটর বোট বাঁধা রয়েছে। ছোট জলযান দুটো তাদের নিয়ে আসবে।

যে দুই স্টিম লঞ্চ উদ্বাস্তুদের নিয়ে সেসোস্ট্রেস বে'র জল কেটে কেটে এগিয়ে চলেছে তার একটার নাম 'সি-গাল', অন্যটা 'নটিলাস'। এই তো সবে ইংরেজ রাজত্বের অবসান হল। তাদের দেওয়া লঞ্চের নামগুলো এখনও টিকে আছে।

'নটিলাস'-এর দোতলার ডেকে রেলিং ধরে দূরমনস্কর মতো তাকিয়ে ছিল বিনয়। চারপাশের দৃশ্যাবলি ছাপিয়ে একটি মুখ স্থিরচিত্রের মতো চোখের সামনে কোনও অদৃশ্য ফ্রেমে আটকে আছে। পেছন থেকে কেউ ডেকে উঠল, 'ছুটোবাবু—'

ঘুরে দাঁড়াতেই বিনয়ের চোখে পড়ল হলধর সূত্রধর। বুড়োটে, কুঁজো ধরনের লোকটার আদি বাড়ি ছিল রাজদিয়ার কাছাকাছি একটা গ্রাম—গিরিগঞ্জে। দেশে থাকতে মাঝে মাঝে হেমনাথের কাছে আসত সে। দেশভাগের পর কোথায় ছিটকে পড়েছিল, বিনয় জানে না। অনেক কাল বাদে এই সেদিন দমদমের এক ত্রাণশিবিরে তার সঙ্গে দেখা। তারপর স্টিমশিপ 'মহারাজা'য়। তারপর 'নটিলাস' লঞ্চে।

বিনয় জিগ্যেস করে, 'কিছু বলবেন?'

'হ—' আস্তে মাথা নাড়ে হলধর।

সামান্য কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকে বিনয়।

হলধর বলে, 'শুনাশুন একহান কথা কানে আইছে।'

'কী?'

'আমাগে নিকি (নাকি) পুট বিলাসে (পোর্ট ব্লেয়ার) রাখব না। মেলা (অনেক) দূরে জঙ্গলে লইয়া যাইব। হেগুলা (সেসব) কেমুন জাগা (জায়গা), কেঠা জানে।'

খবরটা নতুন নয়। নিরঞ্জন আগেই বিনয়কে জানিয়েছে, পোর্ট ব্লেয়ার শহর থেকে তিরিশ-চল্লিশ মাইল পশ্চিমে উদ্বাস্তুদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়েছে। বসানো হচ্ছে গ্রামের পর গ্রাম। পূর্ব বাংলার ছিন্নমূল মানুষদের বাসস্থান। সেই এলাকাগুলো ঠিক কী ধরনের সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা নেই বিনয়ের।

হলধর বলতে লাগল, 'হোনলাম (শুনলাম) যেইহানে আমাগো লইয়া যাইব হের (তার) চাইর পাশে আলিসান আলিসান জঙ্গল। জংলি জারোরা (জারোয়ারা) কাছাকাছিই থাকে। বিষমাখা তির ফ্যাকে (ছোড়ে)।'

বিনয় রীতিমতো অবাক। গিরিগঞ্জের হলধর সূত্রধর, যে কোনওদিন স্কুলের ধারাকাছে ঘেঁষেনি, অক্ষরপরিচয়হীন বেজায় সাদাসিধে, দেশভাগের আগে বিক্রমপুরের চৌহদ্দির বাইরে কখনও কোথাও যায়নি, বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে 'রস' আইল্যান্ডে পৌঁছেছিল। এখন স্টিমলঞ্চ 'নটিলাস'-এ পোর্টব্লেয়ার চলেছে। এই সময়টুকুর মধ্যে কত তথ্যই না সংগ্রহ করে ফেলেছে।

হলধর থামেনি। 'জারোরা নিকি কয়জন 'রিফুজ'রে মাইরা ফালাইছে। ছুটোবাবু, ডরে বুক কাপে।'

হলধরকে বিনয়ের সঙ্গে কথা বলতে দেখে আরও পনেরো-কুড়িজন উদ্বাস্তু ডেকের নানা দিক থেকে চলে এসেছে। সবারই মুখ চেনা। দু-চার জনের নামও জানে বিনয়। দেশ থেকে উৎখাত হয়ে হলধরের সঙ্গে এরা দমদমের ত্রাণশিবিরে বেশ কিছুদিন কাটিয়েছে। সবার চোখেমুখে গভীর উৎকণ্ঠার ছাপ। সৃষ্টিছাড়া আদিম অরণ্যে হিংস্র জারোয়াদের পাশাপাশি থাকতে হবে, হলধরের মতো এই খবরটা নিশ্চয়ই তারাও পেয়ে গেছে। এদেরই একজন— মাখন রুদ্রপাল বলল, 'জারোগো হাতে মারণের লেইগা কি গরমেন (গভর্নমেন্ট) আমাগো এই আন্ধারমান দ্বীপি লইয়া আইল ছুটোবাবু?' হলধরের দেখাদেখি দমদম ক্যাম্পের আরও অনেকেই বিনয়কে 'ছুটোবাবু' বলে।

ইন্ডিয়ার মেনল্যান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হাজার মাইল দূরের এই দ্বীপপুঞ্জে জঙ্গলের ভেতর এখানকার আদি বাসিন্দাদের তীরের মুখে শরণার্থীদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেখানেই হবে তাদের নতুন স্থায়ী বাসস্থান, ভাবতেই ভীষণ অস্বস্তি হতে থাকে বিনয়ের। দেশ ছেড়ে চলে আসার পর শিয়ালদা স্টেশনে আর ত্রাণশিবিরে কী নিদারুণ দুর্গতির মধ্যে যে এদের দিন কেটেছে! সেটাকে বেঁচে থাকা বলে না। ক্ষয়ে ক্ষয়ে তারা শেষ হয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ভয়, দ্বিধা কাটিয়ে আন্দামানের জাহাজে উঠেছে। তাদের জানানো হয়েছে সমুদ্রের মাঝখানে তাদের যে নিজস্ব বাসভূমি হবে তা সম্পূর্ণ নিরাপদ, ঝঞ্ঝাটমুক্ত। পূর্ব বাংলার গ্রামে গ্রামে যে জীবন তারা চিরতরে ফেলে এসেছে, ফের তা গড়ে তুলবে অসীম পরিশ্রমে অফুরান মমতায়। যা হারিয়েছে তার বহুগুণ ফিরে পাবে। সমস্ত অনিশ্চয়তা এবং ক্লেশের অবসান ঘটবে। কিন্তু আন্দামানে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে যে সব খবর হলধররা পেয়েছে তাতে ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েছে।

এই যে এতগুলো সর্বস্বহারানো মানুষ ঘোর অনিচ্ছায় সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চলে এসেছে সেজন্য বিনয়ও কম দায়ী নয়। সে হলধরদের বুঝিয়েছে, ত্রাণশিবিরে যৎসামান্য সরকারি খয়রাতের ওপর নির্ভর করে আমেরিকান টমিদের ফেলে যাওয়া ব্যারাকের ঘুপচি কামরায় কামরায় কষ্টে, গ্লানিতে বাকি জীবন কাটানো অসম্ভব। তা ছাড়া তাদের ছেলেমেয়েরা আছে। তাদের ভবিষ্যৎ আছে। এই সন্তান সন্ততিদের কথাও তো ভাবতে হবে। তারা কি চিরকাল ত্রাণশিবিরে নিজেদের গায়ে 'রিফিউজি' তকমা লাগিয়ে কাটিয়ে দেবে? আন্দামানে গেলে উর্বর জমি মিলবে। ধান বোনো, আনাজের চাষ করো, শস্যের লাবণ্যে ভরে যাবে মাঠ। সমুদ্রে আছে অফুরন্ত মাছ, জঙ্গলে হরিণ। একটু খাটলে আমৃত্যু খাদ্যের অভাব হবে না। তাছাড়া তাদের সাহায্য করার জন্য রয়েছে নানারকম সরকারি সাহায্য, অনুদান।

বিনয়ের ধারণা ছিল, পোর্টব্লেয়ার শহরের আশেপাশে উদ্বাস্তুদের গ্রাম বসানো হচ্ছে। কিন্তু এখানে পৌঁছনোর পর অন্যরকম শোনা যাচ্ছে। যদি শরণার্থীরা বিপন্ন হয়ে পড়ে তাদের শেষ অবলম্বনটুকু ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। হঠাৎ মনে পড়ল, এর আগে চার-পাঁচ খেপে কয়েক হাজার শরণার্থীকে এখানে আনা হয়েছে। তারা কোথায় আছে, কেমন আছে, জানা নেই। যদি ভালো না থাকে, নিশ্চয়ই অভিযোগ শোনা যেত। পরক্ষণে খেয়াল হল, ওটা তো কলকাতা শহর নয় যে ভালো বা মন্দ সমস্ত খবর লহমায় লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। পৃথিবীর জনারণ্য থেকে বহুদূরে দুর্গম জঙ্গলের খাঁজের ভেতর উদ্বাস্তুদের আদৌ কোনও সমস্যা হচ্ছে কিনা, হলে কী ধরনের সমস্যা—তা সহজে জানার উপায় নেই। বিনয়ের মনে কিছুটা ধন্দ দেখা দিয়েই চকিতে মিলিয়ে গেল। ছিন্নমূল মানুষগুলো তেমন কোনও সংকটে যদি

banglabooks.in

পড়েই থাকে, সরকারি দপ্তর তার মতো একজন সাংবাদিককে নিশ্চয়ই আন্দামানে পুনর্বাসনের কাজকর্ম দেখাতে নিয়ে যেত না। কেননা, এখান থেকে সে যে প্রতিবেদন লিখে পাঠাবে, তাতে মেনল্যান্ডে সব জানাজানি হয়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গে এর মধ্যেই উদ্বাস্তুদের নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো টানাহ্যাঁচড়া শুরু করে দিয়েছে। রোজই কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় আর পার্কগুলোতে মিছিল, মিটিং, স্লোগান। আন্দামানে এসে শরণার্থীদের দুর্গতির শেষ নেই, সত্যিই যদি তেমনটা হয়ে থাকে আর তা জানাজানি হয়ে যায়, কলকাতায় আগুন জ্বলে যাবে। ত্রাণ শিবিরগুলোতে বা শিয়ালদায় বছরের পর বছর যারা পড়ে আছে তাদের একজনকেও আর আন্দামানের জাহাজে তোলা সম্ভব হবে না। এখানকার পুনর্বাসন প্রক্রিয়া পুরোপুরি বানচাল হয়ে যাবে।

হলধররা একদৃষ্টে বিনয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। বিনয় বলল, 'আপনাদের মতো আমিও শুনেছি জারোয়ারা তাদের কাছাকাছি এলাকায় নতুন কারওকে দেখলে তির ছোড়ে। কিন্তু কলকাতা থেকে নিয়ে এসে আপনাদের বিপদের মধ্যে ফেলে দেওয়া হবে, তা তো আর হয় না। সরকার জারোয়াদের ঠেকাবার জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা কি আর করেনি?'

ঘুরিয়ে একরকম মিথ্যেই বলতে হল। উদ্বাস্তুদের নিরাপত্তার জন্য কোনওরকম বন্দোবস্ত করা হয়েছে কিনা, বিনয়ের জানা নেই। কিন্তু সত্যিটা বললে হলধররা আরও ভয় পেয়ে যাবে। পোর্ট ব্লেয়ারে নেমে হয়তো এমন বেঁকে বসবে যে জঙ্গলে যেখানে তাদের জন্য জমি ঠিক করে রাখা আছে তাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তুমুল হইচই বাধিয়ে একটা বিশ্রী পরিস্থিতি তৈরি করে ফেলবে।

মাখন রুদ্রপাল চতুর লোক। হলধরের পাশ থেকে সে বলে ওঠে, 'মনে লয় (হয়), জারোগো ব্যাপারে সরকার কী ব্যাবোস্তা করছে, আপনে পুরাটা জানেন না।' ডেকের অন্য দিকে, বেশ খানিকটা দূরে, সেনসাহেব, মণ্ডলসাহেব, ডাক্তার চট্টরাজ, বিশ্বজিৎ রাহা এবং আরও কয়েকজন অফিসার কিছু আলোচনা করছিলেন। তাঁদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল মাখন। 'উই ছারেগো (স্যারদের) আমাগো কথা ইট্টু বুজাইয়া কইয়েন ছুটোবাবু। দ্যাশ ছাইড়া আহনের পর কত কষ্ট যে পাইছি হের (তার) লিখাজুখা (লেখাজোখা) নাই। আন্ধারমান দ্বীপি বড় আশা লইয়া আইছি। ওনারা য্যান দ্যাহেন আমাগো এইহানে মরতে না হয়।'

মাখন সার সত্যটা এর মধ্যেই বুঝে গেছে। বিশ্বজিৎ রাহা, মণ্ডলসাহেব, সেনসাহেবরাই তাদের আসল রক্ষাকর্তা। বিনয়ের বেশ মজাই লাগে। বলল, 'আপনারাই গিয়ে ওঁদের বলুন না—'

হলধরের হয়তো মনে হল, বিনয় বিরক্ত হয়েছে। মাখন ফের কী বলতে যাচ্ছিল, গলার স্বর চড়িয়ে তাকে থামিয়ে দিল। —'তুমি চুপ যাও। কারে কী কইতে হয় জানো না। ছুটোবাবু যা ভালা বুঝবেন হেয়া (তা) করবেন।' বিনয়কে বলল, 'আপনেই আমাগো বলভরসা। মাখনার কথায় কিছু মনে কইরেন না।'

বিনয় একটু হাসল। সরকারি অফিসারদের কাছে তাদের হয়ে দরবার করার জন্য মাখন যে তাকে ধরেছে তাতে হলধর খুবই অসন্তুষ্ট এবং বিব্রতও। বিনয়ের ওপর তার অগাধ আস্থা। যা যা করলে এই অজানা দ্বীপপুঞ্জে তাদের নতুন জীবন হবে অবাধ, ভয়শূন্য আর নিশ্চিন্ত, রাজদিয়ার হেমকর্তার নাতি তাই করবে। সাউকারি করে মাখনের পরামর্শ দেবার দরকার নেই।

হলধর বলল, 'একহান কথা জিগামু ছুটোবাবু? আস্তে মাথা নাড়ে বিনয়। —'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

দূরে বিশ্বজিৎ রাহাকে দেখিয়ে হলধর বলল, 'তেনি তহন (তিনি তখন) পুট বিলাসে (পোর্ট ব্লেয়ার) তেনার বাড়িত্ আপনেরে থাকনের কথা কইলেন।'

বিনয় অবাক। 'রস' আইল্যান্ডে 'মহারাজা' জাহাজ থেকে নামার পর জগদীশ গুহঠাকুরতার চিঠি বিশ্বজিৎকে দেবার পর তিনি যে তাকে তাঁর বাংলোতে থাকার কথা বলেছিলেন সেটা তাহলে লক্ষ করেছে হলধর!

বিনয় বলল, 'হ্যাঁ, বলেছেন তো—'

হাতজোড় করে হলধর বলল, 'আপনেরে কিলাম আমরা ছাড়ুম না ছুটোবাবু। আপনের ভরসাতেই আন্ধারমানে আইছি। আমাগো লগে আপনেরে জঙ্গল যাইতেই লাগব।' নাইলে পুট বিলাস থিকা আমরা এক পাও লড়ুম (নড়ব) না।'

তার সঙ্গীরা একই কথা বলে। এমনকী মাখনও।

আন্দামানের বিজন অরণ্যে বিনয়ই তাদের একমাত্র অবলম্বন। খড়কুটোর মতো তাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে হলধররা। লহমার জন্য চোখের আড়াল করতে চায় না।

যেখানে যেখানে উদ্বাস্তুদের বসতি গড়ে উঠছে সেইসব এলাকায় যাবার জন্যই বিনয়ের আন্দামানে আসা। বিশ্বজিতের সঙ্গে আলাপ হবার পর ভেবেছিল, দু-একদিন পোর্ট ব্লেয়ারে তাঁর বাংলোয় থাকবে। এখানকার পুনর্বাসন সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে নিশ্চয়ই প্রচুর তথ্য পাওয়া যাবে। কেননা রিহ্যাবিলিটেশনের বেশির ভাগ দায়িত্বই তাঁর। কিন্তু হলধররা তাকে কিছুতেই ছাড়বে না। সে বিশ্বজিতের বাংলোয় গেলে ওদের মনোবল ভেঙে পড়বে। তার ওপর এত মানুষের এত বিশ্বাস তুচ্ছ করার বস্তু নয়।

বিনয় বলল, 'ঠিক আছে, আপনাদের সঙ্গেই যাব।'

চারপাশের মুখগুলো থেকে উৎকণ্ঠার ছাপ ধীরে ধীরে মুছে যেতে থাকে। হলধররা আর দাঁড়ায় না। ডেকের অন্য প্রান্তে চলে যায়।

এতক্ষণ হলধরদের নিয়ে ব্যস্ত ছিল বিনয়। ওরা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝিনুকের চিন্তাটা চারপাশ থেকে তার মাথায় ঝাঁপিয়ে পড়ে।

॥ দুই ॥

সেসোস্ট্রেস বে পেরিয়ে কোনাকুনি এপারে এলে পোর্ট ব্লেয়ারের গা ঘেঁষে পাশাপাশি দুটো জেটি। দুই স্টিম লঞ্চ সেখানে এসে ভিড়ল। লঞ্চের খালাসি এবং পুনর্বাসন বিভাগের কর্মীদের ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায়।

রেলিং-লাগানো কাঠের পাটাতন ফেলে চোখের পলকে 'রস' আইল্যান্ডের মতোই এপারের জেটিতে দুই লঞ্চকে জুড়ে দেওয়া হল। এক লঞ্চে এসেছিল বিভাস, অন্য লঞ্চটায় নিরঞ্জন। তারা হই হই করে উদ্বাস্তুদের নামাতে শুরু করল। মিনিট পনেরোর ভেতর দুই লঞ্চ ফাঁকা হয়ে গেল। সবার সঙ্গে অফিসাররাও নেমে এসেছেন। বিনয়ও।

জেটি দুটোর পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। একটা সমুদ্রের ধার দিয়ে দিয়ে। অন্যটা উঁচু উঁচু টিলা পেরিয়ে সোজা ওপর দিকে। রাস্তায় জিপ ছাড়াও অনেকগুলো নানা ধরনের মোটর দাঁড়িয়ে আছে। ফিয়েট, হিন্দুস্থান, অস্টিন ইত্যাদি ইত্যাদি। বিনয় আন্দাজ করে নিল ওগুলো সরকারি অফিসারদের গাড়ি।

সেনসাহেব, মণ্ডলসাহেবরা সেই সকাল থেকে 'রস' আইল্যান্ডে কাটিয়ে এসেছেন। সারাদিনের ধকলে ক্লান্তিবোধ করছিলেন। সবার কাছ থেকে আপাতত বিদায় নিয়ে যে যার গাড়িতে উঠে পড়লেন। বিনয়কে বললেন, 'আপনি তো এখন কিছুদিন আন্দামানে আছেন। পরে আবার দেখা হবে।'

অফিসারদের মধ্যে একমাত্র বিশ্বজিৎ রাহাই থেকে গেলেন। আর রইল পুনর্বাসন দপ্তরের কর্মীরা। আজ মেনল্যান্ড থেকে উদ্বাস্তুরা এসেছে ফেলে তো চলে যাওয়া যায় না।

সূর্যটা খানিক আগেও আকাশের ঢালে সিনেমার ফ্রিজ শটের মতো আটকে ছিল। এখন আর সেটাকে দেখা যাচ্ছে না। পশ্চিম দিকের উঁচু পাহাড়ের আড়ালে নেমে গেছে। বাসি হলুদের মতো দিনের শেষ ম্যাড়ম্যাড়ে আলো এখনও জঙ্গলে পাহাড়ে এবং উপসাগরে আলতো ভাবে আটকে আছে। বড়জোর আর মিনিট পনেরো; তারপর সেটুকুও থাকবে না। ঝপ করে সন্ধে নেমে যাবে।

banglabooks.in

উদ্বাস্তুদের জন্য নতুন নতুন বসতির যে পত্তন হচ্ছে সেগুলো পোর্ট ব্লেয়ার থেকে তিরিশ-চল্লিশ কি পঞ্চাশ মাইল দূরে। আজ সকালে চারদিন বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে তারা 'রস' আইল্যান্ডে পৌঁছেছে। একটানা সমুদ্রযাত্রার কারণে তাদের সবার শরীর জুড়ে অপার ক্লান্তি। মুখচোখ দেখে টের পাওয়া যায় হাত-পা যেন ভেঙে আসছে। এই অবস্থায় কি ওদের সুদূর জঙ্গলে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে? উদ্বাস্তুদের এই দঙ্গলে শক্তপোক্ত যুবক যুবতী ছাড়াও রয়েছে বাচ্চাকাচ্চা এবং হাড়ের ওপর চামড়াজড়ানো শীর্ণ থুত্থুড়ে বুড়োবুড়িরা। পাহাড়ি রাস্তায় টাল খেতে খেতে নতুন বসতিতে পৌঁছতে কত রাত হয়ে যাবে, কে জানে। সেই ধাক্কা কি বয়স্ক মানুষগুলো আর বাচ্চারা সামলাতে পারবে?

ঝিনুকের চিন্তাটা বিনয়কে উতলা করে রেখেছিল। তার ফাঁকে ঝাঁকে উদ্বাস্তুদের নিয়ে এই সব ভাবনা তার মাথায় ঢুকে পড়ছে।

বিভাস আর নিরঞ্জনের কর্মকাণ্ডে লেশমাত্র ত্রুটি নেই। হাঁকডাক করে তারা উদ্বাস্তুদের লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। শরণার্থীদের মাথায় বা হাতে তাদের লটবহর। নানা বয়সের বিবাহিত মেয়েদের কোলে কাঁখে ছোট ছোট দুধের শিশু, সেই সঙ্গে কাঁধ থেকে ঝুলছে ময়লা চট কি মোট কাপড়ের ঝুলি। সেগুলোর ভেতর টুকিটাকি নানা জিনিসপত্র।

বিভাস টিনের চোঙা মুখে লাগিয়ে উদ্বাস্তুদের উদ্দেশে সমানে চিৎকার করে যাচ্ছিল, 'ভাইয়েরা বইনেরা মায়েরা, কয়টা দিন আপনাগো উপুর দিয়া মেলা (অনেক) তাফাল গ্যাচে। আইজ আর আপনাগো নয়া বসতে নিয়া যামু না। রাইতখান পোর্ট ব্লেয়ারে কাটাইয়া কাইল সকালে রওনা দিবেন।' সে একনাগাড়ে বলতে লাগল, 'অহন আমরা যামু এবারডিন বাজারের সুমখে। হেইহানে আপনেগো থাকনের ব্যবস্থা করা আছে। জাগাখান (জায়গা) বেশি দূরে না। হাইটাই যাওন যাইব। আহেন, আমাগো লগে আহেন—'

এদিকে বিশ্বজিৎ রাহা বিনয়ের কাছে চলে এসেছিলেন। বললেন, 'চলুন, আমার সঙ্গে গাড়িতে যাবেন।'

অন্য সব গাড়ি চলে গেলেও একটিমাত্র জিপ রাস্তার একধারে দাঁড়িয়ে ছিল। বিশ্বজিৎ সেদিকে পা বাড়াতে যাবেন, হঠাৎ বিনয়ের মনে পড়ল, হলধরদের কথা দেওয়া হয়েছে আন্দামানে সে যতদিন আছে তাদের সঙ্গে থাকবে। অঙ্গীকার তো ভাঙা যায় না। অবশ্য এটাও ঠিক, আন্দামানের নানা জায়গা তাকে যেতে হবে। সারাটা সফর ওদের সঙ্গে কাটানো সম্ভব নয়। কিন্তু প্রথম দিকের বেশ কয়েকটা দিন ওদের কাছে থাকতেই হবে।

বিনয় বলল, 'কিছু মনে করবেন না। আমি ওদের সঙ্গেই যেতে চাই—' কেন যাওয়া দরকার সেটা বুঝিয়ে বলল।

'বুঝেছি, অজানা নতুন জায়গায় ওরা আপনার ওপর খুব ডিপেন্ড করছে।' বিশ্বজিৎ একটু হেসে বললেন, 'চলুন, আমিও হাঁটতে হাঁটতে যাই। এবারডিন বাজারের সামনের মাঠে আমাকেও যেতে হবে। রাত্তিরে রিফিউজিদের খাওয়া-থাকার কী ব্যবস্থা হয়েছে, কোথাও কোনও ত্রুটি আছে কিনা সেসব দেখে রাত্তিরে আমার বাংলোয় ফিরব।' তাঁর জিপের ড্রাইভার কালীপদকে—রোগা, কালো, লম্বাটে মুখ, ঝাঁকড়া চুল, বছর পঁচিশ বয়স— ডেকে জিপ নিয়ে এবারডিন বাজারে চলে যেতে বললেন।

এদিকে উদ্বাস্তুদের দলটা সারি দিয়ে চলতে শুরু করেছে। দক্ষ গাইডের মতো বিভাস আর নিরঞ্জন তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সমুদ্রের ধার ঘেঁষে যে রাস্তাটা ডাইনে এবং বাঁয়ে গেছে সেটা ধরে নয়; যে রাস্তাটা সোজা টিলার পর টিলা পেরিয়ে ওপরে উঠেছে সেটা দিয়েই এগিয়ে চলেছে সবাই। মাঝখানে একটু দূরত্ব রেখে বিশ্বজিৎ আর বিনয় উদ্বাস্তুদের পাশাপাশি হাঁটছিল।

'রস' আইল্যান্ডে নিরঞ্জন পরিচয় করিয়ে দেবার সময় বিনয় আন্দাজ করেছিল বিশ্বজিতের বয়স-বত্রিশ তেত্রিশ হবে। অর্থাৎ তার চেয়ে মোটামুটি বছর দশেকের বড়। সতেজ, মেদহীন চেহারা। পরিপূর্ণ যুবকই বলা যায় তাঁকে।

কম বয়সে বিরাট সরকারি দায়িত্ব পেলে প্রায় সবারই একটা ভারিক্কি ভাব এসে যায়। সারাক্ষণ গম্ভীর। চারপাশে উঁচু উঁচু দেওয়াল তুলে তার ভেতর ঢুকে যায় তারা। বুঝিয়ে দেয় তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে। বিশ্বজিৎ কিন্তু তেমনটা নন। হাসিখুশি, কোনও রকম চাতুরি নেই, মজা করতে পারেন, প্রাণ খুলে হাসতে পারেন। আলাপ হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ভীষণ ভালো লেগে গিয়েছিল বিনয়ের। আন্দামানে একজন চমৎকার বন্ধু পাওয়া গেছে।

হাঁটতে হাঁটতে কথাও হচ্ছিল। বিশ্বজিৎ বলছিলেন, 'তখন রিডিউজিদের নিয়ে এমন ব্যস্ত ছিলাম যে ভালো করে আলাপটাই হয়নি। জগদীশকাকা লিখেছেন, আপনাকে যেন সাহায্য করি। ব্যস, এটুকুই।' একটু থেমে ফের বলেন, 'আপনিই প্রথম একজন জার্নালিস্ট যিনি আন্দামানে রিফিউজি সেটেলমেন্ট কভার করতে

banglabooks.in

এসেছেন। আপনার সম্বন্ধে খুব জানতে ইচ্ছে করছে।'

নিজের থেকে বিনয়কে কিছু বলতে হল না। কয়েক মিনিটের ভেতর নানা প্রশ্ন করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার সম্পর্কে প্রায় সমস্ত কিছু জেনে নিলেন বিশ্বজিৎ। ঝিনুকের ব্যাপারটা বাদেবাকি সবই বলে গেল বিনয়। এই একটা গোপন দুর্বল জায়গা আছে তার বুকের ভেতর। নিদারুণ কষ্টকরও। ঝিনুকের কথা যারা জানে তারা জানে। নিজের মুখে বিনয় অন্য কারওকে বলতে পারবে না।

বিশ্বজিৎ গভীর আগ্রহে শুনছিলেন। সহানুভূতিতে তাঁর মন ভরে যায়। ভারী গলায় বললেন, 'আপনি নিজেও তাহলে দেশভাগের একজন ভিকটিম। তাই উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে এত সিমপ্যাথি। সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আন্দামান অব্দি তাদের সঙ্গে চলে এসেছেন।

কথাটা মোটামুটি ঠিকই। আন্দামানে আসার জন্য ব্যগ্র হয়ে ছিল সে। 'নতুন ভারত' অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়ায় এখানে আসা সম্ভব হয়েছে। নইলে এত তাড়াতাড়ি আসা সম্ভব হত না। তবে একদিন না একদিন, দু বছর পরেই হোক বা চার বছর পরে, এই দ্বীপপুঞ্জে আসতই। পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ চোদ্দোপুরুষের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে সীমান্তের এপারে চলে এসেছে, তারা কোথায় কীভাবে নতুন করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে, নাকি ভেঙেচুরে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, সেসব নিজের চোখে দেখতে চায় সে। শিয়ালদা স্টেশনে, কলকাতার চারপাশের কলোনি আর ত্রাণশিবিরগুলোতে দিনের পর দিন গেছে সে। এখন এসেছে আন্দামানে। শোনা যাচ্ছে, ভারতবর্ষের নানা প্রভিন্সে পুনর্বাসনের জন্য শরণার্থীদের পাঠানো হবে। যেখানেই তারা যাক, বিনয় সেখানেই যাবে।

বিশ্বজিৎ বললেন, 'আমাদের বাড়িও ছিল ওপারে। আনডিভাইডেড বেঙ্গলের মাইমেনসিং ডিস্ট্রিক্টে। তবে আমরা রিফিউজি না, পার্টিশনের অনেক আগেই চলে এসেছিলাম।'

এই মানুষটি সম্পর্কে বিনয়েরও জানার আগ্রহ কম নয়। কিন্তু বিশ্বজিৎ নিজের ব্যাপারে আর একটি কথাও বললেন না। বিনয় যে জিগ্যেস করবে তেমন সাহস হল না। বেশি কৌতূহল দেখালে বিশ্বজিৎ বিরক্ত হতে পারেন। আন্দামানে যখন আসাই হয়েছে, সবই জানা যাবে।

একটু চুপচাপ।

দিনের আলো আরও কমে গেছে। রাস্তার দুধারে কত যে নারকেল গাছ আকাশের দিকে মাথা তুলে আছে! আর আছে বিশাল বিশাল শিশু, রেন-ট্রি এবং নাম না জানা মহাবৃক্ষের সারি। সেসবের ফাঁকে ফাঁকে অল্প কিছু কাঠের বাড়ি, ক্বচিৎ দু চারটে পাকা দালান।

অগুনতি গাছের ছায়ায় চারপাশ ঢেকে যাচ্ছে। সব কেমন যেন ঝাপসা ঝাপসা।

উদ্বাস্তুরা প্রায় নিঃশব্দে হাঁটছে তো হাঁটছেই। তাদের দেখতে দেখতে মনে হল, মধ্যযুগের যাযাবরেরা এইভাবেই বুঝিবা খাদ্যের সন্ধানে, নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে পাহাড় পর্বত মরুভূমি পার হয়ে ঘুরে বেড়াত।

একটা টিলার মাথায় চলে এসেছিল বিনয়রা। পথ এবার নিচের দিকে নেমে দূরে অন্য একটা টিলায় গিয়ে উঠেছে।

বিশ্বজিৎ দূরের টিলাটার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'আমরা প্রায় এসে গেছি। ওই টিলাটার পর এবারডিন বাজার।' তারপর জিগ্যেস করলেন, 'জগদীশকাকার কাগজ কেমন চলছে?'

বিনয় বলল, 'বেশ ভালো। এখানে 'নতুন ভারত' আসে?'

'আসে। তবে রোজ নয়। উইকে তিনদিন প্লেন সারভিস আছে। প্লেনের সঙ্গে কাগজও আসে।' বিশ্বজিৎ বলতে লাগলেন, 'আপনাদের কাগজ রিফিউজি প্রবলেমের ওপর অন্য পেপারগুলোর চাইতে অনেক বেশি ইমপর্টান্স দিচ্ছে। তার ওপর অন্যেরা যা করেনি, আপনারা তাই করতে চলেছেন। আন্দামান সেটেলমেন্ট কভার করবেন। আশা করি, সার্কুলেশন হুহু করে বেড়ে যাবে।'

বিশ্বজিৎ অত্যন্ত বুদ্ধিমান। 'নতুন ভারত'-এর পরিকল্পনা আপাতত তা-ই। উদ্বাস্তু সমস্যার ওপর বিশেষ করে জোর দেওয়া। সেটা সঠিক ধরে ফেলেছেন বিশ্বজিৎ।

বিনয় একটু হাসল। তবে 'নতুন ভারত' নিয়ে কোনও মন্তব্য করল না। বলল, 'এখানকার রিহ্যাবিলিটেশনের কাজ কেমন চলছে?'

বিশ্বজিৎ আস্তে মাথা নাড়লেন। 'আমি কিছু বলব না। নিজের চোখে দেখে আপনাকে সেটা বুঝে নিতে হবে।'

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা।

ঝিনুকের চিন্তাটা ভেতরে ভেতরে চলছিলই। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে হল, পুনর্বাসন দপ্তরের এই মহা ক্ষমতাবান অফিসারটি ইচ্ছা করলে ঝিনুকের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু সরাসরি তো বলা যায় না, আমাকে মিডল আন্দামানে যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিন। পোর্ট ব্লেয়ারকে ঘিরে দক্ষিণ আন্দামানের শরণার্থীদের নতুন নতুন বসতিগুলো না দেখেই কেন সে মধ্য আন্দামানে যেতে চাইছে এই নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠবে। সেগুলো তার পক্ষে খুবই অস্বস্তিকর।

কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বিনয় জিগ্যেস করল, 'মিডল আন্দামান এখান থেকে কতদূর?'

বিশ্বজিৎ বললেন, 'ষাট বাষট্টি মাইল।'

'নিরঞ্জনবাবু বলেছেন, ইন্টার-আইল্যান্ড শিপ সারভিসের জাহাজ মাসে একবার মাত্র ওখানে যায়।'

'ঠিকই বলেছে।'

'এছাড়া আর কোনওভাবে সেখানে যাওয়া যায় না?'

চলতে চলতে ঘাড় ফিরিয়ে কয়েক পলক বিনয়কে লক্ষ করলেন বিশ্বজিৎ। তারপর বললেন, 'যায়। শেল-কালেক্টরদের মোটর বোট আইল্যান্ডের কোস্ট ধরে ধরে মাঝে মাঝে মিডল আইল্যান্ড, এমনকী আরও দূরে নর্থ আইল্যান্ড অব্দি চলে যায়।তবে কতদিনে যাবে তার ঠিক নেই।'

'শেল-কালেক্টর কাদের বলে?'

বিশ্বজিৎ বুঝিয়ে দিলেন, সমুদ্রে ডুবুরি নামিয়ে যারা শঙ্খ, কড়ি, যেমন টার্বো ট্রোকাস নটিলাস এমনি নানা জিনিস তুলে আনে তারা হল শেল-কালেক্টর। সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নিয়ে তবেই এসব শেল তোলা যায়। তোলার পর অ্যাসিড দিয়ে সাফ করে পালিশ লাগিয়ে এগুলো বাইরে চালান করা হয়। বিদেশের বাজারে আন্দামানের টার্বো ট্রোকাস নটিলাসের বিপুল চাহিদা।

বিশ্বজিৎ বলতে লাগলেন, 'তা ছাড়া নর্থ আন্দামানের মায়াবন্দরে একটা কোম্পানির অনেকগুলো বিরাট বিরাট কাঠের কারখানা রয়েছে। তাদের ছোট জাহাজ আছে একটা। সেটা মিডল আন্দামান হয়ে কখনও পনেরো দিন, কখনও বা দু তিন মাস পর পোর্ট ব্লেয়ার থেকে মায়াবন্দর যায়।'

নিরাশই হয়ে পড়ে বিনয়। শেল-কালেক্টরদের বোট বা কাঠের কারখানার জাহাজের ব্যাপারটা অনেকখানিই অনিশ্চিত। কবে ওদের মিডল আর নর্থ আন্দামানে যাবার দরকার হবে, কে জানে। এমনও তো হতে পারে, পাঁচ-সাত দিনের ভেতর যাবে।

বিনয় জিগ্যেস করে, 'ওরা কি নিজেদের লোক ছাড়া অন্য কারওকে নিয়ে যায়?'

'না। তবে—,

'সরকারি অফিসাররা বললে নিশ্চয়ই নিয়ে যাবে।'

আশার একটু সংকেত যেন দেখতে পায় বিনয়। গভীর আগ্রহে বলে, 'কয়েকদিনের মধ্যে ওদের বোট বা জাহাজ মিডল আন্দামানে যাবে কিনা সেটা কি জানা যায়।'

'তা হয়তো যায়।' বলেই বিশ্বজিতের খেয়াল হল, মধ্য আন্দামান সম্পর্কে বিনয়ের কেন এত ঔৎসুক্য? জানতে চাইলেন, 'আপনি কি মিডল আন্দামানে যেতে চাইছেন'?

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা নাড়ে বিনয়।'—ওখানে তো সেটেলমেন্ট হচ্ছে। সেটা দেখাও খুব জরুরি।'

banglabooks.in

'অবশ্যই। আগে সাউথ আন্দামানের সেটেলমেন্ট দেখে নিন। তারপর মিডল আন্দামানে যাবেন। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।'

বিনয় বুঝতে পারছে, বিশ্বজিৎ ইচ্ছা করলে শেল-কালেক্টরদের বোটে বা কাঠের কারবারিদের জাহাজে তাকে পাঠিয়ে দিতে পারেন। তার মতো বিপুল ক্ষমতাবান অফিসারের হুকুম অমান্য করার মতো বুকের পাটা ওদের কারও হবে না। কিন্তু বোট বা জাহাজ কবে ছাড়বে সেটা বড় মাপের প্রশ্ন। তা ছাড়া এখানে পা দিতে না দিতেই পোর্ট ব্লেয়ারের চারপাশের পুনর্বাসনের হাল না দেখে সত্তর মাইল দূরের মধ্য আন্দামানে যাবার জন্য এত ব্যগ্র হয়ে ওঠাটা একটু দৃষ্টিকটুই। যতই ব্যাকুল হোক ঝিনুকের সঙ্গে এখনই দেখা হবার সম্ভাবনা নেই। আপাতত বেশ কিছুদিন বিনয়কে দক্ষিণ আন্দামানেই কাটাতে হবে।

খানিক আগে বিশ্বজিৎ যে উঁচু টিলাটা দেখিয়েছিলেন, চড়াই বেয়ে বেয়ে সবাই এখন সেটার মাথায় উঠছে। নিঃশব্দে খানিকটা চলার পর বিনয় জিগ্যেস করে,

'একটা খবর জানা যেতে পারে?'

বিশ্বজিৎ জানতে চাইলেন।—'কী খবর?'

'একটি মেয়ে, উনিশ-কুড়ি বছর বয়স, আজ আমাদের সঙ্গে 'রস' আইল্যান্ডে এসেছে। সে 'চলুঙ্গা' জাহাজে মিডল আন্দামানে গেছে। ও কোন ফ্যামিলির সঙ্গে ওখানকার কোন সেটেলমেন্টে গেল, দয়া করে যদি একটু খোঁজ নেন—'

'কী নাম মেয়েটির?'

'তাপসী লাহিড়ি। ডাকনাম ঝিনুক।' বলেই হকচকিয়ে যায় বিনয়। ঝিনুকের নামটা গোপনই রাখতে চেয়েছিল সে। ভেবেছিল, মিডল আন্দামানে গিয়ে সেখানকার সেটেলমেন্টগুলোতে ঘুরে তাকে খুঁজে বার করবে। কিন্তু বিশ্বজিতের সঙ্গে কথা বলতে বলতে নিজের এই সংকল্পের কথাটা লহমার জন্য ভুলে গিয়েছিল বিনয়। নিজের অজান্তে ঝিনুকের নাম তার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে।

চলতে চলতে পলকহীন বিনয়ের দিকে তাকাতে থাকেন বিশ্বজিৎ। রীতিমতো অবাকই হন। বিস্ময়টা থিতিয়ে এলে হেসে হেসে বলেন, 'আশ্চর্য!'

আশ্চর্যটা কী কারণে আন্দাজ করতে পারল না বিনয়। বিশ্বজিৎ এরপর কী বলবেন সেজন্য চুপচাপ অপেক্ষা করতে থাকে।

বিশ্বজিৎ লঘু সুরে এবার বললেন, 'মহারাজা' জাহাজে চারদিন একসঙ্গে কাটালেন। 'রস' আইল্যান্ডেও বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটিয়েছেন। মেয়েটি কোন ফ্যামিলির সঙ্গে এসেছে, তাকেই তো জিগ্যেস করতে পারতেন।' পারতপক্ষে মিথ্যে বলে না বিনয়। তেমন অভ্যাসই নেই। এখন অবলীলায় তাই বলতে হল।—'জাহাজে কি 'রস'-এ ওকে লক্ষ করিনি। রিফিউজিরা থাকত শিপের খোলে। আমি আপার ডেকে। ও যখন 'চলুঙ্গা' জাহাজে মিডল আন্দামান যাচ্ছে তখন দেখতে পেলাম। কিন্তু 'চলুঙ্গা' অনেকটা দূরে চলে গেছে।'

'নামটাম যখন বলতে পারছেন, মেয়েটিকে ভালোই চেনেন মনে হচ্ছে।'

প্রচণ্ড অস্বস্তি হতে থাকে বিনয়ের। মুখ ফসকে যখন ঝিনুকের নামটা বেরিয়েই এসেছে কতরকম প্রশ্নের জবাবদিহি করতে হবে, কে জানে। বিশ্বজিৎ প্রথমেই অবধারিত যা জানতে চাইবেন, এত পরিচিত মেয়েটি কোন পরিবারের সঙ্গে আন্দামানে এসেছে, বিনয় তার খবর রাখে না, সেটাই বিস্ময়কর। এই সুতো ধরে কথা যে উঠবে! গোপন ব্যাপারটা হয়তো আর রাখা যাবে না। বিনয় টের পেল, কপালে দানা দানা ঘাম জমেছে। ঝাপসা গলায় বলল, 'হ্যাঁ, চিনি।'

বিশ্বজিৎ এ নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন করলেন না। বললেন, 'আপনি যা জানতে চাইছেন, খুব সহজেই তা জানা যাবে। যে রিফিউজিরা আজ এসেছে, তাদের নাম, বয়স, তারা কোন কোন ফ্যামিলির মেম্বার, সেই ফ্যামিলিগুলোর হেড কারা, দেশ ইস্ট পাকিস্তানের কোন ডিস্ট্রিক্টে ছিল—ডিটেলে তার লিস্ট আমার অ্যাটাচি কেসে আছে। আমার ড্রাইভার অ্যাটাচিটা নিয়ে জিপে চলে গেছে। সেটা দেখে আপনাকে বলে দেব।'

এটা শুক্লপক্ষ। সূর্যাস্ত হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। চাঁদ উঠে আসছে। কারা যেন জাদুকলস উপুড় করে রুপোলি জ্যোৎস্না ঢেলে দিতে শুরু করেছে সারা চরাচর জুড়ে।

খাড়াই ভেঙে টিলার মাথায় চলে এসেছিল বিনয়রা। এবার তাদের এ ধারের ঢাল বেয়ে নিচে নামতে হবে। চড়াই বেয়ে ওঠাটা ভীষণ কষ্টের, কিন্তু উতরাই দিয়ে নামাটা অনেক আরামের।

বেশ খানিকটা দূরে টিম টিম করে প্রচুর আলো জ্বলছিল। বিশ্বজিৎ বললেন, ওই হল এবারডিন মার্কেট। আমাদের ডেস্টিনেশন।'

॥ তিন ॥

তিন দিকে লম্বা লম্বা ব্যারাকের মতো দোতালা-তেতলা দালান ছাড়াও রয়েছে টিনের বা টালির চালের বেশ কিছু বাড়ি। বেশির ভাগ বাড়ির একতলায় নানা ধরনের দোকানপাট। মুদিখানা, ধোবিখানা, ওষুধের দোকান, জামাকাপড়ের দোকান, দাওয়াখানা, ছোটখাট হোটেল ইত্যাদি ইত্যাদি। বিজলিবাতি ছাড়াও কোনও কোনওটায় গ্যাসের আলোও জ্বলছে।

মস্ত মাঠটা বাজারের সামনের দিকে। সেখানে চল্লিশ-পঞ্চাশটা বাঁশের খুঁটি পুঁতে সেগুলোর গায়ে লম্বা ইলেকট্রিকের তার বেঁধে বাল্‌ব জ্বালানো হয়েছে। মাঠের বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে বসার জন্য চট পাতা। একধারে কটা চেয়ার এবং সাদা ধবধবে চাদর দিয়ে ঢাকা একটা টেবিল।

প্রচুর লোকজন জমা হয়েছে এখানে। চেহারা দেখে বোঝা যায় এদের কেউ শিখ, কেউ মাদ্রাজি, কেউ বর্মী, কেউ পাঠান এবং ভারতের নানা অঞ্চলের মানুষ। জনতা কিন্তু চটের ওপর বসেনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। চারপাশ থেকে অজস্র মাছির ভনভনানির মতো আওয়াজ আসছে।

এই মাঠে আজ কি মিটিং টিটিং কিছু আছে? যদি থাকেও তার সঙ্গে মেনল্যান্ড থেকে আসা উদ্বাস্তুদের কী সম্পর্ক? তাদের এখানে নিয়ে আসা হল কেন? বুঝতে না পেরে ধন্দে পড়ে যায় বিনয়। সে কিছু জিগ্যেস করতে যাচ্ছিল, তার আগেই বিশ্বজিৎ বললেন, 'যে মাঠটায় আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি তার সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের একটা গ্লোরিয়াস চ্যাপটার জড়িয়ে আছে।'

আন্দামান সম্পর্কে নানা বইপত্র পড়েছে বিনয়। সে জানে আঠারোশো সাতান্নর মিউটিনির পর ইংরেজরা বহু সিপাহিকে গুলি করে বা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে। অনেককে পোর্ট ব্লেয়ারে নির্বাসনে পাঠায়। তারপর বিশ শতকের গোড়ার দিকে দেশের মুক্তির জন্য যখন সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু হল তখন বাংলা, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র এবং ভারতের অন্য সব প্রভিন্স থেকে বিপ্লবীদের ধরে ধরে বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে নিয়ে আসা হয়। এবারডিন মার্কেটের সামনের মাঠটায় এমন কিছু কি ঘটেছিল যাতে বিদ্রোহী সিপাহি বা পরবর্তী কালের বিপ্লবীরা জড়িত ছিলেন? বিনয়ের তা জানা নেই।

বিশ্বজিৎ বললেন, 'সেকেন্ড গ্রেট ওয়ারের সময় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্দামানে এসেছিলেন। এই মাঠে তিনি আমাদের জাতীয় পতাকা তুলেছেন।'

সারা শরীরে শিহরন অনুভব করে বিনয়। পরক্ষণে গভীর বিষাদে মন ভরে যায়। দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক আর ফিরে আসেননি। কাগজে মাঝে মাঝেই খবর বেরয়, তিনি আসছেন, তিনি আসছেন। কিন্তু আসেন আর না। দেশের মানুষ বিপুল প্রত্যাশা আর অসীম উৎকণ্ঠা নিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে। বিনয় তাদেরই একজন। হঠাৎ তার মনে হল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে এই তো সেদিন। মাত্র কয়েক বছর আগে। তখন কি বিশ্বজিৎ এই দ্বীপে ছিলেন? থাকা অসম্ভব

pathagar.net

banglabooks.in

নয়। উৎসুক সুরে জিগ্যেস করে, 'আপনি কি নেতাজিকে দেখেছেন?'

'না। আমি স্বাধীনতার পর পোর্ট ব্লেয়ারে এসেছি।' বিশ্বজিৎ বললেন, 'তবে আমার কাকা তাঁকে দেখেছেন।'

সব কেমন যেন গুলিয়ে গেল। রীতিমতো অবাকই হল বিনয়। বলল, 'আপনার কাকা! তিনি কীভাবে—'

তাকে শেষ করতে দিলেন না বিশ্বজিৎ। 'কাকা নাইনটিন টোয়েন্টিতে আন্দামানে এসেছিলেন। সেই থেকে এখানেই আছেন।'

নাইনটিন টোয়েন্টি। অর্থাৎ সেটা ইংরেজ আমল। বিশ্বজিতের কাকা সম্পর্কে কৌতূহল প্রবল হয়ে ওঠে বিনয়ের। সে জানতে চায়, 'উনি কি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কোনও সারভিস নিয়ে এই আইল্যান্ডে এসেছিলেন?'

'একেবারে উলটো।' বিশ্বজিৎ হাসলেন। —'ইংরেজদের গোলামি করার কথা তিনি কল্পনাও করতে পারতেন না। বরং এ দেশ থেকে তাদের উৎখাত করাই ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। কাকা ছিলেন একজন সশস্ত্র বিপ্লবী— ইংরেজরা বলত টেররিস্ট।'

বিশ্বজিৎ বিশদভাবে জানালেন তাঁর কাকা শেখরনাথ কর এবং আরও কয়েকজন বিপ্লবী উনিশশো আঠারোয় বিহারে একটি মেল ট্রেনে হানা দিয়েছিলেন। কানপুর থেকে একটা বগিতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ট্রেনটা কলকাতায় যাচ্ছিল। শেখরনাথদের উদ্দেশ্য, অস্ত্রগুলো লুট করা।

বগিটা পাহারা দিয়ে আনছিল পুলিশের বড়সড় একটা বাহিনী আর দু'জন জাঁদরেল ব্রিটিশ অফিসার। দু'পক্ষের গোলাগুলিতে তিনজন বিপ্লবী মারা যান, কয়েকজন মারাত্মক জখম হন। ওদিকে একজন ব্রিটিশ অফিসার আর তিনজন কনস্টেবলেরও মৃত্যু হয়, চার-পাঁচজন কনস্টেবলেরও গুরুতর চোট লাগে। তখন মধ্যরাত। অন্য কামরাগুলোতে যাত্রীরা ঘুমাচ্ছিল। গুলির আওয়াজে তারা জেগে ওঠে। আতঙ্কে হইচই করতে করতে ট্রেনের অ্যালার্ম চেন টেনে দেয়। শেখরনাথ এবং তাঁর পাঁচ সঙ্গীর হাতে পায়ে গুলি লেগেছিল। রক্তে ভেসে যাচ্ছিল সারা গা। সেই অবস্থাতেই ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে যান।

অন্ধকারে তিন বিপ্লবী দৌড়তে দৌড়তে বিহারের এক অজ দেহাতে লুকিয়ে ছিলেন কিন্তু পুলিশ গন্ধ শুঁকে শুঁকে সেখানে পৌঁছে যায়। ধরা পড়ার পর কিছুদিন অকথ্য নির্যাতন চলে। তারপর বিচার। আইনকানুন ইংরেজদের, আদালত ইংরেজের, বিচারক ইংরেজ। ফলে যা হবার তা-ই হল। দুই বিপ্লবীর ফাঁসি হয়ে গেল আর শেখরনাথকে পাঠানো হল সেলুলার জেলে। বাকি জীবন এখানেই তাঁকে কাটাতে হবে। সেলুলার জেলের সলিটারি সেলে কয়েক বছর আটকে রাখার পর তাঁকে জেলখানার বাইরে আনা হয়। তখন পোর্টব্লেয়ারে পাহাড় কেটে নতুন নতুন রাস্তা বানাচ্ছে পি.ডব্লু.ডি, শেখরনাথকে সেখানে হিসাব রাখার কাজ দেওয়া হয়। কারাগারের নির্জন কুঠুরি থেকে একটুখানি মুক্তি পেলেন ঠিকই, কিন্তু মেনল্যান্ডে যে পালিয়ে আসবেন তার উপায় নেই। চারদিকে গভীর জঙ্গল আর সমুদ্র। জঙ্গলে রয়েছে হিংস্র আদিবাসীরা, সমুদ্রে তাদের চেয়েও ভয়ংকর ঝাঁকে ঝাঁকে হাঙর। যেদিকেই যান, পালানো অসম্ভব। ধীরে ধীরে আন্দামানকে ভালোবেসে ফেললেন শেখরনাথ, আশ্চর্য এক মায়ায় জড়িয়ে গেলেন বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপমালার সঙ্গে। স্বাধীনতার পর ইন্ডিয়ার মেনল্যান্ডে ফিরে যেতে পারতেন। যাওয়া হয়নি।

অবাক বিস্ময়ে শুনে যাচ্ছিল বিনয়। যেন এক অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চকর কাহিনি। জগদীশ গুহঠাকুরতা বারবার বলে দিয়েছিলেন, শুধুমাত্র উদ্বাস্তু পুনর্বাসন নয়, আন্দামানের সমস্ত দিক নিয়ে তাকে লেখা পাঠাতে হবে। বিশেষ করে জোর দিতে হবে সেলুলার জেলের ওপর। কুখ্যাত এই জেলখানায় জীবনের বহু মূল্যবান সময় কাটিয়ে দিয়েছেন শেখরনাথ। তাঁর কাছ থেকে ব্রিটিশ আমলে এই বন্দিশালায় কী ধরনের নির্মম উৎপীড়ন চালানো হত, সেসব তথ্য জানা যাবে।

বিনয় ব্যগ্র হয়ে ওঠে।- 'কাকার সঙ্গে আলাপ করতে চাই। ওঁকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

বিশ্বজিৎ বললেন, 'নিশ্চয়ই আলাপ হবে। তবে আপাতত উনি পোর্টব্লেয়ারে নেই, লিটল আন্দামানে গেছেন। দু'চার দিনের ভেতর ফিরে আসবেন।'

'আজ যে উদ্বাস্তুরা এসেছে আমি তো তাদের সঙ্গে পুনর্বাসনের জায়গায় চলে যাব। কাকার সঙ্গে দেখা হবে কী করে?' বিনয়ের গলায় হতাশা ফুটে বেরয়।

তার মনোভাবটা আঁচ করে নিয়ে বিশ্বজিৎ বললেন, 'কাকা এখন উদ্বাস্তুদের মধ্যে কাজ করছেন। আপনি যেখানে যাচ্ছেন, লিটল আন্দামান থেকে ফিরেই তিনি সেখানে চলে যাবেন।'

আরও অনেক প্রশ্ন ছিল বিনয়ের, কিন্তু সেসব করা হল না।

'বইয়া (বসে) পড়েন, বইয়া পড়েন।' ওদিকে তুমুল হাঁকাহাঁকি করে চটের আসনের ওপর বসিয়ে দিতে লাগল নিরঞ্জন আর বিভাস। সভাটভা যা-ই হোক তা যে উদ্বাস্তুদের জন্যই, সেটা এখন বোঝা যাচ্ছে। তবে উদ্দেশ্য ধরা যাচ্ছে না।

এলাকাটা ঘিরে আগে থেকেই জমায়েত হয়েছিল, তাদের মধ্যে হঠাৎ চাঞ্চল্য দেখা গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা ধবধবে ফিয়েট গাড়ি আর একটা জিপ এসে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে পড়ে। জিপ থেকে নেমে আসে তিন চারজন কনস্টেবল। ফিয়েট থেকে মাঝবয়সি একজন—বেশ সুপুরুষ। চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা, মাথায় ব্যাকব্রাশ করা কাঁচাপাকা চুল। চেহারায় প্রবল একটা ব্যক্তিত্ব রয়েছে। পরনে ঢোলা ট্রাউজার্স এবং শার্ট।

বিশ্বজিৎ বললেন, 'চিফ কমিশনার এসে গেছেন। চলুন আমার সঙ্গে।' বলে ব্যস্তভাবে এগিয়ে গেলেন। তাঁর পাশাপাশি লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগল বিনয়। প্রৌঢ়টি যে চিফ কমিশনার, আন্দাজ করে নিতে অসুবিধা হয় না।

চিফ কমিশনারের কাছে এসে সসম্ভ্রমে বিশ্বজিৎ বললেন, 'আসুন স্যার—' টেবিল চেয়ারগুলো যেখানে সাজানো রয়েছে তাঁকে সেখানে নিয়ে গেলেন। একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল বিনয়।

ইংরেজিতেই কথা বলছিলেন বিশ্বজিৎরা। বোঝা গেল, চিফ কমিশনার অবাঙালি। তিনি চেয়ারে বসলেন না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উদ্বাস্তুদের উদ্দেশে যা বললেন, মোটামুটি এইরকম। 'আন্দামানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। দেশভাগের পর সব কিছু হারিয়ে আপনারা ভারতে চলে এসেছিলেন। নিদারুণ কষ্ট আর দুর্ভোগের মধ্যে আপনাদের দিন কেটেছে। পশ্চিমবাংলা ছোট রাজ্য। সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষকে দেবার মতো যথেষ্ট জমি নেই। তাই বাংলার বাইরে উদ্বাস্তুদের পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে। বিশেষ করে বঙ্গোপসাগরের মাঝখানের এই দ্বীপে। কিন্তু আন্দামান সম্পর্কে ইন্ডিয়ান মেনল্যান্ডের মানুষের ভীষণ ভয়, অস্বস্তি। সংশয় কাটিয়ে আপনারা যে শেষ পর্যন্ত এখানে এসেছেন, এতে আপনাদের ভালোই হবে। আপনাদের জন্য প্রচুর জমি ঠিক করা আছে। এখানে সুখে শান্তিতে বাস করুন। আন্দামানের সব অফিসার আর কর্মী আপনাদের সমস্তরকম সাহায্য করবেন।'

পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর কথাগুলো বাংলায় তরজমা করে দিতে লাগলেন বিশ্বজিৎ।

ভাষণ শেষ করে চিফ কমিশনার উদ্বাস্তুদের মধ্যে চলে গেলেন। নিরঞ্জন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'আপনেরা হনলে উইঠা খাড়ন। চিফ কমিশনার সাহেব আপনেগো লগে আলাপ করবেন।'

উদ্বাস্তুরা লহমায় উঠে দাঁড়াল। সবাই ত্রস্ত, সচকিত।

চিফ কমিশনারের সঙ্গে বিশ্বজিৎও এসেছিলেন। উদ্বাস্তুদের চোখমুখের চেহারা লক্ষ করে বললেন, 'ভয়ের কিছু নেই। আমি তো আছি। উনি যা জিগ্যেস করছেন তার জবাব দেবেন।'

বয়স্কদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন চিফ কমিশনার। পূর্ব পাকিস্তানে কার বাড়ি কোথায় ছিল, কতদিন আগে দেশ থেকে চলে এসেছে, কলকাতায় কোথায় কাটিয়েছে, জাহাজে

banglabooks.in

পোর্টব্লেয়ারে আসতে কোনওরকম কষ্ট হয়েছে কি না, 'রস' আইল্যান্ডে নেমে খাওয়া-দাওয়া ঠিকমতো করেছে কি না ইত্যাদি।

বিশ্বজিতের ভূমিকাটা দোভাষীর। সমানে ইংরেজি থেকে বাংলা এবং বাংলা থেকে ইংরেজি করে যাচ্ছিলেন।

আলাপ-টালাপ হয়ে গেলে আবার সেই টেবিল চেয়ারগুলোর কাছে চলে এলেন চিফ কমিশনার। বিশ্বজিৎকে জিগ্যেস করলেন, 'এদের কি কাল রিহ্যাবিলিটেশনের জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে, না দু'একদিন ওরা পোর্টব্লেয়ারে থেকে যাবে?'

বিশ্বজিৎ জানালেন, 'না স্যার। রাতটা এখানে কাটিয়ে কাল সকালে ডি.পি ফ্যামিলিগুলোকে নিয়ে যাওয়া হবে।'

'দেখো, ওদের যেন কোনও অসুবিধে না হয়।'

'হবে না। সব ব্যবস্থা করা আছে।'

'গুড। আমি এখন যাচ্ছি—'

চিফ কমিশনার তাঁর ফিয়েটের দিকে পা বাড়াতে যাবেন, হঠাৎ বিনয়ের কথা মনে পড়ে গেল বিশ্বজিতের। বলল, 'স্যার, একজনের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব।'

'কে?'

বিশ্বজিৎ বিনয়কে ডেকে আলাপ করিয়ে দিলেন। চিফ কমিশনার রীতিমতো খুশি। বললেন, 'আপনিই বোধহয় প্রথম সাংবাদিক যিনি আন্দামানের রিফিউজি সেটলমেন্ট দেখতে এলেন। মোস্ট ওয়েলকাম।' একটু থেমে ফের বলেন, 'খবর পাচ্ছি রিফিউজিরা যাতে এখানে না আসে সে জন্যে কোনও কোনও পলিটিক্যাল পার্টি কলকাতায় অ্যাজিটেশন শুরু করেছে? কী চাইছে পার্টিগুলো? ওদের মুভমেন্ট কি বিরাট আকারে ছড়িয়ে পড়তে পারে?'

এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব জানা নেই বিনয়ের। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় এখন রিফিউজিদের নিয়ে কত যে মিছিল চোখে পড়ে! পার্কে পার্কে মিটিং। স্লোগানে স্লোগানে আকাশ চৌচির হয়ে যায়। নিজের চোখে বিনয় ক'মাস আগে মিশন রো'তে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে পুলিশের তুমুল লড়াই দেখেছে। বেপরোয়া লাঠি, টিয়ার গ্যাস, এমনকী গুলিও চালিয়েছে পুলিশ। উদ্বাস্তুরা মুখ বুজে বরদাস্ত করেনি; খোয়া ইট হাতের কাছে যা পেয়েছে তারাও পুলিশের দিকে তাক করে সমানে ছুঁড়ে গেছে।

অনেকে বলে কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্য বামপন্থী দলগুলো উদ্বাস্তুদের মধ্যে 'বেস' তৈরি করার জন্য তাদের খেপিয়ে তুলছে। লক্ষ লক্ষ শরণার্থী যাদের কোনও আশা নেই, ভবিষ্যৎ নেই, চোখের সামনে শুধুই অনন্ত তমসা, এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে নিয়ে ওরা নিজেদের শক্তি বাড়াতে চায়।

বিনয় অস্বস্তি বোধ করছিল। বলল, 'পার্টিগুলোর মোটিভ কী, আমি ঠিক বলতে পারব না। তবে নানা লোকে নানা কথা বলে।' কী বলে সেটা আর জানায় না।

চিফ কমিশনার এ ব্যাপারে আর কিছু জিগ্যেস করলেন না। একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। —'আপনি রিফিউজি সেটলমেন্টগুলোতে যান। ঘুরে ঘুরে দেখুন রিহ্যাবিলিটেশনের কাজ কীভাবে চলছে। ত্রুটি চোখে পড়লে নিশ্চয়ই লিখবেন। কনস্ট্রাকটিভ সমালোচনা সব সময় কাম্য। কিন্তু দয়া করে এমন কিছু লিখবেন না যাতে কলকাতায় আগুন লেগে যায়। তাহলে যা-ও রিফিওজি আসছে, সেটা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। পুনর্বাসনের এত বড় একটা পরিকল্পনা যাতে বানচাল না হয়ে যায় সেটা মাথায় রাখবেন। আচ্ছা, নমস্কার—' ক'পা এগিয়ে তিনি তাঁর গাড়িতে উঠে পড়েন।

এধারে নিরঞ্জন আর বিভাস চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিল, 'মালপত্তর কান্ধে (কাঁধে) তুইলা আমাগো লগে চলেন।' নিশ্চয় হগলটির (সকলের) ক্ষুদা পাইছে। কয়দিন সমুন্দুরে ঝড়-তুফানে আপনেগো দলামোচড়া কইরা ছাড়বে। আইজ সকালে 'রস'-এ নামনের পর সারাটা দিন শরীলের উপুর দিয়া মেলা (অনেক) তাফাল গেছে। আমাগো লোকেরা ভাত ডাইল মাছ তরকারি রাইন্ধা বাড়ছে। গিয়া খাইয়া শুইয়া পড়বেন। ঘুমটা জবর দরকার।'

উদ্বাস্তুরা যাবার জন্য তৈরি হতে লাগল।

শহরের যেসব দোকানদার, হোটেলওয়ালা, মুদি, সেলুনওয়ালা জড়ো হয়েছিল, চিফ কমিশনার গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তারাও সরে পড়েছে।

এধারে বিনয় বলছিল, 'সকালে পোর্টব্লেয়ারের ভি আই পি বাঙালিরা রিফিউজিদের রিসিভ করতে 'রস' আইল্যান্ডে গিয়েছিলেন। সন্ধেবেলা চিফ কমিশনার এবারডিন মার্কেটের সামনে তাদের রিসিভ করলেন। এটাই নিয়ম নাকি?'

'আপনি লক্ষ করেছেন দেখছি।' বিশ্বজিৎ বলতে লাগলেন, 'নিয়ম ঠিক নয়, তবে আন্দামানের রিফিউজি আসা শুরু হতেই এটা চলছে। আসুন, আপনি আমার সঙ্গে যাবেন—'

একটু অবাক হল বিনয়। —'কোথায়?'

'কোথায় আবার? আমার বাংলোয়।'

'সে হয় না। রিফিউজিরা আমাকে কিছুতেই ছাড়বে না।'

'আমি ওদের সঙ্গে কথা বলছি।'

'কিন্তু—'

'আবার কী?'

'কাল সকালে ওরা নতুন সেটলমেন্টের জায়গায় চলে যাবে। ওদের সঙ্গে আমারও তো যাওয়া দরকার।'

বিশ্বজিৎ হাসলেন। —'যাবেন, নিশ্চয়ই যাবেন। আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব। চিন্তা করবেন না।'

উদ্বাস্তুরা কিন্তু নাছোড়। রাত্তিরটা বিশ্বজিতের বাংলোয় গিয়ে বিনয় থাকবে, এটা জানাতেই হুলস্থুল বেধে গেল। বিনয় কড়ার করেছিল, যতদিন না আন্দামানের পুনর্বাসন কেন্দ্রে শরণার্থীরা থিতু হয়ে বসছে সে তাদের সঙ্গে থাকবে। বিনয় আন্দামানে পা দিয়েই যদি অন্য কোথাও রাত কাটাতে যায় কার ভরসায় তারা থাকবে? বিনয় কাছে না থাকলে তারা সেটলমেন্টে তো যাবেই না, এমনকী আজ রাতের জন্য নিরঞ্জনরা সেখানে তাদের নিয়ে যেতে চাইছে, যেখানেও যাবে না।

উদ্বাস্তুদের আশঙ্কাটা কোথায়, মোটামুটি আঁচ করতে পেরেছিল বিনয়। ওরা হয়তো ভেবেছে, ভুজুং ভাজুং দিয়ে আন্দামানে তাদের পৌঁছে দিয়ে বিনয় কলকাতায় চলে যাবে। বিশ্বজিৎ রাহার বাংলোয় রাত কাটাতে যাওয়াটা কৌশলমাত্র। কাল আর সে তাদের কাছে ফিরে আসবে না। আন্দামানের চিফ কমিশনার থেকে বড় বড় অফিসার এবং পুরো পুনর্বাসন দপ্তরের কর্মীরা তাদের যথেষ্ট খাতিরযত্ন করেছে। কিন্তু তাদের ওপর মাত্র একদিনে উদ্বাস্তুদের আস্থা তৈরি হয়নি। বিনয়কে তাদের পাশে চাইই চাই।

বিনয় বলল, 'আপনাদের হয়তো মনে হয়েছে, এই যে রাহাসাহেব আমাকে তাঁর বাংলোয় নিয়ে যেতে চাইছেন, এর পেছনে আমার কু-মতলব রয়েছে। কিন্তু আপনারা তো শুনেছেন, মুখের কথা খসালেই কলকাতায় ফেরা যায় না। তিন সপ্তাহ পর পর এখান থেকে কলকাতার জাহাজ ছাড়ে। কম করে তিন সপ্তাহ আমাকে এখানে থাকতেই হবে। নিশ্চিন্ত থাকুন, কাল সকালেই আপনাদের কাছে চলে আসব।'

উদ্বাস্তুরা তাকে ঘিরে ধরেছিল। ভিড়ের সামনের দিকে রয়েছে হলধর দাস। তার কাঁধে একটা হাত রেখে বিনয় বলল, 'আপনি তো জানেন, আপনাদের হেমকর্তার নাতি মিছে কথা বলে না।'

অনেক বোঝানোর পর উদ্বাস্তুরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত রাজি হল। আজ রাতটা বিনয় বিশ্বজিৎ রাহার বাংলোয় থাকতে পারে।

বিশ্বজিতের ড্রাইভার কালীপদ তাঁর জিপ নিয়ে ঘুরপথে মাঠের পাশের রাস্তায় এসে অপেক্ষা করছিল। বিনয়কে সঙ্গে করে তিনি সেদিকে চলে গেলেন।

এদিকে বিভাস আর নিরঞ্জন লাইন দিয়ে উদ্বাস্তুদের নিয়ে চলেছে এবারডিন মার্কেটের ডানধারের রাস্তার দিকে। বিনয়ের

banglabooks.in

ধারণা ওখানেই কোথাও শরণার্থীদের রাতে থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

॥ চার ॥

এবারডিন বাজার থেকে যে রাস্তাটা পশ্চিম দিকে গেছে, সেটা ধরে জিপ ছুটছিল। পাহাড়ি শহর। উঁচু-নিচু পথ। গাড়ি একবার টিলার মাথায় উঠছে, তার পরেই নেমে যাচ্ছে নিচে। চড়াই-উতরাইতে ওঠানামা করতে করতে নাচের তালে দৌড়াচ্ছে জিপটা।

বাজারের জমজমাট এলাকা ছাড়ানোর পর সব কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা। শহর এধারে তেমন দানা বাঁধেনি। দূরে দূরে ছাড়া ছাড়া দু'চারটে বাড়ি চোখে পড়ে। গাড়ি টিলার ওপর চড়লে দু'পাশে গাছ। সেখানে ঝোপঝাড়, বুনো গাছের জটলা। উতরাইতে নামলে কিন্তু দৃশ্যটা বদলে যাচ্ছে। এবার ডাইনে বাঁয়ে দু'দিকেই সমতল জমিতে ধানের খেত।

রাস্তায় অনেকটা দূরে দূরে ল্যাম্পপোস্টের গায়ে মিটমিট করে দু-একটা বাল্‌ব জ্বলছে। সেগুলো থাকা না-থাকা সমান। জোনাকির আলোও তার চেয়ে জোরালো। তবে পূর্ণিমার চাঁদ আকাশের অনেকটা উঁচুতে উঠে এসেছে। অঢেল জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ মাইল নিচের পৃথিবী।

জিপের পেছন দিকের সিটে পাশাপাশি বসেছিল বিনয় আর বিশ্বজিৎ। বেশ খানিকটা সময় চুপচাপ কেটেছে। অন্যমনস্কের মতো বাইরের দৃশ্যাবলি দেখছে বিনয়। নতুন একটা জায়গায় এলে সেখানকার সম্বন্ধে আগ্রহ থাকাটা স্বাভাবিক।

'বিনয়বাবু—'

বিশ্বজিতের ডাক কানে আসতে মুখ ফিরিয়ে তাকায় বিনয়। —'কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ। 'রস' আইল্যান্ডে উদ্বাস্তুরা নামার পর থেকে ওদের যেভাবে রিসিভ করা হয়েছে সেটা আপনার কেমন লাগল?'

'চমৎকার।' বিনয় বলতে লাগল, 'সব চেয়ে আমার ভালো লেগেছে চিফ কমিশনারকে। আন্দামানের বিশিষ্ট বাঙালিরা রিফিউজিদের ভরসা দেবার জন্য ছুটে যাবেন সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নন-বেঙ্গলি চিফ কমিশনার বাঙালি উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে এতটা সিমপ্যাথেটিক, ভাবতে পারিনি।'

চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বিশ্বজিৎকে। তাঁর মুখে বিচিত্র একটু হাসি ফুটে ওঠে। কী আছে সেই হাসিতে? ব্যঙ্গ? মজা? না অন্য কিছু?

কয়েক লহমা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে বিনয়। তারপর দ্বিধাগ্রস্তের মতো জিগ্যেস করে, 'হাসছেন যে?'

বিশ্বজিৎ বললেন, 'লোকটার দুটো চেহারা আছে। একটা আপনি দেখেছেন।'

'অন্যটা?'

'সেটা এত তাড়াতাড়ি কি বোঝা যাবে? সবে তো এলেন—' বলতে বলতে থেমে গেলেন বিশ্বজিৎ। ধীরে ধীরে মুখটা ওধারের জানলার দিকে ফিরিয়ে আনমনা তাকিয়ে রইলেন।

বিনয় বুঝে নিল, এ নিয়ে আপাতত মুখ খুলবেন না বিশ্বজিৎ। তার মনে একটা ধন্দ ঢুকে গেল। চিফ কমিশনারকে যেটুকু দেখা গেছে তাতে বেশ ভালোই লেগেছে। অমায়িক, সহানুভূতিশীল। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা কিন্তু লেশমাত্র অহমিকা নেই। এই সদয়, স্নিগ্ধ মুখের আড়ালে অন্য যে মুখটি লুকনো রয়েছে সেটা কেমন, অনুমান করতে চাইল বিনয়। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, চিফ কমিশনারের চিন্তাটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ঝিনুকের মুখ চোখের সামনে ফুটে ওঠে। উদ্বাস্তুরা তাকে ছাড়তে চাইছিল না। তবু বিশ্বজিৎ তাকে যে একরকম টেনে নিয়েই তাঁর বাংলোয় চলেছেন সেটা একদিক থেকে ভালোই হল। বিশ্বজিতের অ্যাটাচিতে উদ্বাস্তুদের নামের যে দীর্ঘ তালিকাটা রয়েছে সেটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে আজ রাতেই ঝিনুক কাদের সঙ্গে এসেছে, বার করা যাবে।

অনেকটা দৌড়ের পর একটা চৌমাথায় চলে এল বিনয়দের জিপ। কালীপদ গাড়িটা ঘুরিয়ে ডানপাশের রাস্তায় নিয়ে গেল। মোড়ের মুখেই বাঁ দিকে প্যাগোডা ধরনের বড় বিল্ডিং।

বিশ্বজিৎ ওধারের জানলা থেকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'এটা ফুঙ্গি চাউং—বুদ্ধমন্দির। আর খানিকটা গেলেই আমার বাংলো।'

বিনয়ের মনে পড়ে গেল, ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ আমলে ছিল ভারতের একটি প্রদেশ। উনিশশো পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত সেখান থেকে কয়েদিদের পাঠানো হত আন্দামানে। এদের বেশিরভাগই বৌদ্ধধর্মের উপাসক। খুব সম্ভব সেই কারণে এখানে 'ফুঙ্গি চাউং' গড়ে তোলা হয়েছে।

বুদ্ধমন্দির পেছনে ফেলে আরও দু'তিনটে ছোট ছোট টিলা পেরিয়ে একটা অনেক উঁচু টিলার ঢালে চলে এল জিপ। নিচেই উপসাগর। বিনয় আন্দাজ করে নিল এটা সিসোস্ট্রেস বে। 'রস' আইল্যান্ডের দিক থেকে বেঁকে এধারে চলে এসেছে।

টিলার গায়ে বেশ ক'টা কাঠের বাংলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

একটা দোতলা বাংলোর কমপাউন্ডের ভেতর জিপটা নিয়ে এসে থামিয়ে দিল কালীপদ।

বিশ্বজিৎ বললেন, 'এই আমার আস্তানা। আসুন—'

দু'জনে নেমে পড়ল।

বাইরের দিকে ক'টা বাল্‌ব জ্বলছিল। সেই আলোয় দেখা গেল, বাংলোর গ্রাউন্ড ফ্লোরে দু-তিনটে ঘর ছাড়া বাকি অংশটা ফাঁকা; সেখানে গাড়ি রাখার ব্যবস্থা।

একপাশ দিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। বিনয়কে সঙ্গে নিয়ে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে বিশ্বজিৎ কালীপদকে বললেন, 'আমার অ্যাটাচি আর বিনয়বাবুর সুটকেস-টুটকেস ওপরে নিয়ে আয়।'

দোতলায় উঠলেই বড় একটা হল-ঘর। কাঠের ফ্লোরে জুটের কার্পেট পাতা। তার একধারে দু'সেট বেতের সোফা, সেন্টার

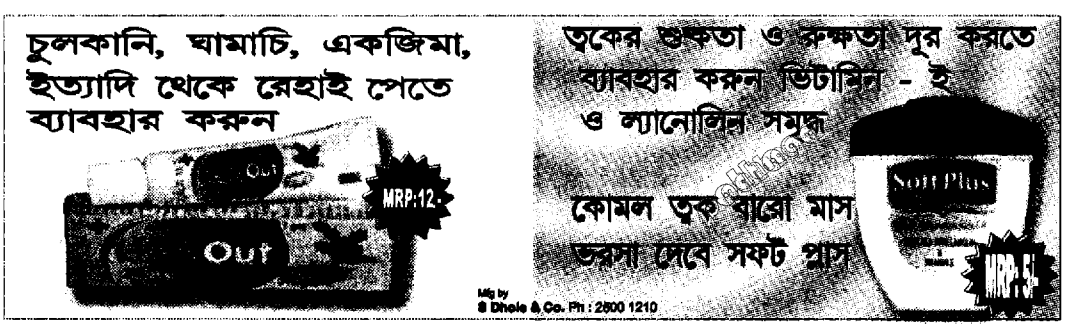

banglabooks.in

টেবিল। আরেক পাশে ডাইনিং টেবিল এবং অনেকগুলো চেয়ার। সিলিং থেকে চারটে ফ্যান ঝুলছে। দু'পাশের দেওয়ালে ল্যাম্পশেডের ভেতর জোরালো আলো জ্বলছিল। একপাশের দেওয়াল জুড়ে কাচের পাল্লা দেওয়া আলমারি। সেগুলো রকমারি বইয়ে ঠাসা। হল-ঘরটি ঘিরে চারটে বেড-রুম, কিচেন ইত্যাদি।

বিনয়দের পায়ের আওয়াজে কিচেন আর বেডরুমগুলোর দিক থেকে তিনজন বেরিয়ে এল। বয়স কুড়ি থেকে চল্লিশ বিয়াল্লিশের মধ্যে। দেখেই বোঝা যায় কাজের লোক।

একটা সোফায় বিনয়কে বসিয়ে নিজে তার পাশে বসলেন বিশ্বজিৎ। বিনয়ের সঙ্গে তিনজনের পরিচয় করিয়ে দিলেন। —'এঁর কথা তোমাদের বলেছি। যতদিন আন্দামানে আছেন, মাঝে মাঝে আমাদের এখানে এসে থাকবেন। পুবদিকের বড় ঘরটায় ওঁর জন্যে বিছানা-টিছানা করে রাখা হয়েছে তো?'

তিনজনই ঘাড় কাত করে—হয়েছে।

'রান্নাটান্না?'

ওরা জানায়, তাও হয়ে গেছে।

বিনয় বুঝতে পারে, তাকে যে এখানে নিয়ে আসবেন তা আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন বিশ্বজিৎ।

এবার কাজের লোকেদের নামগুলোও বিনয়কে জানিয়ে দেন বিশ্বজিৎ। সবচেয়ে কমবয়সি ছেলেটির নাম গোপাল, যার বয়স ত্রিশ-বত্রিশ সে কার্তিক আর বয়স্ক লোকটি হল ভুবন।

বিশ্বজিৎ ভুবনকে বললেন, 'আমাদের জন্যে গরম চা নিয়ে এসো। আগুন আগুন। ঠান্ডা শরবত যেন না হয়ে যায়।' কার্তিককে বললেন, 'জল গরম করে আমার আর বিনয়বাবুর ঘরের বাথরুমে দিয়ে আসবে। দেরি করো না।'

কার্তিক আর ভুবন ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ঝটিতে দু'জনে ভেতর দিকে চলে যায়। নিশ্চয়ই কিচেনে। তবে গোপাল একধারে উদ্‌গ্রীব দাঁড়িয়ে থাকে, যদি তাকে কোনও ফরমাশ দেওয়া হয় তারই অপেক্ষায়।

বিনয়ের কৌতূহল হচ্ছিল। কাজের লোকেরা আছে ঠিকই, তবু বাংলোটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা। একটু ইতস্তত করে জিগ্যেস করল, 'আর কারওকে তো দেখছি না।'

ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেছিলেন বিশ্বজিৎ। কয়েক পলক স্থির দৃষ্টিতে বিনয়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর চোখে কৌতুক ঝিলিক দিয়ে যায়। হঠাৎ শব্দ করে হেসে ওঠেন। স্বচ্ছ, নির্মল, প্রাণখোলা হাসি। হাসতে হাসতেই বলতে থাকেন, 'কী ভেবেছিলেন, গন্ডাখানেক আন্ডা বাচ্চা নিয়ে বেশ রসেবশে আছি? আমি একদম একা। চিরকুমার থাকব কি না, জানি না। তবে কোনও মহিলা নিয়ার ফিউচারে মিসেস রাহা হয়ে আমার লাইফে আবির্ভূত হবেন, এমন সম্ভাবনা আপাতত নেই। কাকা আছেন তাঁর কথা আপনাকে বলেছি। তিনি কনফার্মড চিরকুমার। আন্দামানের দ্বীপে দ্বীপে ঘুরে বেড়ান। রিসেন্টলি রিফিউজিরা আসতে শুরু করেছে। তাদের সঙ্গেই ইদানীং বেশির ভাগ সময়টা কাটান। পোর্টব্লেয়ারে যখন আসেন, আমার কাছেই থাকেন।'

ভুবন চা দিয়ে গেল। কাপ তুলে নিয়ে বিশ্বজিৎ বলতে লাগলেন, 'অবশ্য আমার মা, দুই বোন আর এক ভাই কলকাতার বরানগরে থাকে। বছরে একবার এসে কয়েকদিন এখানে কাটিয়ে যায়। আমার বাবা নেই। এই যে বাংলোটা দেখছেন এটা পুরোপুরি ভৃত্যতান্ত্রিক। ভুবন, গোপাল, কার্তিক, আর কালীপদ দিনের পর দিন আমার সব ঝক্কি সামলায়।'

কালীপদ বিনয়ের মালপত্র আর বিশ্বজিতের অ্যাটাচিটা মাথায় কাঁধে চাপিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এল। বিশ্বজিৎ তাকে বললেন, 'বিনয়বাবুর জিনিসগুলো পুব দিকের ঘরে রেখে অ্যাটাচিকেসটা আমার ঘরের আলমারিতে ঢুকিয়ে রাখবে।'

বিনয়ের বুকের ভেতর জোরালো ঝাঁকুনি লাগে। বলতে যাচ্ছিল, 'অ্যাটাচিটা এখানে থাক। রিফিউজিদের লিস্টটা দেখব'— কিন্তু বলা গেল না। ঝিনুকের জন্য সে কতটা ব্যগ্র হয়ে আছে, তার সঙ্গে ঝিনুকের সম্পর্কটা কী ধরনের সেসব বিশ্বজিৎকে জানানো যায়নি। মাত্র একদিনের পরিচয়ে জীবনের গোপন দহন কি খুলে মেলে দেখানো যায়? বিশ্বজিৎকে সে শুধু বলেছিল, ঝিনুক নামে একটি মেয়ের খোঁজ করছে। চেনাজানা কারও সম্বন্ধে জানতে চাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সেটাকে খুব সম্ভব লঘুভাবেই নিয়েছেন বিশ্বজিৎ, তেমন গুরুত্ব দেননি। হয়তো ভেবেছেন, যখন হোক নামের তালিকা ঘেঁটে বিনয়কে বললেই হল। কিন্তু বিনয়ের এই সন্ধানের পেছনে কতখানি উৎকণ্ঠা, কতখানি ব্যাকুলতা আর আবেগ জড়িয়ে রয়েছে, তিনি বুঝবেন কী করে?

বিশ্বজিৎ এবার বললেন, 'আমার কথা শোনালাম। জগদীশ কাকা লিখেছেন, লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর সঙ্গে ইস্ট পাকিস্তান থেকে আপনি ইন্ডিয়ায় চলে এসেছেন। ব্যস, এটুকুই। আপনার সম্বন্ধে, পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্বন্ধে খুব জানতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু রাত হয়েছে। তাছাড়া সারাদিনের স্ট্রেনে আপনি আমি দু'জনেই ভীষণ টায়ার্ড। আজ থাক। পরে আপনার কথা শোনা যাবে।'

কার্তিক এসে খবর দিল বাথরুমে গরম জল দেওয়া হয়েছে।

খাওয়াদাওয়া চুকতে চুকতে বেশ রাত হয়ে গেল। বিনয়কে পুব দিকের ঘরে পৌঁছে দিয়ে দক্ষিণ দিকে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন বিশ্বজিৎ।

বিনয়ের ঘরের মাঝখানে মস্ত খাট ছাড়াও রয়েছে আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, আর্ম চেয়ার, মেঝেতে জুট কার্পেট ইত্যাদি। শিয়রের দিকে এবং ডানপাশে কাঠের দেওয়ালের গায়ে মস্ত জোড়া জানালা। পাল্লাগুলো খোলা।

ধবধবে নরম বিছানায় কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল বিনয়। দুই দেওয়ালে দু'টো আলো জ্বলছিল; এক সময় নিভিয়ে দিয়ে শুয়েও পড়ে সে।

সাড়ে চার দিনের সমুদ্রযাত্রা, তার ভেতর পুরো একটা রাত সাইক্লোনের তুমুল তাণ্ডবের মধ্যে কেটেছে। আজ 'রস' আইল্যান্ডে নামার পর লহমার জন্যও বিশ্রাম হয়নি। কত মানুষ, কত রকমের ঘটনা, সারাক্ষণ হইচই। এসবের মধ্যে গা এলিয়ে জিরিয়ে নেবার মতো ফুরসত কোথায়?

সারা শরীরে অসীম ক্লান্তি। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ার কথা। কিন্তু ঘুম আসছে না। খানিকটা সময় এপাশ ওপাশ করে উঠে পড়ল বিনয়। বিছানা থেকে নেমে শিয়রের দিকের জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বাঁয়ে ঘন জঙ্গলে ঢাকা মাউন্ট হ্যারিয়েটের গায়ে সেই সাদা ক্রসটা চোখে পড়ছে। ডাইনে কোনাকুনি পাহাড়ের মাথায় সেলুলার জেল। সামনের দিকে সোজাসুজি যতদূর চোখ যায় উপসাগর—সিসোস্ট্রেস বে।

পোর্টব্লেয়ার এখন একেবারে নিঝুম। কীটপতঙ্গ, সরীসৃপ বা মানুষ, কেউ জেগে নেই। কিন্তু সমুদ্র বুঝিবা কখনও ঘুমায় না। বহুদূর থেকে জ্যোৎস্নার রুপোলি তবক-মোড়া ঢেউয়ের পর ঢেউ সশব্দে আছড়ে পড়ছে পাড়ে। অবিরল। ক্লান্তিহীন। আর আছে জোরালো হাওয়া; সমুদ্র ফুঁড়ে উঠে এসে শহরের বাড়িঘর, উঁচু উঁচু ঝাঁকড়া-মাথা মহা মহা বৃক্ষ নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছে।

কোনও দিকে লক্ষ নেই বিনয়ের। সমস্ত কিছু ছাপিয়ে ঝিনুকের মুখ চরাচর জুড়ে চোখের সামনে ফুটে উঠছে। এক সপ্তাহ, দু'সপ্তাহ কি আরও বেশি, যতদিন লাগুক, মধ্য আন্দামানে সে যাবেই। একবার যখন দেখা গেছে, খুঁজে তাকে বার করবেই। বুঝিয়ে দেবে অপমানে, অভিমানে ঝিনুক যে নিরুদ্দেশ হয়েছিল সেজন্য সে দায়ী নয়। ঝিনুকের মানসিক যাতনা, যাবতীয় ক্লেশ আর ক্ষোভ সে ঘুচিয়ে দেবে।

ভাবতে ভাবতে আচমকা মস্তিষ্কের গোপন কুঠুরি থেকে আরও ক'টি মুখ বেরিয়ে এল। আনন্দ সুনীতি হিরণ সুধা এবং— এবং ঝুমা।

কী আশ্চর্য, খিদিরপুর ডকে একটি তরুণীর মুখে ঝিনুকের আদলটি দেখে সে উদ্‌ভ্রান্তের মতো জাহাজের খোলে সাড়ে চার

banglabooks.in

দিন তাকে খুঁজে বেড়িয়েছে। 'রস' আইল্যান্ডে নামার পরও সেই সন্ধানে ছেদ পড়েনি। পাঁচ দিনেরও বেশি সময় ঝিনুকের জন্য বুকের ভেতরটা এমনই উতরোল হয়ে আছে যে আর কারও কথা মনে পড়েনি; বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলে গিয়েছিল বিনয়।

এক কুহেলিবিলীন সন্ধ্যায় ভবানীপুরের বাড়ি থেকে কারওকে কিছু না জানিয়ে সেই যে ঝিনুক চলে গিয়েছিল তারপর ক'টা মাস কীভাবে যে কেটেছে, বিনয়ই শুধু জানে। কেউ যেন তাকে অপার শূন্যতায় ছুঁড়ে দিয়েছিল। প্রতি মুহূর্তে মনে হত কারা বুঝি বুকে অবিরাম শেল বিঁধিয়ে চলেছে। বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না।

কিন্তু সময় এক অলৌকিক জাদুকর। ধীরে ধীরে তার সব দুঃখ, সব আকুলতা কখন যে হরণ করে নিতে শুরু করেছিল, টের পায়নি বিনয়। বাকি যেটুকু ছিল তা প্রায় মুছে দিয়েছে ঝুমা। এই এক পরমাশ্চর্য মেয়ে। বেপরোয়া, দুঃসাহসী। যে কোনও যুবককে আচ্ছন্ন করার মতো ম্যাজিক তার হাতে আছে। তা-ই বলে ঝিনুকের কাছ থেকে বিনয়কে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা সে করেনি। বরং চিরদুঃখী, ধর্ষিত মেয়েটার জন্য তার বুকের ভেতর ছিল অফুরান সহানুভূতি।

কিন্তু ঝিনুক নিঃশব্দে নিখোঁজ হবার পর জীবনের যে অংশটা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল অপার মায়ায় আর মাধুর্যে তা ক্রমশ ভরে দিয়েছে ঝুমা। নিয়তিতাড়িতের মতো তার কাছে না গিয়ে যেন উপায় ছিল না বিনয়ের।

আন্দামানে আসার আগে যখন বিনয় ঝুমার সঙ্গে দেখা করতে যায় সে বলেছিল, রোজ না হলেও দু'তিন দিন পর পর বিনয় যেন চিঠি লেখে। ঝুমা তার জন্য অনন্ত আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে আছে।

জীবনের তলকূল পাওয়া ভার। সময়ের পাকে পাকে কত অজানা রহস্য যে লুকিয়ে থাকে; আচমকা বেরিয়ে এসে ভবিষ্যতের সমস্ত পরিকল্পনা আর স্বপ্ন তছনছ করে দেয়। কে জানত আন্দামানের জাহাজে আবার ঝিনুকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে?

আচমকা ঝুমা এবং ঝিনুক চোখের সামনে থেকে সরে যায়। অপার্থিব কোনও দর্পণে নিজের চেহারাটা দেখতে পায় বিনয়। প্রতিবিম্ব আঙুল তুলে তীব্র শ্লেষের সুরে বলে, 'বাহ্ বাহ্, চমৎকার। যেই ঝিনুক নিরুদ্দেশ হল, অমনি ঝুমার দিকে ঢলে পড়লে। যে নারী কৈশোরের শুরু থেকে তোমার শ্বাসবায়ুতে জড়িয়ে আছে তার স্মৃতি নিয়ে দিন কাটিয়ে দেওয়া যেত না? একটাই তো জীবন। হাতে কত কাজ তোমার। দেখতে দেখতে সময় কেটে যেত।'

আয়নার ছায়া আরও বলে, 'তুমি একটা নোংরা, হীন মানুষ। সংযম নেই, একাগ্রতা নেই, নিষ্ঠা নেই। যেই ঝিনুকের সঙ্গে দেখা হল অমনি তার জন্য উতলা হয়ে উঠেছ। দুই যুবতীকে দুই আঙুলের ডগায় দাঁড় করিয়ে এখন কী খেলা খেলতে চাও? বিশ্বাসঘাতক। একসঙ্গে দু'টি মেয়ের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করতে তোমার আটকাবে না? মধ্য আন্দামানে যদি ঝিনুকের সঙ্গে দেখা হয়, কী করবে তাকে নিয়ে? ওদিকে ঝুমার সঙ্গে তোমার যে সম্পর্কটা গড়ে উঠেছে তার কী হবে? কী তার ভবিষ্যৎ?'

বিনয় আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করছে। স্নায়ুমণ্ডলী ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ছে। এলোমেলো পা ফেলে, প্রায় টলতে টলতে এসে বিছানায় নিজের শরীরটাকে ছুঁড়ে দিল।

খুব ভোরে ওঠা বহুদিনের অভ্যাস বিনয়ের। আজ কিন্তু একটু দেরি হয়ে গেল। ঘুম ভাঙতে চোখে পড়ল, সিসোস্ট্রেস বে অনেক দূরে যেখানে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে তারও ওধারে জলতল থেকে যেন সূর্যটা আকাশের ঢাল বেয়ে বেশ খানিকটা ওপরে উঠে এসেছে।

সকালের লাল টকটকে সূর্য এখন রং পালটে সোনালি হতে শুরু করেছে। খোলা জানলা দিয়ে অঢেল রোদ এসে পড়েছে ঘরে।

কয়েক পলক বাইরে তাকিয়ে রইল বিনয়। কাল রাতে যেমনটা শুনেছিল আজও উপসাগর থেকে পাড়ে ঢেউ ভেঙে পড়ার শব্দ উঠে আসছে বিরামহীন। আকাশ জুড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে সিগাল। এই সাগর পাখিদের নজর কিন্তু জলের দিকে। মাছের নড়াচড়া দেখলেই ছোঁ দিয়ে পড়ছে। ধারালো ঠোঁট সামুদ্রিক কোনও মাছ গেঁথে ফের উঠে যাচ্ছে।

বেশিক্ষণ বসে থাকা গেল না। চকিতে মনে পড়ে গেল, সকালের দিকেই উদ্বাস্তুদের সঙ্গে নতুন সেটলমেন্টে যেতে হবে। ব্যস্তভাবে উঠে পড়ে বিনয়। আর কার্তিক তখনই এক বালতি গরম জল নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল। বলল, 'তাড়াতাড়ি চান করে নিন। সারের (স্যারের) চান হয়ে গেচে। আপনার জন্যি হল-এ বসে আচেন।' সার হলেন বিশ্বজিৎ রাহা।

বালতিটা লাগোয়া বাথরুমে নিয়ে চলে যাচ্ছিল কার্তিক, তাকে থামিয়ে বিনয় জিগ্যেস করে, 'এখনও তো ঠান্ডা পড়েনি। কালও গরম জল দিয়েছিলে, আজও দিলে—' বলতে বলতে থেমে যায়।

ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেছিল কার্তিক। সে বুঝিয়ে দিল। বর্ষার জল পোর্টব্লেয়ারে ধরে রাখার ব্যবস্থা আছে। সারাবছর তা সাপ্লাই করা হয়। একে জমা জল, তার ওপর এখানকার সামুদ্রিক নোনা বাতাস। শুধু জমানো জলে চান করলে শরীর খারাপ হবে। তার সঙ্গে গরম জল মিশিয়ে নিলে ভয় নেই।

মিনিট কুড়ির ভেতর শেভ করে, চান সেরে, পোশাক পালটে হল-ঘরে চলে এল বিনয়। আন্দামানের জাহাজে ওঠার আগে প্যান্ট শার্ট কিনেছিল। এখন তা-ই পরেছে সে।

একটা সোফায় বসে সেন্টার টেবিলের ওপর ঝুঁকে খুব মন দিয়ে একতাড়া কাগজ দেখছিলেন বিশ্বজিৎ। কাছাকাছি আসতেই বিনয় চিনতে পারল। কাল যে উদ্বাস্তুরা এসেছে কাগজগুলোতে তাদের নামটাম টাইপ করা রয়েছে। বিশ্বজিৎ তাহলে ঝিনুকের কথা ভুলে যাননি। সে কাদের সঙ্গে বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপপুঞ্জে এসেছে, নিশ্চয়ই জেনে গেছেন তিনি। অফুরান আশায় আর উত্তেজনায় বুকের ভেতরটা দুলতে থাকে বিনয়ের।

পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকালেন বিশ্বজিৎ। বললেন, 'বসুন—'

বিশ্বজিতের দিকে চোখ রেখে মুখোমুখি একটা সোফায় বসে পড়ল বিনয়।

বিশ্বজিৎ ধীরে ধীরে মাথাটা ডাইনে থেকে বাঁয়ে, বাঁয়ে থেকে ডাইনে হেলাতে হেলাতে বললেন, 'নো স্যার, তাপসী লাহিড়ি বা ঝিনুক নামে কারওকে পাওয়া গেল না। আমি পুরো লিস্টটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি। ওই নাম দু'টো কোথাও নেই।'

এক ফুঁয়ে সব আলো কেউ যেন নিভিয়ে দিয়েছে। চতুর্দিক থেকে অনন্ত হতাশা বিনয়কে ঘিরে ধরতে থাকে।

বিহ্বলের মতো সে বলে, 'নেই?'

বিশ্বজিৎ কী ভেবে বললেন, 'আমার চোখে হয়তো এড়িয়ে গেছে। আপনি বরং একবার দেখুন।'

কাঁপা হাতে বিশাল লিস্টটা তুলে নেয় বিনয়। দৃষ্টিশক্তিকে প্রখর করে রুদ্ধশ্বাসে প্রতিটি পাতা আঁতিপাঁতি খুঁজতে থাকে। নেই, নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোথাও ঝিনুক থাকতে পারে কিন্তু এই তালিকায় নেই।

খিদিরপুর ডকে আর 'রস' আইল্যান্ডে আবছাভাবে একটি মেয়ের মুখে ঝিনুকের আদল চোখে পড়েছিল। পরে মনে হয়েছিল, সেটা হয়তো ভুল। কিন্তু 'চলুঙ্গা' জাহাজে তাকে স্পষ্ট দেখা গেছে। তখন বিকেল। পড়ন্ত বেলার অজস্র আলোয় ভরে ছিল সমস্ত চরাচর। তার ভেতর চোখের ভ্রম হয় কী করে? চকিতে বিদ্যুৎতাড়িত গতিতে একটা সংকেত বিনয়ের মাথার ভেতর খেলে যায়। যার সঙ্গে এসে থাক, ঝিনুক তাকে নিজের আসল নামটা নিশ্চয়ই জানায়নি। এ নিয়ে তার মনে এখন আর লেশমাত্র ধন্দ নেই। মিডল আন্দামানে গেলে সব সংশয়ের অবসান হবে।

banglabooks.in

তার সংকল্প আরও দৃঢ় হয়। মধ্য আন্দামানে তাকে যেতে হবে। যেতেই হবে।

সেন্টার টেবিলে লিস্টটা নামিয়ে রাখে বিনয়। বিশ্বজিৎ তাকে লক্ষ করছিলেন। জিগ্যেস করলেন, 'নিজের চোখে দেখলেন তো?'

আস্তে মাথা নাড়ে বিনয়।— 'দেখলাম। নেই।' মনের ভেতর কোন গূঢ় ভাবনা চলছে সেটা আর জানায় না।

রান্নার লোকটি এসে বলে, 'সার (স্যার), খাবার হয়ে গেছে। দেব?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, দাও—' বিশ্বজিৎ উঠে পড়লেন।— 'চলুন বিনয়বাবু—'

হল-ঘরের একধারে সমুদ্রের দিকের জানলার পাশে ডাইনিং টেবিল। সেখানে গিয়ে বসতে না- বসতেই ভুবন দু'জনকে বড় বড় প্লেটে লুচি তরকারি বেগুনভাজা আর মিষ্টি দিয়ে গেল।

বিশ্বজিৎ বললেন, 'পেট ভরে খেয়ে নিন। খাওয়া হলেই বেরিয়ে পড়ব। জেফ্রি পয়েন্টে পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল হয়ে যাবে। তার আগে খাবারদাবার কিন্তু মিলবে না।'

বিনয় জিগ্যেস করল, 'জেফ্রি পয়েন্টটা কোথায়?'

'এখান থেকে অনেকটা দূরে। পঞ্চাশ বাহান্ন মাইল তো হবেই। সমুদ্রের একটা 'বে' আছে ওই দিকটায়। ওখানে রিফিউজিদের নতুন সেটলমেন্ট বসানো হচ্ছে।'

'ওখানে জঙ্গল নেই?'

বিশ্বজিৎ হাসলেন।— 'আন্দামানে এমন কোনও জায়গা পাবেন না যেখানে জঙ্গল নেই। জেফ্রি পয়েন্টেও ডিপ ফরেস্ট। গেলেই দেখতে পাবেন।'

গভীর জঙ্গলে কীভাবে বসতি গড়ে উঠছে, ভেবে পেল না বিনয়। তবে এ নিয়ে সে আর কোনও প্রশ্ন করল না।

খাওয়া হয়ে গেলে কার্তিককে ডেকে বললেন, 'এই স্যারের সঙ্গে ওঁর ঘরে যাও। ওঁর মালপত্র গোছগাছ করে কালীপদর গাড়িতে রেখে আসবে।'

কিছুক্ষণের মধ্যে বিনয়কে সঙ্গে নিয়ে নিচে নেমে এলেন বিশ্বজিৎ। জিপে স্টিয়ারিং ধরে বসে ছিল কালীপদ। গাড়িটা বেশ প্রশস্ত। সামনের দিকে ড্রাইভার ছাড়াও দু'জন বেশ আরাম করে বসতে পারে।

বিশ্বজিৎ তার ফ্রন্ট সিটেই উঠে বসল। বিনয়ের সুটকেস হোল্ড-অল পেছন দিকের সিটে রেখে গিয়েছিল কার্তিক।

কালীপদকে কিছু বলতে হল না। খুব সম্ভব তার জানা আছে, কোন দিকে যেতে হবে। স্টার্ট দিয়ে ঢাল বেয়ে খানিকটা নেমে ডানধারের রাস্তা ধরে জিপটাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলল।

চড়াই উতরাই পেরিয়ে গাড়ি চলেছে তো চলেছেই। রাস্তার দু'ধারে কোথাও খাদ, কোথাও সমতল জমি। খাদে জঙ্গল মাথা তুলে আছে; কোথাও বা ধানের খেত। মাঝে মাঝে কাঠের বাড়ি, দু'চারটে দালান-কোঠা।

কাল রাত্তিরে ওই পথ দিয়েই বিশ্বজিতের বাংলোয় গিয়েছিল বিনয়। তখন পরিপূর্ণ চাঁদ আলো ঢেলে দিচ্ছিল নিচের পৃথিবীতে। সমস্ত কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। এখন এই দিনের বেলাতেও রাস্তাঘাট এবং দুধারের দৃশ্যাবলি চিনতে অসুবিধা হল না। ছবির মতো সব মাথায় গাঁথা হয়ে গেছে।

ফুঙ্গি চাউং পার হয়ে জিপের মুখ ডান পাশের রাস্তার দিকে যখন কালীপদ ঘোরাচ্ছে, রীতিমতো অবাকই হল বিনয়। কেননা, তাদের বাঁ দিকে যাবার কথা। সেখানে এবারডিন বাজারের লাগোয়া দু তিনটে বাড়িতে উদ্বাস্তুরা রয়েছে। বিনয় ভেবেছিল সকালে সেখানে যাবে তারা। তারপর উদ্বাস্তুদের সঙ্গে সেটলমেন্টের দিকে রওনা হবে।

গলার স্বর সামান্য উঁচুতে তুলে বিনয় বলল, 'এ কী, আমরা এবারডিন মার্কেটে যাব না?'

বিশ্বজিৎ বললেন, 'না'।

'তা হলে?'

'আমরা সোজা পোর্টে যাচ্ছি।'

পোর্ট হল বন্দর। সেখানে কেন যেতে হবে বোঝা যাচ্ছে না। বিনয় বিমূঢ়ের মতো জিগ্যেস করল, 'কিন্তু রিফিউজিরা?'

বিশ্বজিৎ বললেন, 'বিভাসরা এতক্ষণে ওদের নিয়ে সেখানে পৌঁছে গেছে। পোর্ট থেকে আমরা একসঙ্গে সেটলমেন্টে যাব।'

জিপ মোড় ঘুরে ফের দৌড় শুরু করল। এতক্ষণ দু'পাশে ছাড়া ছাড়া কিছু বাংলো জাতীয় বাড়ি চোখে পড়ছিল। কোনওটাই কাছাকাছি নয়, একটার সঙ্গে অন্যটার দূরত্ব অনেকখানি।

ক্রমশ বাড়ির সংখ্যা বাড়ছে। কাঠের বাড়ির চাইতে পাকা বিল্ডিং বেশি। একতলা, দোতলা, মাঝে মাঝে দু-একটা তেতলাও। বেশ কটা কাঠ চেরাইয়ের কারখানাও চোখে পড়ল। শহর এদিকটায় দস্তুর মতো জমজমাট। রাস্তায় প্রচুর লোকজন। জিপ, ভ্যান, কিছু প্রাইভেট কারও ব্যস্তভাবে পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে।

একেকটা এলাকা পেরিয়ে যেতে যেতে বিশ্বজিৎ বলে যাচ্ছেন, 'এই জায়গাটা ভিলানিপুর,— এটা হল হ্যাডো—' ইত্যাদি।

একসময় বিশ্বজিতের জিপ পোর্টে পৌঁছে গেল।

banglabooks.in

॥ পাঁচ ॥

মূল পোর্টের গা ঘেঁষে কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। সেগুলোর পাশে কালীপদ জিপটা পার্ক করতেই বিশ্বজিৎ বিনয়কে নিয়ে নেমে পড়লেন। কালীপদকে বললেন, 'বিনয়বাবুর লাগেজ জেটিতে নিয়ে এসো।'

পার্কিং এরিয়া থেকে খানিকটা এগলে মস্ত গেট। গেটের পর ডাইনে বাঁয়ে দু' তিনটে বিল্ডিং। মাঝখান দিয়ে সোজা রাস্তা চলে গেছে। বিল্ডিংগুলোতে জাহাজ কোম্পানির অফিস। কোম্পানির ক'জন কর্মচারী এধারে ওধারে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। অলস আড্ডার মেজাজে। নগন্য পোর্ট, বিনয়ের মনে হল, খুব সম্ভব এই বন্দরে সবসময় তেমন ব্যস্ততা থাকে না। বিশ্বজিৎকে দেখে ওরা শশব্যস্তে এগিয়ে আসে। —'নমস্কার স্যার, রিফিউজিদের নিয়ে বিভাসবাবুরা এসে গেছেন। চলুন স্যার—'

বিশ্বজিৎ যে পোর্টক্লেয়ারের একজন জবরদস্ত অফিসার সেটা টের পাচ্ছিল বিনয়। বিশ্বজিৎ ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট এবং রিফিউজি ডিপার্টমেন্টের একজন হর্তাকর্তা, জাহাজি ব্যাপারটা তাঁর এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না, তবু কখন কী ঝঞ্ঝাটে ফেঁসে যাবে তা তো বলা যায় না, তাই এখানকার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরদের তুষ্ট রাখতে হয়। সেই কারণেই খাতিরের এমন বহর।

কর্মচারীরা যে বিভাসদেরও চেনে তাও জানা গেল। এ ধরনের ছোট শহরে সবাই সবার পরিচিত।

বিশ্বজিৎ প্রতি-নমস্কার জানিয়ে বললেন, 'আপনাদের খবর সব ভালো তো?'

'হ্যাঁ স্যার—'

বিশ্বজিৎরা হাঁটছিলেন। পাশাপাশি কর্মচারীরা চলেছে। বিশ্বজিৎ বললেন, 'আপনাদের আর কষ্ট করে আসতে হবে না।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে! কর্মচারীরা চলতেই থাকে। নাছোড়বান্দাদের কীভাবেই বা ঠেকানো যায়। বিশ্বজিৎ আর কিছু বললেন না।

লম্বা প্যাসেজ পেরিয়ে বিনয়রা মস্ত এক জেটিতে চলে এল। বিশ্বজিৎ বললেন, 'এর নাম চ্যাথাম—'

চ্যাথামের কথা অনেক আগেই বিভাসদের মুখে শুনেছে বিনয়। এই প্রথম দেখল।

জেটির পশ্চিম কোনায় স্টিমশিপ 'মহারাজা' নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। কাল 'রস' আইল্যান্ডে উদ্বাস্তুদের নামিয়ে বিশাল জলযান এদিকেই এসেছিল। পাহাড়ের আড়াল থাকায় চ্যাথাম জেটিটা তখন চোখে পড়েনি।

জেটির মাঝখানে উদ্বাস্তুরা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছে। সঙ্গে তাদের লটবহর। সবাই চুপচাপ। কেমন যেন উদাসীন। সরকারি বাবুরা যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানেই তো যেতে হবে। এমন একটা নিরুপায় ভাব তাদের চোখেমুখে। চার দিন সমুদ্র আর এক রাত এবারডিন মার্কেটে কাটিয়ে দুশ্চিন্তা করার মতো শক্তিটুকুও বুঝিবা আর নেই। ভাঙাচোরা, ছিন্নমূল মানুষগুলো নিয়তির হাতে নিজেদের সঁপে দিয়ে উপসাগরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

বিভাস, নিরঞ্জন এবং পুনর্বাসন দপ্তরের ক'জন কর্মচারী উদ্বাস্তুদের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। খানিক দূরে তিরিশ-চল্লিশজনের এক পাঁচমেশালি জটলা। মুখ-চোখ এবং দাড়ি পাগড়ি দেখে বর্মি এবং শিখদের চেনা যাচ্ছে। বাকিরা খুব সম্ভব তামিল, মালাবারি মোপলা এবং ভারতের নানা এলাকার লোক। দু'চারজন বাঙালিও থাকতে পারে। সবাই বেশ বয়স্ক। পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন থেকে ষাট-পঁয়ষট্টির ভেতর বয়স।

জেটির গায়ে এক পাশে নোঙর ফেলে আছে 'স্টিমশিপ মহারাজা'। অন্যদিকে কালকের সেই দুটো স্টিমলঞ্চ 'সি-গাল' আর 'নটিলাস' লোহার শিকল দিয়ে জেটির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে।

বিশ্বজিৎ বিনয়কে নিয়ে উদ্বাস্তুদের দিকে এগিয়ে গেলেন। শিপিং কোম্পানির কর্মচারীরা অবশ্য থেমে গেল। আন্দামান-নিকোবর আইল্যান্ডসের ম্যাজিস্ট্রেটকে খানিকক্ষণ সঙ্গ দিয়ে যথেষ্ট সম্মান দেখানো হয়েছে। তারা ধীরে ধীরে ফিরে যেতে লাগল।

হলধর সূত্রধর, মাখন রুদ্রপাল এবং আরও কয়েকজন বিনয়কে দেখতে পেয়েছিল। উদ্বাস্তুদের দঙ্গল থেকে তারা প্রায় দৌড়েই চলে আসে।

হলধর এক নিঃশ্বাসে তড়বড় করে বলে যায়, 'ছুটোবাবু আইজ বিহানে উইঠা আপনের লেইগা পথের দিকে তাকাইয়া আছিলাম। কিন্তুক আপনে আইলেন না। হেরপর সরকারি বাবুরা যহন এই জাহাজঘাটায় লইয়া আইল, জবর ডরাইয়া গ্যাছিলাম। হগলে (সকলে) কওয়াকওয়ি করতে আছিল আপনে ভাটকি (ফাঁকি) দিয়া কইলকাতায় ফিরা যাইবেন। অহন কী ভালা যে লাগতে আছে।' তার ষাট-বাষট্টি বছরের শুষ্ক চোখ বাষ্পে ভরে যেতে লাগল। আনন্দে। ক্ষণিক উচ্ছ্বাসে।

মাখন অপরাধী অপরাধী মুখ করে বলল, 'সকাল তরি (পর্যন্ত) আপনেরে না দেইখা ভাবছিলাম সমুন্দুরের মধ্যিখানে আমাগো বিসজ্জন দিয়া বুঝিন চইলাই যাইবেন। আমারে মাপ কইরা দ্যান।' সে হাতজোড় করল।

বাকি সবাই একই সুরে বলে যেতে লাগল।

বিনয় হেসে হেসে বলে, 'দেখলেন তো আমি আপনাদের ফাঁকি দিই নি। ঠিক এসে গেছি। আপনারা যে যার জায়গায় ফিরে যান। আমি ওঁদের কাছে যাচ্ছি।' একটু দূরে বিশ্বজিৎ নিরঞ্জন আর বিভাসের সঙ্গে কথা বলছেন। সে সেদিকে চলে গেল।

বিশ্বজিৎ জিগ্যেস করছিলেন, 'নতুন সেটলমেন্টে রিফিউজিদের থাকার মতো সব ব্যবস্থা করা হয়েছে?'

নিরঞ্জন বলল, 'হয়েছে।'

'চেনম্যান আর জরিপদাররা ওখানে আছে তো?'

'নিশ্চয়ই।'

চেনম্যান এবং জরিপদারদের ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল না বিনয়ের। এ নিয়ে সে কোনও প্রশ্ন করল না। সেটলমেন্টে গেলেই সব জানা যাবে।

বিশ্বজিৎ বললেন, 'আর দেরি করে কী হবে? যাওয়ার ব্যবস্থা করো।'

হাঁকাহাঁকি করে উদ্বাস্তুদের দুই স্টিমলঞ্চ 'সি-গাল' আর 'নটিলাস'-এ তুলে ফেলল নিরঞ্জনরা। তারপর সেই বর্মি শিখ টিমেরা উঠল। সবার শেষে বিশ্বজিৎ আর বিনয়।

বিনয়রা উঠেছিল 'নটিলাস'-এ। নিচের ডেকটা উদ্বাস্তুতে বোঝাই। সেখানে জায়গা না পেয়ে অনেকে আপার ডেকেও চলে গেছে। তাদের দেখাশোনা করছিল নিরঞ্জন। বিভাস বাকি উদ্বাস্তুদের নিয়ে 'সি-গাল'-এ উঠেছে।

বিশ্বজিৎ বিনয়কে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে 'নটিলাস'-এর দোতলায় চলে এল। এখানে ডেকের একদিকে কিছু উদ্বাস্তু বসে আছে। অন্য ধারে বর্মি, শিখ এবং নানা জাতের লোকের জটলা। বিশ্বজিতের কাছে এসে বর্মিরা সসম্ভ্রমে কপালে হাত ঠেকিয়ে কেউ বলছে 'নমস্তে', কেউ বা 'আদাব'।

বিশ্বজিৎ প্রতি-নমস্কার জানিয়ে তাদের খোঁজখবর নিচ্ছিলেন—কে কেমন আছে, কাজকর্ম কেমন চলছে, ছেলেমেয়েরা কে কী করছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

চ্যাথাম জেটিতে বিনয় লোকগুলোকে দেখেছিল ঠিকই, তবে খানিকটা অন্যমনস্কর মতো। এবার ভালো করে লক্ষ করল। সবার গায়ের চামড়া কর্কশ, তামাটে। গালে গলায় কপালে সরু সরু অগুনতি রেখা; সেখানে পুঞ্জীভূত রুক্ষতা জমাট বেঁধে আছে। আন্দাজ করল, এরা হয়তো দীর্ঘকাল এই দ্বীপে রয়েছে। আন্দামানের অজস্র তীব্র রোদ, বছরে দু'বার প্রবল বৃষ্টিপাত আর নোনা হাওয়া তাদের চেহারায় শুষ্ক কাঠিন্য এনে দিয়েছে। বোঝা যাচ্ছিল বিশ্বজিৎকে ওরা যেমন চেনে, তিনিও তাদের সবাইকে চেনেন।

banglabooks.in

একটা লম্বা-চওড়া লোক, মুখে কাঁচা-পাকা অজস্র দাড়ি— খুব সম্ভব সে পাঠান— জিগ্যেস করল, 'সাহাব, পাকিস্তানসে আর কত আদমি আন্দামানে আসবে?'

বিশ্বজিৎ হাসলেন, 'অনেক। এই তো সবে শুরু।'

লোকগুলো আর দাঁড়াল না; যেখানে ছিল সেখানে ফিরে গেল।

বিশ্বজিৎ বিনয়ের দিকে তাকান। —এঁরা কারা জানেন?'

আস্তে মাথা নাড়ে বিনয়। —'না'।

'এক সময়ের দুর্ধর্ষ সব কয়েদি। যাবজ্জীবন জেল খাটতে আন্দামান পাঠানো হয়েছিল। এদের লাইফ হিস্ট্রি শুনলে বুকের রক্ত হিম হয়ে যাবে। মুক্তি পাবার পর বিয়ে-শাদি করে শান্তশিষ্ট গৃহপালিত প্রাণী হয়ে গেছে।'

বিনয় যা ভেবেছিল— লোকগুলো অনেককাল আন্দামানে আছে—সেটা মিলে গেছে। কিন্তু নানা দুষ্কর্মের জন্য তাদের যে কালাপানি পাঠানো হয়েছিল তা বোঝা যায়নি। সে রীতিমতো অবাক হল অন্য একটা কারণে। জিগ্যেস করল, 'এই ক্রিমিনালদের বিয়ে হল কী করে? মেয়ে পেল কোথায়?'

'আন্দামানে তাদের জন্যে সুটেবল ব্রাইড মানে যোগ্য পাত্রী ছিল। বিয়ে আটকায় কে?'

'এই তো সবে দেশ স্বাধীন হল। তার আগে আসামীদের জন্যে এখানে কনে মজুত ছিল?'

'ছিল, ছিল'— হাসতে হাসতে বিশ্বজিৎ বললেন, 'এইসব প্রাতঃস্মরণীয়া মেয়েমানুষও পুরুষদের মতো এখানে জেল খাটতে এসেছিল।'

পুরুষদের 'কালাপানি'তে পাঠাবার কথা বিনয়ের জানা আছে। কিন্তু মেয়েদের কথা এই প্রথম শুনল। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর জিগ্যেস করে, 'এদের বিয়ে হল কী করে?'

বিশ্বজিৎ বললেন, 'এত তাড়া কীসের? এখানে যখন এসেই পড়েছেন সব জানতে পারবেন।'

ওদিকে দু'টো লঞ্চই ছেড়ে দিয়েছিল। উপসাগরের নীল জল উথালপাথাল করে তারা কোনাকুনি ছুটে যাচ্ছে।

সূর্য এতক্ষণে আরও খানিকটা ওপরে উঠে এসেছে। এখন আর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। নোনা জলে তীব্র রোদ যেন ঝলকে যাচ্ছে।

আধ ঘণ্টাও লাগল না, উপসাগর পাড়ি দিয়ে ওপারে পৌঁছে গেল 'সি-গাল' আর 'নটিলাস'।

বিশ্বজিৎ বললেন, 'এই জায়গাটার নাম 'বাম্বুফ্ল্যাট।'

এখানেও দু'টো কাজ চলার মতো ছোট জেটি রয়েছে। জলও গভীর নয়। তাই বড় জাহাজ ভিড়তে পারে না। কিন্তু লঞ্চের পক্ষে অসুবিধে নেই।

লঞ্চ বাঁধাছাঁদা হলে উদ্বাস্তুদের নামানো হল। প্রাক্তন কয়েদিদের সঙ্গে বিনয়রাও নেমে পড়ল। তারা বিশ্বজিৎকে 'আদাব' এবং 'নমস্তে' জানিয়ে চলে গেল।

জেটির মাথায় অ্যাসবেস্টসের অল্প একটু ছাউনি। সেটার তলা দিয়ে সবাই ওধারে চলে গেল। বাইরে পাহাড় কেটে রাস্তা বানানো হয়েছে। সেখানে বারো চোদ্দোটা মাঝারি আকারের লরি লাইন দিয়ে দাঁড় করানো রয়েছে। সেগুলোর মাথা খোলা। সামনে ড্রাইভারের কেবিন। পেছন দিকে কাঠের মজবুত পাটাতন। ড্রাইভার এবং খালাসিরা যে যার লরির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

লরির সারির ওধারে একটা জিপ চোখে পড়ে। কালীপদ বিনয়ের মালপত্র নিয়ে সেদিকে চলে গেল।

বিনয় বুঝতে পারছিল, গাড়িগুলো পুনর্বাসন দপ্তরের। উদ্বাস্তুদের নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করছে।

বিশ্বজিৎ নিরঞ্জন আর বিভাসকে বললেন, 'তোমরা ডি.পি ফ্যামিলিগুলোকে লরিতে তোলো। বিনয়বাবু আর আমি জিপে গিয়ে বসছি। সবাই উঠলে একসঙ্গে রওনা হব।'

লরির ড্রাইভার খালাসিদের মতো জিপের চালক তার গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বিশ্বজিৎকে দেখে তার শরীর টানটান হয়ে গেল। ছ'ফিটের মতো হাইট। লম্বাটে মুখ, চওড়া বুক, ছড়ানো মজবুত কাঁধ, মাথায় প্রচুর চুল, মুখটা পরিষ্কার করে কামানো, তবে থুতনিতে তেকোনা দাড়ি। পরনে ঢোলা ফুলপ্যান্ট আর শার্ট। বয়স সাতাশ-আটাশের মতো। কপালে হাত ঠেকিয়ে সে বলল, 'আদাব—'

আদাবের জবাবে মাথা সামান্য হেলিয়ে বিশ্বজিৎ বলেন, 'ক্যায়সা হ্যায় নাসিম?'

'আপহিকা মেহেরবানিসে সব কুছ ঠিক হ্যায়।'

এবার বিশ্বজিৎ কালীপদকে বললেন, 'সুটকেস টুটকেস জিপে তুলে দিয়ে তুমি ফিরে যাও। স্টিমার ব্যাম্বুফ্ল্যাটে বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না। আমি কাল, না হলে পরশু ফিরব।'

জিপের পেছন দিকে লটবহর রেখে ব্যস্তভাবে জেটির দিকে চলে গেল।

ওদিকে নিরঞ্জনরা যে প্রক্রিয়ায় উদ্বাস্তুদের খিদিরপুর ডকে 'মহারাজা' জাহাজে কিংবা 'রস' আইল্যান্ডে, আর চ্যাথাম জেটিতে স্টিমারে তুলেছিল, ঠিক সেইভাবেই লরিতেও তুলে ফেলল। তারপর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'রাহাদা, আমরা রেডি—'

নাসিম জানে, এখন কী করতে হবে। সে ব্যস্তভাবে ঘুরে গিয়ে জিপে উঠে পড়ল। ফ্রন্ট সিটে বিশ্বজিৎ বিনয়কে নিয়ে উঠে তার পাশে বসে পড়লেন।

বারোটি লরি এবং একটি জিপ, মোট তেরোটি গাড়ি দৌড় শুরু করল।

সূর্য এখন প্রায় মাথার ওপর উঠে এসেছে। রোদের তেজ অনেক বেড়ে গেছে। মাত্র কয়েক মিনিট উপসাগর আর মাউন্ট হ্যারিয়েটের চুড়োটা দেখা যাচ্ছিল। তারপর চোখের সামনে থেকে একেবারে উধাও।

উঁচু উঁচু পাহাড় আর ছোট-বড় অগুনতি টিলার কোমরে পাক খেতে খেতে পথ কখনও ওপরে উঠে যাচ্ছে, কখনও নেমে আসছে নিচে। একবার খাড়াই, তারপরেই উৎরাই। এক পাশে পাথরের নিরেট দেওয়াল, অন্যদিকে খাদ। খাদ কোথাও গভীর, কোথাও ততটা নয়। দু'ধারেই নিবিড় জঙ্গল। ছোটখাট গাছ যে কত তার লেখাজোখা নেই। রয়েছে বিশাল বিশাল সব মহাবৃক্ষ, মোটা মোটা বেত আর বুনো লতা সেগুলো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। আর মাঝে মাঝেই অনেকটা করে জায়গা জুড়ে পঁচিশ-তিরিশ ফিট উঁচু বুনো ঘাসের বন। জঙ্গল কোথাও কোথাও এমন দুর্ভেদ্য যে এই দুপুরবেলাতেও সূর্যালোক ঢোকে না।

গাড়িগুলো চলছে খুব জোরেও নয়, আবার ধীর গতিতেও নয়। মাঝামাঝি স্পিডে। কেননা পাহাড়ি রাস্তা তেমন চওড়া নয়। বেশি স্পিড তুললে বাঁকের মুখে স্কিড করে খাদে গিয়ে পড়ার ভয়।

মাথার ওপর অনেকটা উঁচু দিয়ে অজস্র পাখি উড়ে যাচ্ছে। বক আর সি-গাল ছাড়া অন্যদের চিনতে পারল না বিনয়।

পনেরো-কুড়ি মিনিট পর পর বসতি চোখে পড়ছে। খুব বড় নয়। তিরিশ-চল্লিশটা কাঠের বাড়ি, মাথায় অ্যাসবেস্টস টিনের ছাউনি। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে নয়, ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বাড়িগুলো অনেককালের পুরনো। কিছু কিছু লোকজনও চোখে পড়ছিল। তাদের কারওকে দেখে উদ্বাস্তু মনে হয় না। সর্বস্ব খোয়ানো শরণার্থীদের চেহারায় একটা মার্কামারা ছাপ থাকে।

হাজার বছরের প্রাচীন অরণ্যের খাঁজে খাঁজে লোকালয় দেখা যাবে, ভাবতে পারেনি বিনয়। অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। জিগ্যেস করল, 'এগুলো তো রিফিউজি সেটলমেন্ট নয়। তিরিশ-চল্লিশ বছর আগের সব বাড়িঘর। এখানে কারা থাকে?'

বিশ্বজিৎ বললেন, 'যেসব কয়েদি ব্রিটিশ আমলে আন্দামানে লাইফ-টাইম জেল খাটতে এসেছিল, এগুলো তাদের ভিলেজ।'

বিনয় আর কোনও প্রশ্ন করল না।

দেখতে দেখতে সূর্যটা পশ্চিম আকাশের ঢালু গা বেয়ে নামতে নামতে উঁচু উঁচু পাহাড়ের আড়ালে উধাও হল। বেলা হেলে

banglabooks.in

পড়েছে। তবু এখনও চারদিকে অঢেল রোদ।

একটা উতরাই বেয়ে গাড়িগুলো যেখানে নেমে এল সেখানে পাথুরে রাস্তা নেই। এবড়ো-খেবড়ো হলেও, মাইল দেড় দুই জুড়ে মোটামুটি সমতল জমি। সেটার তিন দিকে জঙ্গল, পাহাড়, অন্যদিকটায় সমুদ্র।

যতদূর চোখ যায় বিশাল বিশাল গাছের গুঁড়ি আর সেসবের মোটা মোটা ডালপালা স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে। এক লহমায় বোঝা যায়, বন কেটে অনেকটা জমি বার করা হয়েছে। তবে বড় বড় প্রাচীন সব গাছ কাটা হলেও অজস্র ছোট এবং মাঝারি গাছ, আর মাঝে মাঝে বুনো ঘাসের ঝোপঝাড়। এসব নির্মূল করতে না পারলে পুরো জমি পাওয়া যাবে না।

বেশ খানিকটা দূরে সমুদ্রের কাছাকাছি তক্তার বেড়া আর টিনের চালের অনেকগুলো লম্বা লম্বা ব্যারাকজাতীয় বাড়ি। বোঝাই যায় এগুলো নতুন তৈরি হয়েছে। সেখানে পনেরো বিশজন লোক দাঁড়িয়ে আছে।

তেরোটা গাড়ি সোজা ব্যারাকগুলোর সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'এই হল আমাদের নিউ সেটলমেন্টের জায়গা। এখানে উদ্বাস্তুদের জমি দেওয়া হবে। আসুন—' বলে জিপ থেকে নেমে পড়লেন বিশ্বজিৎ।

ছিন্নমূল মানুষগুলোকে সমুদ্র আর জঙ্গলে ঘেরা বহু দূরের এই এলাকাটিতেই যে বসতি গড়ে তুলতে হবে, সেটা আন্দাজ করতে পেরেছিল বিনয়। সেও নেমে এল।

যে লোকগুলো সারি সারি ব্যারাকের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল তারা বিশ্বজিতের দিকে প্রায় দৌড়ে চলে এল। এদের মধ্যে নানা জাতের মানুষ রয়েছে। রয়েছে দু'তিনজন কর্মীও। তবে সবচেয়ে বেশি করে যে নজরে পড়ে তার বয়স পঞ্চাশের আশপাশে। নিরেট চেহারা, পাথরের পাটার মতো চওড়া বুক, কাঁধ অবধি এলো মেলো কাঁচা-পাকা রুক্ষ চুল, মুখে আট-দশ দিনের জমানো দাড়ি। ছড়ানো চোয়াল, পুরু ঠোঁট। পরনে দোমড়ানো মোচড়ানো খাকি প্যান্ট আর কালচে রঙের জামা, যেটার একটাও বোতাম নেই। দেখামাত্র টের পাওয়া যায়, লোকটার গায়ে দানবের শক্তি। তার ঠিক পাশেই রয়েছে তেইশ-চব্বিশ বছরের একটি বাঙালি যুবক। পাতলা, একহারা চেহারা, তরতরে মুখ। পরনে ঢোলা প্যান্ট আর শার্ট। বাকি সবাই তাদের পেছনে।

বাঙালি যুবকটি হাতজোড় করে বিশ্বজিৎকে বলল, 'নমস্কার স্যার। আমরা দুফার থিকা আপনেগো লেইগা পথের দিকে তাকাইয়া রইছি।' কথা শুনেই টের পাওয়া যায় তার আদি বাড়ি পূর্ববাংলায়।

বিশ্বজিৎ বললেন, 'হ্যাঁ। আমাদের আসতে দেরি হয়ে গেল।'

লম্বাচওড়া শক্তিমান লোকটি এবং বাকি সকলে মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, 'নমস্তে সাহাব—' বোঝা গেল তারা অবাঙালি।

ঘাড় সামান্য কাত করে প্রতি-নমস্কার জানালেন বিশ্বজিৎ। তারপর বাঙালি যুবকটিকে বললেন, 'সেই সকালবেলা রিফিউজিরা খেয়ে বেরিয়েছিল। এখন সূর্য ডুবতে চলেছে। খিদেয় তাদের পেটে আগুন জ্বলছে। খাবার-টাবার সব রেডি তো?'

যুবকটি বলল, 'হ স্যার। দুফারের আগেই পাক (রান্না) হইয়া গ্যাছে।'

'ভেরি গুড।'

বিশ্বজিৎ এবার বিনয়ের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন। যুবকটির নাম পরিতোষ বণিক। দেশভাগের পরে পরেই ফরিদপুরের পালং থেকে চলে এসেছিল। আইএ পাশ। আন্দামানের এই নতুন সেটলমেন্টের কলোনাইজেশন অ্যাসিস্টান্ট, সংক্ষেপে সি.এ। শরণার্থীদের এই উপনিবেশ গড়ে তোলার অনেকখানি দায়িত্ব। তার এখানে থেকেই পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার তদারক করবে সে।

বিশ্বজিৎ বললেন, 'বিনয়বাবুর কথা তোমাকে বলেছি। উনি আপাতত এখানে থাকবেন। আন্দামানের রি-হ্যাবিলিটেশন সম্পর্কে ওঁদের কাগজে লিখবেন। ওঁকে সবরকম সাহায্য করবে।'

'নিশ্চয়ই স্যার। আপনে কি এইবার কয়েকদিন থাইকা যাইবেন?'

'বড়জোর কালকের দিনটা আছি। পরশু আমাকে ফিরতেই হবে। কোর্টে অনেকগুলো কেস রয়েছে। কোনওটার হিয়ারিং আছে, কোনওটার জাজমেন্ট দিতে হবে।'

বিশ্বজিৎ শুধু রিহ্যাবিলিটেশন অফিসারই নন, আন্দামানের ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটও। তাঁকে নানারকম ঝক্কি সামলাতে হয়। তিনি বলতে লাগলেন, 'তিন দিন আগে কাহালিবাবু মাল নিয়ে এসেছিলেন। তাতে কতদিন চলবে?'

ঘাড় চুলকতে চুলকতে চোখ নামিয়ে পরিতোষ বলল, 'স্যার, রিফিউজিগো যা লিস্ট পাইছি হেয়াতে (তাতে) মনে লয় (হয়) তিনশো জন আইছে। হেরা তারা ছাড়া রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টের বিশ-বাইশজন এমপ্লয়ি আছে। যা মাল আইছে, কতদিন চলব হিসাবটা বুঝতে পারতাছি না। এই ধরনের কাম তো আগে করি নাই। তাই—'

ধমকের সুরে বিশ্বজিৎ বললেন, 'এটা একটা এক্সকিউজ হল? কলোনি চালাবে তুমি। হিসেবটা বুঝবে অন্য লোক? এভাবে চাকরি রাখতে পারবে না।'

সচকিত বিনয় বিশ্বজিতের দিকে তাকায়। কাল সকাল থেকে আজ বিকেল অবধি, মোটামুটি দেড় দিনের মতো তাঁকে দেখছে সে। অমায়িক, সহানুভূতিশীল নরম স্বভাবের মানুষ বলেই মনে হয়েছে। কিন্তু কাজকর্মের ব্যাপারে তিনি যে অত্যন্ত কঠোর, কারও কোনওরকম গাফিলতি বা অজুহাত যে বরদাস্ত করেন না সেটা টের পাওয়া গেল।

মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল পরিতোষের। কী জবাব দেবে, ভেবে পাচ্ছে না।

নীরস গলায় বিশ্বজিৎ বললেন, 'যেসব মাল এসেছে, সেগুলোর কত ওজন, তার ফর্দ আছে তো? না হারিয়ে ফেলেছ?'

পরিতোষের মনে হল, ফাঁড়াটা খুব সম্ভব এ যাত্রায় কেটেই গেল। জোরে শ্বাস টেনে সে বলল, 'আছে স্যার, আছে। অহনই লইয়া আসুম?'

'এখন আনতে হবে না। পরে দেখব।' বলেই সেই বলবান লোকটার দিকে তাকালেন বিশ্বজিৎ। —'তোমার খবর কী ধনপত সিং?'

ধনপত বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'আপকো কিরপাসে (কৃপায়) ঠিক হি হ্যায় সাহাব।'

'কাল থেকে জমি জরিপের কাজ শুরু হবে। তোমরা রেডি তো?'

'রিডি (রেডি) সাহাব।' ধনপত তার সঙ্গী দু'জন বর্মি এবং অন্যদের দেখিয়ে বলল, হিন্দুস্থানিতে যা বলল তার বাংলা মোটামুটি এরকম। কাল রাতকো এই চেইনম্যানরা এসে গেছে।'

জরিপের ব্যাপারটা ভাসা ভাসা ভাবে আন্দাজ করে নিল বিনয়, তবে চেনম্যানদের কী কাজ সেটা ধোঁয়াটে হয়ে রইল। এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন করল না সে। পোর্টব্লেয়ার থেকে বহু দূরে নিবিড় বনভূমির এই খাঁজের ভেতর যখন এসেই পড়েছে কাল হোক, পরশু হোক, চেনম্যানদের সম্পর্কে অবশ্যই জানা যাবে।

ওধারে লরি থেকে রিফিউজিদের নামিয়ে ফেলেছে বিভাস আর নিরঞ্জন। সেদিক থেকে শোরগোল ভেসে আসছে। অতগুলো মানুষ একসঙ্গে কথা বলছে, তারই আওয়াজ।

বিশ্বজিৎ বিনয়কে বললেন, 'চলুন, ওখানে যাওয়া যাক।'

দুজনে পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল। পরিতোষও ভিজে বেড়ালের মতো তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। ধনপতরা এল না, তারা দাঁড়িয়েই রইল।

বিশ্বজিৎ বললেন, 'ধনপত আর বর্মিটর্মিদের দেখলেন তো। এরা কারা জানেন?'

banglabooks.in

বিনয় বলল, 'কী করে জানব? এই তো সবে এলাম। তবে আপনাদের কথা শুনে মনে হল জরিপ-টরিপ কিছু করবে।'

'হ্যাঁ। এরা সব ব্রিটিশ আমলে সাজা খাটতে 'কালাপানি' এসেছিল। তারপর এখানেই থেকে গেছে।' বিশ্বজিৎ বলতে লাগলেন, 'তখনকার জেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওদের পি.ডব্লু.ডি'তে কাজ দিয়েছিল। স্বাধীনতার পর আন্দামানে যখন রিফিউজিদের পাঠানো হল তখন ওদের রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টে ট্রান্সফার করা হয়।'

বেলা চড়লে চ্যাথাম জেটি থেকে যখন ব্যাম্বু ফ্ল্যাটে আসছিল সেই সময় স্টিম লঞ্চে ইংরেজ রাজত্বের কয়েদিদের দেখেছিল বিনয়। তাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়নি। নতুন সেটলমেন্টে ধনপতদের সারাক্ষণই পাওয়া যাবে। ভাবতেই শিহরন অনুভব করে সে।

নতুন জায়গায় এসে উদ্বাস্তুরা খুবই উত্তেজিত। তারা এত হইচই বাধিয়েছে যে কারও কথাই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।

ভিড়ের ভেতর থেকে হলধররা কয়েকজন বিনয়ের কাছে চলে এল। সবারই চোখেমুখে দুশ্চিন্তা এবং শঙ্কার ছাপ। হলধর ভয়ে ভয়ে বলল, 'তিন দিকে জঙ্গল, পাহাড়, আরেক দিকে সমুন্দুর। এই আমাগো কুনহানে লইয়া আইল! আর তো ফিরনের উপায় নাই।'

বিনয় অবাক। বলল, 'দেশ তো গেছে। কোথায় আর ফিরবেন? ফিরলে তো কলকাতার সেই ক্যাম্পেই যেতে হবে। কিন্তু ক্যাম্প কি ফাঁকা পড়ে আছে? এত দিনে অন্য রিফিউজি এনে নিশ্চয়ই সেখানে তোলা হয়েছে।' একটু থেমে বলল, 'ক্যাম্পে কী সুখে ছিলেন, একবার ভেবে দেখুন।'

মুখের কথা শুনে আন্দামানে এসেছে হলধর। কিন্তু স্বচক্ষে যখন দেখল বিজন, গহন অরণ্যে বাকি জীবন কাটাতে হবে, এটা ভেবে ভীষণ উতলা হয়ে উঠেছে। সে চুপ করে থাকে। হয়তো খেয়াল হয়, এই দ্বীপ ছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোথাও তাদের জন্য ছ'আঙুল জমি পড়ে নেই। অনেকক্ষণ পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিমর্ষ মুখে বলে, 'হ, কই আর যামু! যাওনের জাগা নাই।'

বিনয় বুঝিয়ে বলে, 'দুঃখ করবেন না। এখন থেকে এটাই আপনাদের দেশ। এখানেই জমি পাবেন, টাকা-পয়সা পাবেন, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্যে স্কুল বসবে। আস্তে আস্তে দেখবেন, সব কষ্ট ঘুচে গেছে।'

বিভাস ওধার থেকে রিফিউজিদের তাড়া লাগাচ্ছিল, 'যার যার মাল লইয়া ব্যারাকে রাখেন। হের পর সমুদ্র থিকা হাত-পা ও ধুইয়া আসেন। অহনই খাওনেরটা (খাবার) দেওয়া অইব।'

বিনয় হলধরদের বলল, 'যান যান, চলে যান।'

॥ ছয় ॥

বিশাল চারটে ব্যারাক ছাড়াও পাঁচ-ছ'টা বড় কাঠের বাড়িও তোলা হয়েছে। যতদিন না শরণার্থীরা নিজেদের ঘরবাড়ি তৈরি করে নিতে পারছে, ব্যারাকেই তাদের থাকতে হবে। ব্যারাকের ভেতর দেওয়াল তুলে আলাদা আলাদা কুঠুরিতে ভাগ করা হয়নি। টানা পাটাতন পেতে দেওয়া হয়েছে।

দুটো ব্যারাকে থাকবে পুরুষেরা, বাকি দু'টোয় মেয়েমানুষ আর বাচ্চাকাচ্চারা। বাকি যে পাঁচ ছ'টা ঘর তোলা হয়েছে তার দুটো হল গুদাম, সেখানে সেটলমেন্টের নানা মালপত্র রাখার ব্যবস্থা। দু'টো ঘর পুনর্বাসন বিভাগের কর্মীদের জন্য, একটা ঘর কলোনাইজেশন অ্যাসিস্টান্টের, বাকি ঘর দু'টোয় পোর্টব্লেয়ার থেকে যে অফিসাররা দু'চার দিনের জন্য সেটলমেন্টের কাজকর্ম দেখতে আসেন তাঁরা থাকেন। বিশেষ করে বিশ্বজিৎ রাহা।

চান করা, কাপড় কাচা, বাসন মাজা ইত্যাদির মোটা কাজের জন্য সমুদ্র হাতের কাছেই রয়েছে। কিন্তু নোনা জল তো আর খাওয়া যায় না। সে জন্য কাছাকাছি একটা ঝরনা রয়েছে, অবিরল সেটা জল ঢেলে চলেছে। ঝরনাটা যেখানে, তার পাশের পাহাড়ের মাথায় নৌকোর আকারে মস্ত একটা খোল বা গহ্বর। সারা বর্ষার জল সেখানে জমে থাকে। দরকারমতো সেখান থেকেও লম্বা লম্বা পাইপ দিয়ে জল আনা যেতে পারে।

বিশ্বজিৎ এই সেটলমেন্টে এলে যে ঘরটায় থাকেন বিনয়কে নিয়ে সেখানে চলে এলেন। জিপের ড্রাইভার নাসিম এর মধ্যে বিনয়ের সুটকেস বিছানা-টিছানা রেখে গেছে।

ঘরটার দুই দেওয়াল ঘেঁষে দু'খানা তক্তপোশ পাতা রয়েছে। আর আছে কাঠের আলমারি। দেওয়ালে টাঙানো আয়না। একটা তাকে সাবান, নারকেল তেলের কৌটো ইত্যাদি টুকিটাকি জিনিস।

বিশ্বজিৎ বললেন, 'এই ঘরেই আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন। পরশু অবশ্য আমি পোর্টব্লেয়ার চলে যাচ্ছি। তারপরও যতদিন ইচ্ছে এখানে থেকে সেটলমেন্টের কাজ দেখবেন। সারাদিন জার্নি করে জামা-প্যান্টের হাল খারাপ হয়ে গেছে। ঘামে সারা গা চটচট করছে। সুটকেস খুলে তোয়ালে-টোয়ালে বার করে সমুদ্রে গিয়ে চানটা সেরে আসি। পরিতোষরা রিফিউজিদের নিয়ে ব্যস্ত। আজ

banglabooks.in

কিন্তু চানের জন্যে গরম জলের ব্যবস্থা করা যাবে না। কাল থেকে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

বিনয় পোর্টব্লেয়ারে বিশ্বজিতের বাংলোয় আপত্তি করেনি। সেখানে অনেক কাজের লোক রয়েছে। কিন্তু এখানে উদ্বাস্তুরাই আসল। তার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পুনর্বাসন দপ্তরের কর্মীদের ব্যস্ত করে তোলাটা অস্বস্তিকর। বলল, 'কী দরকার? সবাই যখন সমুদ্রে গিয়ে চান করবে, আমার জন্যে স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্টের দরকার নেই। সেটা খারাপ দেখাবে।'

বিনয় যে বাড়তি কোনও সুবিধা নিতে চায় না সেটা বুঝে আর কিছু বললেন না বিশ্বজিৎ। একটু হেসে আলমারি খুলে ফেললেন। ভেতরে বেশ ক'টা তাকে কয়েক প্রস্থ পোশাক, তোয়ালে রয়েছে।

বিনয়ের মনে পড়ল সকালে তারা যখন পোর্টব্লেয়ার থেকে বেরিয়েছিল, সঙ্গে কিছুই নেননি বিশ্বজিৎ। একেবারে খালি হাত-পা। দু'দিন তিনি জঙ্গলে কাটাবেন। পরনের জামা-প্যান্ট তো ঘামে, পথের ধুলোয় নোংরা, চটকানো-মটকানো হয়ে যাবে। সেই পোশাকে কি দু'টো দিন কাটানো যায়? উদ্বাস্তুদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে, জঙ্গলের কোন অভ্যন্তরে, সে ব্যাপারে বিনয়ের কৌতূহল তখন এত প্রবল, উত্তেজনা এমন তীব্র যে অন্য কোনও দিকে তার লক্ষ ছিল না। এখন দেখা যাচ্ছে, জঙ্গলে কাটানোর মতো সমস্ত কিছুই এখানে মজুত করে রেখেছেন বিশ্বজিৎ।

দু'জনেই ঘরে পরার মতো পাজামা-শার্ট আর পাতলা চটি-টটি বার করে বেরিয়ে পড়ল।

হঠাৎ কিছু খেয়াল হতে বিনয় বলে, 'একটা কথা খুব জানতে ইচ্ছে করছে।'

চলতে চলতে বিশ্বজিৎ বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। বলুন—'

'আন্দামানে রিফিউজিদের তো আরও সেটলমেন্ট হয়েছে।'

'হ্যাঁ, তিনটে।' বিশ্বজিৎ বলতে লাগলেন, 'আজ যারা এল তাদের আগে আড়াই হাজারের মতো মানুষ এসেছে। ওদের জমি-টমি দিয়ে বসানো হচ্ছে।'

বিনয় জিগেস করে, 'সেই সেটলমেন্টগুলো কোথায়?'

উত্তর দিকে আঙুল বাড়িয়ে বিশ্বজিৎ বললেন, 'ওধারে তিনটে পাহাড় পেরলে পাশাপাশি দুটো সেটলমেন্ট, থার্ডটা আরও দূরে।'

'সেইসব জায়গায় তো আপনাকে যেতে হয়—'

তা তো হয়ই। এতগুলো মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে আমাদের ভরসায় এত দূরের আইল্যান্ডে এসেছে। তারা কী অবস্থায় রয়েছে, তাদের কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না, কোনও গ্রিভান্স আছে কি না, সেসব দেখতে হবে না?'

বিশ্বজিৎকে যত দেখছে, তাঁর কথা যত শুনছে, ততই শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে। বিনয় জিগ্যেস করল, 'ওই সেটলমেন্টগুলোতে নিশ্চয়ই এখানকার মতো জামাকাপড় রাখা আছে?'

বিশ্বজিৎ হেসে ফেলেন। '—তা তো আছেই।'

বিভাস আর নিরঞ্জন এর মধ্যে উদ্বাস্তুদের সমুদ্রের দিকে নিয়ে গেছে। ওদর দেখতে পাচ্ছিল বিনয়রা।

পরিতোষ কাছাকাছি কোথাও ছিল। সে দৌড়ে আসে। ব্যগ্রভাবে বলল, 'স্যার, আপনেরা কষ্ট কইরা সমুদ্রে যাইয়েন না। ঘরে যান। আমি জল পাঠাইয়া দিতে আছি।'

খুব ঠান্ডা গলায় বিশ্বজিৎ বললেন, 'আমাদের আরামের জন্যে ভাবতে হবে না। এই সেটলমেন্ট যাদের জন্যে তাদের কথা ভাবো।'

ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে থাকে পরিতোষ। আর কিছু বলতে সাহস হয় না তার।

বিশ্বজিৎ বিনয়কে নিয়ে এগিয়ে চললেন।

সেটলমেন্টের এদিকটা অন্য তিনদিকের মতো ঘন জঙ্গলে ঢাকা। লম্বালম্বি তার খানিকটা সাফ করে সমুদ্রে যাবার পথ করে নেওয়া হয়েছে। তবে পথের দু'পাশে এখনও চাপ-বাঁধা ঘন ঝোপ, নানা ধরনের অজস্র বুনো গাছ এবং জলডেঙ্গুয়া অর্থাৎ বনতুলসীর উদ্দাম ঝাড়।

সমুদ্রের ধারে এসে দেখা গেল দু-আড়াইশো ফিটের মতো চওড়া সোনালি বালির বিচ; ডাইনে এবং বাঁয়ে বহুদূর অবধি শরীর এলিয়ে পড়ে আছে। বেলাভূমির মাথায় মাইলের পর মাইল জুড়ে ঝাড়ালো ম্যানগ্রোভের জটলা। আর কত যে নারকেল গাছ তার লেখাজোখা নেই। আকাশের দিকে মাথা তুলে তারা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আন্দামানের তটরেখা পাহারা দিয়ে চলেছে।

বিচের পর থেকে সমুদ্র। পাড়ের দিকে সিকি মাইল অবধি কাচের মতো টলটলে জল। খুব বেশি হলে কোমর সমান। জল এতটাই স্বচ্ছ যে নিচের বালুকণা, পাথর, নুড়ি, নানা রঙের ঝিনুক, সামুদ্রিক শ্যাওলা আর আগাছা স্পষ্ট দেখা যায়।

সিকি মাইল পর থেকে জলের রং ক্রমশ পালটে গেছে। প্রথমে হালকা সবুজ, তারপর গাঢ় সবুজ, নীল এবং আরও দূরে ঘন কালো হয়ে অন্তহীন সমুদ্র দিগন্ত অবধি চলে গেছে।

উদ্বাস্তুরা জলে নেমে পড়েছিল। কলকাতা থেকে আসার সময় চার পাঁচ দিন 'মহারাজা' জাহাজে তোলা জলে তারা চান করেছিল। এই প্রথম অফুরান সমুদ্র পেয়েছে। পদ্মা-মেঘনা-কালাবদর ধলেশ্বরীর দেশের মানুষ, এত জল পেয়ে সবাই ডগমগ। বুড়োবুড়ি যুবক যুবতী— কেউ সাঁতরাচ্ছে, কেউ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ডুবের পর ডুব দিয়ে চলেছে। ছোট বাচ্চাগুলো খলবল করে জল ছিটচ্ছে।

সমুদ্র রং বদলে যেখানে সবুজ হতে শুরু করেছে সেদিক থেকে লক্ষ কোটি মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসছে তীরের দিকে। কত রকমের যে মাছ— সুরমাই, লাল ভেটকি, সার্ডিন, শাকুস, পমফ্রেট ছাড়াও নাম- না-জানা আরও অসংখ্য। এছাড়া উড়ুক্কু মাছেরা তো রয়েছেই। তারা সমুদ্র ফুঁড়ে উঠে আসছে; আধখানা বৃত্তের আকারে শূন্যে চক্কর দিয়ে ফের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এই ওড়াউড়ি চলছে অবিরাম।

জল পেয়ে উদ্বাস্তুরা খুশি তো হয়েছেই। মাছ দেখে একেবারে আত্মহারা। খিদিরপুর ডকে জাহাজে ওঠার সময় তারা ত্রাসে সংশয়ে একেবারে কুঁকড়ে ছিল। এই প্রথম তাদের উচ্ছ্বসিত হতে দেখা গেল। চোখেমুখে তাদের প্রবল উত্তেজনা। নিজেদের মধ্যে ওরা বলাবলি করছিল।

'বাইসুত রে, সমুন্দুরে কত মাছ দেখছনি? মনে লয় দশহান পদ্মা, দশহান ম্যাঘনা ছেইচা (ছেঁচে) ফালাইলেও এত মাছ মিলব না।'

'সারা জনম খাইয়াও শ্যাষ করন যাইব না।'

'সারা জনম কী কও, চৈদ্দে পুরুষ খাইলেও ফুরাইব না।'

'হ, সাচাই কইছ।'

'কেম্প (ক্যাম্প) থিকা যহন আমাগো খিদিরপুরে লইয়া আইল, ডরে হাত-পাও প্যাটের ভিত্‌রে হাইন্দা (ঢুকে) গ্যাছিল। অহন মনে লয় (হয়) আন্দায়মানে না খাইয়া মরুম না। আর কিছু না জুটুক, সমুন্দুরে মাছ তো আছে, হেই খাইয়া বাইচা থাকুম।'

পাড়ে দাঁড়িয়ে বিভাস, নিরঞ্জন আর পুনর্বাসন বিভাগের ক'জন কর্মী উদ্বাস্তুদের ওপর সতর্ক নজর রাখছিল। নিরঞ্জন গলার স্বর উঁচুতে তুলে সমানে বলে যাচ্ছে, 'কেও বেশিদূর যাইবা না। সমুন্দুরের কিনারে ছান (চান) কর। হাঙ্গরের চোখে পড়লে রক্ষা নাই। সাবধান, সাবধান—'

রাঁচির লোকটিও একটানা চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'বদমাশ মচ্ছি (হাঙর) বহোত খতারনাক। হোশিয়ার—' তারা অনবরত বলে যাচ্ছে, খানিক দূরে সমুদ্রের জল যেখানে সবুজ হতে শুরু করেছে তার ওধারে হাঙরেরা ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়ায়। যে কোনও মুহূর্তে তারা বিদ্যুৎগতিতে পাড়ের দিকে হানা দিতে পারে। সামুদ্রিক এই দানবেরা মানুষ পেলে ধারালো দাঁতে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে।

এত হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও উদ্বাস্তুরা কি সহজে সমুদ্র ছেড়ে উঠতে চায়? দূরে গেল না বটে, কিনারার কাছে জল নিয়ে মাতামাতি করতে লাগল।

banglabooks.in

শেষ পর্যন্ত ধমকধামক দিয়ে নিরঞ্জনরা তাদের তুলে ফেলল। —'আমাগো কথা কানে তোলো না। হাঙ্গরের প্যাটে কেও গ্যালে তহন দোষ অইব সরকারের। দুনিয়াসুদ্ধা মানুষ জানবো, হাঙ্গর দিয়া খাওয়ানের লেইগা আমরা রিফিউজিগো আন্দামানে লইয়া আইছি।'

উদ্বাস্তুরা সাড়াশব্দ করে না। অপরাধী অপরাধী মুখ করে নিরঞ্জনদের সঙ্গে সেটলমেন্টে ফিরে গেল।

ওরা চলে যাবার পর বিশ্বজিৎ আর বিনয় ভালো করে হাত-পা মুখ ধুয়ে নিল। সারাদিন পাহাড়ি রাস্তায় গাড়িতে এসেছে তারা। ধুলোয় ঘামে জামাকাপড় চটচট করছিল। সেসব বদলে পাজামা-শার্ট পরে নিল।

সেটলমেন্টে ফিরতে ফিরতে হঠাৎ কাজের কথাটা মনে পড়ে গেল বিনয়ের। বলল, 'আমি তো আপাতত এই জঙ্গলে থেকে যাব। আমাদের কাগজে আন্দামানের রিপোর্ট পাঠাব কী করে?' এই প্রশ্নটা কি আগেও একবার বিশ্বজিৎকে করেছিল সে? ঠিক মনে পড়ল না।

বিশ্বজিৎ বললেন, 'আমি তো কালকের দিনটা এখানে আছি। এর মধ্যে দুটো রিপোর্ট লিখে ফেলুন। আমি পরশু পোর্টব্লেয়ার গিয়ে এয়ার মেলে আপনাদের কাগজে পাঠিয়ে দেব।'

'এবারটা না হয় পাঠানো গেল। তারপর?'

বিশ্বজিৎ জানালেন, পোর্টব্লেয়ার থেকে দু-তিন দিন পর পর রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টের গাড়ি নানা জিনিসপত্র নিয়ে এই অঞ্চলের সেটলমেন্টগুলোতে আসে। ড্রাইভারকে তিনি বলে দেবেন বিনয়ের কাছ থেকে লেখা নিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছে দিতে। বিশ্বজিৎ রিপোর্টগুলো পাওয়ামাত্র কলকাতায় পাঠিয়ে দেবেন।

রোদের তেজ আর নেই। দিনের শেষ আলোটুকু ফিকে হতে হতে দ্রুত নিভে যাচ্ছে। পাহাড় আর বিশাল বিশাল মহাবৃক্ষের ছায়া দীর্ঘ হয়ে চরাচর ঢেকে দিচ্ছে। একটু পরেই বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে ঝপ করে সন্ধে নেমে যাবে।

সেটলমেন্টে এসে দেখা গেল, এর মধ্যে অগুনতি হ্যাজাক আর গ্যাসবাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। জ্বলছে বেশ কিছু হ্যারিকেনও। জোরালো আলোয় ভরে গেছে চারিদিক।

লম্বা লম্বা ব্যারাক ধরনের বাড়িগুলোর সামনের দিকের অনেকখানি জায়গায় জঙ্গল তো নির্মূল করা হয়েছিলই, নিচের ঘাস চেঁছে পরিষ্কার করে মাটিও বার করা হয়েছে। সেখানে লম্বা করে দুই সারিতে এমনভাবে চট বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে পাশাপাশি অনেকে বসতে পারে।

ব্যারাকগুলোর একধারে বিরাট বিরাট টিনের ড্রাম আর ডাঁই-করা অ্যালুমিনিয়ামের থালা আর গেলাস। সেখানে নিরঞ্জন আর বিভাস তো রয়েছেই, তাছাড়া পুনর্বাসন বিভাগের অন্য কর্মীদেরও দেখা যাচ্ছে।

নিরঞ্জনরা দারুণ করিৎকর্মা। সমুদ্র থেকে চান করে আসার পর উদ্বাস্তুদের লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তারা।

নিরঞ্জনের হাতে লম্বা তালিকা। সেটা দেখে হেঁকে হেঁকে উদ্বাস্তুদের নাম পড়ছিল। —'চন্দ্র সূত্রধর, হরিমতি সূত্রধর—সরকার থিকা আপনেগো হগলেরে থাল গেলাস দেওন হইতে আছে। একে একে লইতে থাকেন—' নিরঞ্জন কখনও উদ্বাস্তুদের 'তুমি' করে বলে, কখনও 'আপনি'। নিরঞ্জনের পাশেই বিভাস এবং আরও দু'জন কর্মী দাঁড়িয়ে আছে। তারপর টিনের ড্রামগুলোর কাছে আরও কয়েকজন কর্মী। তাদের হাতে মস্ত মস্ত পেতলের হাতা।

বিভাসরা থালা-গেলাস দিয়ে ড্রামগুলোর দিকে উদ্বাস্তুদের পাঠিয়ে দিচ্ছে। ড্রাম বোঝাই রয়েছে খিচুড়ি; চালডালের সঙ্গে আলু কুমড়ো পটল এবং অন্যান্য সবজি সেদ্ধ করা হয়েছে। আলাদা করে তরকারি বা ভাজাটাজা করার সময় হয়তো পাওয়া যায়নি।

পুনর্বাসন বিভাগের একজন কর্মী হাতায় করে উদ্বাস্তুদের থালায় খিচুড়ি এবং অন্যজন আর একটা ড্রাম থেকে মগে করে গেলাসে গেলাসে খাওয়ার জল দিচ্ছে।

পরিতোষ একধারে দাঁড়িয়ে তদারক করছিল। সে খানিক দূরে বিছানো চটের আসনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে উদ্বাস্তুদের বলছিল, 'আপনেরা ওইখানে গিয়া বইসা বইসা খান। আইজ খিচোড়ি দেওয়া হইল। কাইল থিকা ভাত মাছ ডাইল দুধ পাইবেন। যান—'

বিনয়কে সঙ্গে করে বিশ্বজিৎ পরিতোষদের কাছে চলে এসেছিলেন। তাঁদের দিকে নজর পড়তেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে পরিতোষ। ক'পা এগিয়ে এসে জিগ্যেস করে, 'স্যার, আপনেরা কি অখন খাইবেন?'

বিশ্বজিৎ একটু হাসলেন। —'কখন সেই সকালবেলা ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছি। সন্ধে হতে চলল। এর ভেতর পেটে কিছু পড়েনি। পেটে হুতাশন জ্বলছে হে—'

রিফিউজিদের জন্য অ্যালুমিনিয়ামের নতুন নতুন থালা গেলাস ছাড়াও রয়েছে বেশ কিছু শালপাতার থালা আর মাটির গেলাস। পরিতোষ নিজের হাতে শালপাতার থালায় খিচুড়ি নিয়ে এল বিশ্বজিৎদের জন্য। বলল, 'আপনেরা খাইতে থাকেন স্যার। খাওন হইলে জল নিয়ে আসুম—'

বিশ্বজিৎ আন্দামানে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের প্রায় সর্বেসর্বা; বিপুল ক্ষমতাবান। কিন্তু তার জন্য আলাদা করে পোলাও কালিয়ার ব্যবস্থা করা হয়নি। নিশ্চয়ই আগে থেকে হুকুমনামা জারি করা আছে, যত বড় অফিসারই হোন, রিফিউজি সেটলমেন্টে এলে উদ্বাস্তুরা যা খাবে তাঁদেরও তা-ই খেতে হবে।

বিশ্বজিৎ বললেন, 'আমাদের জন্যে উতলা হতে হবে না। খিচুড়ি নিয়ে আসা তোমার উচিত হয়নি। যখন দরকার হবে, আমরাই জল চেয়ে নেব। তুমি ওধারে যাও। দেখ, কার কী লাগবে, পেট ভরে ওরা খাচ্ছে কি না—'

পরিতোষ চলে গেল।

ওধারে খিচুড়ি বিতরণ হয়ে গিয়েছিল। উদ্বাস্তুরা কাতার দিয়ে চটের আসনে বসে খাচ্ছে।

সন্ধে নেমে গেছে। কিছুক্ষণ আগেও যে অন্ধকার ফিকে ফিকে জোলো কালির মতো মনে হচ্ছিল, এখন তা অনেক গাঢ় হয়েছে। দক্ষিণ দিকের সমুদ্র আর দেখা যাচ্ছে না। বাকি তিন পাশের উঁচু উঁচু পাহাড় আর জঙ্গল প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় জন্তুর মতো ওত পেতে আছে। সেদিকে তাকালে বুকের ভেতর কেমন যেন শিহরন খেলে যায়। বিনয়ের মনে হয় পৃথিবীর বাইরে সৌরলোকের কোনও সৃষ্টিছাড়া গ্রহে এসে পড়েছে।

উদ্বাস্তুরা যেখানে বসে খাচ্ছিল সেখান থেকে নিরঞ্জনের গলা ভেসে আসে। কখন যে সে ওদের কাছে চলে গিয়েছিল, টের পাওয়া যায়নি।

নিরঞ্জন গলার স্বর উঁচুতে তুলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে যাচ্ছিল, 'ভাই সগল, পোর্ট ব্লেয়ার থিকা এতখানি পথ আইতে আপনেগো শরীলের উপুর দিয়া অনেকখানি তাফাল গ্যাছে। আইজ তরাতরি খাওনদাওন সাইরা গিয়া শুইয়া পড়েন। কাইল সকাল সকাল উইঠা পড়বেন। কাইল থিকাই আপনেগো জমিন দেওয়া হইব।'

খানিক দূরে দাঁড়িয়ে খিচুড়ি দিয়ে নৈশভোজ সারতে সারতে রীতিমতো অবাকই হয়ে গেল বিনয়। বিশ্বজিতের দিকে ফিরে বলল, 'এখানে সব দিকেই তো ঘোর জঙ্গল। বড় বড় ক'টা গাছ কাটা হয়েছে শুধু। এই জঙ্গলে জমি কোথায়? কী করে তা দেওয়া হবে? কে কতটা এলাকা পাচ্ছে তা-ই বা ঠিক হবে কীভাবে?'

বিশ্বজিৎ হাসলেন। —'কালই সব দেখতে পাবেন।'

খাওয়া হয়ে গেলে আঁচিয়ে, জল খেয়ে বিনয়কে নিয়ে বিশ্বজিৎ তাঁর ঘরে চলে গেলেন।

(প্রথম পর্ব সমাপ্ত)

অলংকরণ: ইন্দ্রনীল ঘোষ

banglabooks.in

● উপন্যাস

উত্তাল সময়ের ইতিকথা

pathagar.net

প্রফুল্ল রায়

পোর্ট ব্লেয়ার থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরের এই জেফ্রি পয়েন্টে অন্ধকার নেমে গিয়েছিল অনেকক্ষণ আগেই। সেই সঙ্গে নেমেছে গাঢ় কুয়াশা। এখন শুক্লপক্ষ। আকাশে পূর্ণ চাঁদের মায়াবী আলো। অন্ধকার আর কুয়াশার স্তরগুলো ভেদ করে চুঁইয়ে চুঁইয়ে সেই আলো এসে পড়েছে দক্ষিণ আন্দামানের এই সৃষ্টিছাড়া ভূখণ্ডে।

তিনদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়ের মাথায় হাজার বছরের আদিম অরণ্য, অন্যদিকে যতদূর চোখ যায় ধু-ধু দিগন্ত অবধি সমুদ্র—অফুরান বঙ্গোপসাগর। অন্ধকার আর কুয়াশা মাখানো জ্যোৎস্না চারপাশের চরাচরকে অপার কোনও রহস্যে যেন মুড়ে

banglabooks.in

রেখেছে।

সমুদ্রকে ঝাঁকি দিতে দিতে উঠে আসছে জোরালো হাওয়া। তুমুল ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে সোনালি বালির বিচে। একটানা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে—শাঁই শাঁই। সমুদ্রের দিকটা ছাড়া বাকি সব কিছু একেবারে নিঝুম। অনন্ত নৈঃশব্দ্য বনভূমি, পাহাড় আর উপত্যকার ওপর পাষাণভারের মতো চেপে বসেছে।

এখানে নতুন উপনিবেশের পত্তন হবে। গড়ে উঠবে পূর্ব বাংলার ছিন্নমূল মানুষদের নতুন বাসভূমি। কয়েক ঘণ্টা আগে সেই বিকেল বেলায় দেড়শো উদ্বাস্তু পরিবারের শ' পাঁচেক মানুষের প্রথম দলটা এসে গেছে। সাড়ে চারদিন জাহাজে আর একটা রাত পোর্ট ব্লেয়ারে কাটিয়ে লরিতে চেপে চড়াই-উতরাই ভেঙে ঝাঁকানি খেতে খেতে যখন তারা পৌঁছল হাড়মজ্জা প্রায় ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। সন্ধে নামতে না নামতেই তাদের খাইয়ে ব্যারাকের মতো লম্বা ঘরগুলোতে শুতে পাঠিয়ে দিয়েছিল বিভাসরা। এখন তারা গভীর ঘুমের আরকে ডুবে আছে।

কিছুক্ষণ আগেও পুনর্বাসন দপ্তরের কর্মীদের কথাবার্তা কানে ভেসে আসছিল। তাদেরও আর সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। সারাদিন হইহই করে খাটাখাটুনির পর ওরাও অপার ক্লান্তিতে বিছানায় শরীর ঢেলে দিয়েছে।

বিশ্বজিৎ রাহার মাঝারি ধরনের ঘরটিতে টেবলের ওপর ঝুঁকে লিখে চলেছে বিনয়। টেবলের এক কোণে একটা ঝকঝকে কাচের বড় লণ্ঠন জ্বলছে; আরও একটা লণ্ঠনও রয়েছে। সেটা ঝুলছে সিলিং থেকে। দুই লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোয় ঘর ভরে গেছে।

এই ঘরের দুটো তক্তপোশে পুনর্বাসন দপ্তরের একজন কর্মী বিছানা পেতে মশারি টাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। একটা বিছানায় মশারির ভেতর শুয়ে শুয়ে ক্রাইম স্টোরি পড়ছেন বিশ্বজিৎ। তিনি ডিটেকটিভ গল্পের পোকা। অন্য বিছানাটা ফাঁকা। লেখা শেষ হলে বিনয়ও সেখানে শুয়ে পড়বে।

ঘরের চার কোনায় চারটে পেতলের সরায় মশা-মারার তেজি ধূপ পুড়ছে। এই বিজন অরণ্যে লক্ষ কোটি মশা আর বাড়িয়া পোকা দিবারাত্রি ঝাঁক বেঁধে টহল দিয়ে বেড়ায়। রাত্তিরে তাদের উদ্যমটা শতগুণ বেড়ে যায়। তারা টের পেয়েছে জেফ্রি পয়েন্টে নতুন মানুষ এসেছে। মানুষ মানেই তো টাটকা সুস্বাদু রক্ত।

বিনয়ের টেবলের সামনের বড় জানালাটা খোলা। ওরা ঘরে এসে ঢুকতেই বাড়িয়া পোকা আর মশাদের দঙ্গলগুলো ঢুকে আসছিল কিন্তু ধূপের উগ্র ঝাঁঝে ফিরে ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু যাদের এনার্জি বেশি, ভেতরে এসে হাত-পা-শুঁড়-ডানা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে দমবন্ধ হয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ঘরের এধারে ওধারে মরা পোকা আর মশাদের ডাঁই।

পরশু দুপুরে বিশ্বজিৎ পোর্ট ব্লেয়ারে ফিরে যাবেন। তাঁর হাতে 'নতুন ভারত'-এর জন্য অন্তত দুটো প্রতিবেদন তৈরি করে দিতেই হবে। আজ রাত্তিরে একটা লেখা শেষ না করলেই নয়। সেই সঙ্গে লিখতে হবে তিনটে চিঠি। বাকি প্রতিবেদনটা কাল এক ফাঁকে লিখে ফেলবে। বিশ্বজিৎ সেগুলো পোর্ট ব্লেয়ার থেকে প্লেনে কলকাতায় পাঠিয়ে দেবেন।

এক সময় প্রথম রিপোর্টটা শেষ হল। খিদিরপুর ডক থেকে হাজারখানেক উদ্বাস্তুকে নিয়ে 'এস এস মাহারাজা' জাহাজে রওনা হওয়ার পর থেকে পোর্ট ব্লেয়ারে পৌঁছনো পর্যন্ত অনুপুঙ্খ বিবরণ গুছিয়ে লিখেছে বিনয়। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় আতঙ্কে উদ্বাস্তুদের দিশেহারা হয়ে যাওয়া, তাদের মৃত্যুভয়, তাদের বুঝিয়েসুঝিয়ে ভরসা দিয়ে শান্ত করা, উত্তাল সমুদ্রে ভয়াবহ সাইক্লোনের মুখে পড়া—কোনও কিছুই বাদ যায়নি।

লেখাটা বেশ বড়ই হল। পুরো এগারো পাতা। আগাগোড়া সেটা পড়ে দু-চারটে শব্দ পালটে, তিন-চারটে প্যারা কেটে নতুন করে লিখল বিনয়। মনে হল রিপোর্টটা ভালোই দাঁড়িয়েছে। আন্দামানের প্রথম প্রতিবেদনটা যে 'নতুন ভারত'-এর পাঠকদের উৎসুক করে তুলবে তা নিয়ে বিনয়ের সংশয় নেই। ভেতরে ভেতরে তৃপ্তিই বোধ করল সে। একটা লাগসই হেডিং দিতে হবে। খানিকক্ষণ ভেবে প্রথম পাতার মাথায় বড় বড় অক্ষরে লিখে ফেলল 'উত্তাল কালাপানি পেরিয়ে উদ্বাস্তুদের আন্দামান যাত্রা'। তারপর কাগজগুলো গুছিয়ে পিন দিয়ে গেঁথে টেবলের এক পাশে রাখল।

ঘাড় গুঁজে একটানা কলম চালিয়েছে। একটু ক্লান্তই লাগছিল বিনয়ের। পিঠটা পেছন দিকে হেলিয়ে জানালার বাইরে তাকাল সে। সন্ধের পর থেকে যেমনটা দেখেছিল তার কোনও হেরফের নেই। ঘোলাটে চাঁদের আলো, কুয়াশা আর অন্ধকারে দক্ষিণ আন্দামানের পাহাড় অরণ্য জুড়ে সেই অন্তহীন নিশুতি। কিছুক্ষণ আগেও সমুদ্রের দিক থেকে জোর হাওয়া দিচ্ছিল। হঠাৎ হাওয়ার

banglabooks.in

তেজ পড়ে গেছে। বঙ্গোপসাগরের লক্ষ কোটি ঢেউ বাতাসের ধাক্কায় পাড়ে এসে বিপুল গর্জনে অবিরল ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। এখন সেই আওয়াজ থেমে গেছে। কোনও এক অদৃশ্য ম্যাজিসিয়ান জাদুকাঠি ছুঁইয়ে আচমকা যেন জেফ্রি পয়েন্টের সব শব্দ থামিয়ে দিয়েছে।

এই রাত্রিবেলা আদিম প্রকৃতির নিস্তব্ধ খাঁজের ভেতর বসে থাকতে থাকতে কেমন যেন গা ছম ছম করে।

কয়েক মিনিট বাইরে তাকিয়ে থাকার পর সুটকেস থেকে চিঠির কাগজ খামটাম বার করে নিল বিনয়। আপাতত তিনটে চিঠি লিখতে হবে। একটা 'নতুন ভারত'-এর চিফ রিপোর্টার প্রসাদ লাহিড়িকে, একটা আনন্দকে, একটা সুধাকে। চকিতে মনে পড়ে গেল, কলকাতা থেকে জাহাজে ওঠার আগে ঝুমা কতবার যে বলেছে আন্দামানে পৌঁছেই বিনয় যেন তাকে চিঠি লেখে। বিনয় নিজেও জানিয়েছিল, লিখবে, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই লিখবে।

ঝিনুক নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার পর তার জীবন জুড়ে যে ধু-ধু শূন্যতা নেমে এসেছিল সেই ফাঁকটা ধীরে ধীরে ভরিয়ে তুলেছিল ঝুমা। রাজদিয়ায় তাকে নিয়ে দুই কিশোরীর মধ্যে যে মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছিল তা কতকাল চলত, কে জানে। কলকাতায় আসার পর যখন তারা পূর্ণ যুবতী তখনও সেই যুদ্ধের অবসান হয়নি।

ঝুমা এক পরমাশ্চর্য মেয়ে। যেন কোনও মায়া কাননের পরি। কী যে তীব্র সম্মোহন তার। এস্রাজে ছড় টানার মতো তার হাসি, তার কণ্ঠস্বরে হালকা ঝংকার, নিটোল ফুলদানির মতো গ্রীবা বাঁকিয়ে আধবোজা চঞ্চল চোখে তাকানো, তার সারা শরীর থেকে উঠে আসা উগ্র সুগন্ধ বিনয়কে আচ্ছন্ন করে ফেলত। শত আলোকবর্ষ দূরের পূর্ব বাংলার ছোট্ট শহর রাজদিয়ায় এক বিজন দুপুরে কিশোরী ঝুমা তাদের বাড়ির চিলেকোঠায় একটি চুম্বনে সেদিনের বিনয়ের স্নায়ুতে ঝড় বইয়ে দিয়েছিল। বিনয়ের হাত ধরে জীবনের অজানা রহস্যের অনেকগুলো দরজা পার করে যৌবনের সীমানায় পৌঁছে দিয়েছে সে। তার কাছে গেলে সারা শরীর ঝিম ঝিম করত। প্রবল আকর্ষণে সমস্ত শিকড় ছিঁড়ে ঝুমা বিনয়কে ছিনিয়ে নিতে চাইত।

অন্যদিকে ছিল ঝিনুক। চিরদুঃখী মেয়েটার শান্ত করুণ মুখ, বিষাদ মাখানো চোখের তাকানো, তার নিঝুম বসে থাকা, তার সংগোপন যাতনা—সব মিলিয়ে এমন এক শক্তি ছিল যা দিয়ে বিনয়কে নিজের কাছে ধরে রেখেছে। ঝুমা তার সমস্ত মাদকতা দিয়েও তাকে পুরোপুরি কেড়ে নিতে পারেনি।

কিন্তু ঝিনুক নিখোঁজ হওয়ার পর উদ্‌ভ্রান্তের মতো কলকাতা এবং মহানগরের চারপাশে পঁচিশ-তিরিশ মাইল দূর অবধি ঘুরে ঘুরেও যখন তার সন্ধান পাওয়া গেল না, ভেঙেচুরে একেবারে তছনছ হয়ে গিয়েছিল বিনয়। সেই সময় অফুরান মমতায় পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল ঝুমা। যে মেয়ে পুরুষের রক্তে তুফান তোলে, জাদুকরির মতো আঙুলের ডগায় তুলে তাকে নাচায়, তুড়ি মেরে মেরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে মাতিয়ে দিতে পারে, এ যেন সেই ঝুমা নয়। কী প্রগাঢ় মায়া এই ঝুমার, কী অনন্ত সহানুভূতি।

ঝিনুক জনারণ্যে হারিয়ে যাওয়ার পর এক সময় বিনয়ের মনে হয়েছিল আকাশ খান খান হয়ে ভেঙে পড়েছে। ঝিনুককে ছাড়া কীভাবে দিন কাটবে ভাবতেও পারছিল না। সে যে কী নিদারুণ ক্লেশ, কী যে অসহ্য দাহ! কিন্তু জীবন তো এক জায়গায় থেমে থাকে না; তার ভাঁজে ভাঁজে কত যে ইন্দ্রজাল লুকনো আছে, আগে তা কি সে জানত? ঝিনুক তার হাড়েমজ্জায় যে দগদগে রক্তাক্ত ক্ষত রেখে গিয়েছিল, ঝুমা তার ওপর স্নিগ্ধ প্রলেপ লাগিয়ে দিয়েছে। তখন পাগল পাগল, অস্থির সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে সে। তাকে সেখান থেকে তুলে এনে কত যত্নে ঝুমা যে সুস্থ স্বাভাবিক করে তুলেছে। ক্রমশ বিনয়ের মনে হয়েছে স্বেচ্ছায় যে মেয়েটি হারিয়ে গেছে তার জন্য বাকি দীর্ঘ জীবনটা শুধু স্মৃতি, হাহাকার আর দীর্ঘশ্বাস নিয়ে কাটানো যায় না। অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেকে ঝুমার হাতে সঁপে দিয়েছে সে।

কিন্তু কে জানত, আন্দামানে 'রস' আইল্যান্ডে ঝিনুকের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাবে? না, তাকে ভোলা যায়নি। বুকের ভেতর যে গোপন ক্ষতটা মনে হয়েছিল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ফের সেটা সময়ের স্তর ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে। বিনয় টের পেয়েছে, নতুন করে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে। ঝিনুকের জন্য সেই পুরনো আবেগ আর তীব্র ব্যাকুলতা তাকে উথালপাতাল করে দিয়েছে। আরও একবার সে টের পেয়েছে তার শ্বাসপ্রশ্বাসে মেয়েটা জড়িয়ে আছে। আমৃত্যু জড়িয়েই থাকবে।

ঝিনুককে দেখার পর ঝুমা বহু—বহু দূরে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। এ এক আশ্চর্য খেলা। যতদিন ঝিনুককে পাওয়া যায়নি, সেই শূন্য স্থানে চলে এসেছিল ঝুমা। কিন্তু এখন? বিনয়ের অজান্তে কেউ যেন তাকে নিঃশব্দে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে।

এরপর ঝুমাকে চিঠি লেখা কি ঠিক হবে? বিনয় মনস্থির করে ফেলল লিখবে না। লেখাটা মহা অন্যায়। এক ধরনের পাপই হবে। সে যেন নিয়তিতাড়িত এক মানুষ। ঝিনুকই তার নিয়তি। তাকে বাদ দিয়ে অন্য কোনও নারীর কথা এই মুহূর্তে সে ভাবতে পারছে না। ঝুমা খুবই কষ্ট পাবে, ভেঙেও পড়বে কিন্তু সম্পর্কটা খুব সম্ভব রাখা যাবে না। ঝুমাকে সে কি ভালোবাসেনি? বেসেছে। দঃখের দিনে সংকটের সময় সে যখন চুরমার হয়ে যাচ্ছিল, ঝুমা পাশে থেকে তাকে ধসে পড়তে দেয়নি। অবিরল শুশ্রূষায় সব কষ্ট ভুলিয়ে দিতে চেয়েছে। এটা তো ঠিক মনপ্রাণ ঢেলে মেয়েটা তাকে ভালোবেসেছে। কিন্তু যে 'রস' আইল্যান্ডে ঝিনুককে দেখার পর বিনয়ের মনে হয়েছে জীবনের প্রথম নারীটি তার বত্রিশ নাড়ি ধরে টান দিয়েছে। ঝিনুকের সঙ্গে কাল একটি কথাও হয়নি। 'চলুঙ্গা' জাহাজের আপার ডেকে দাঁড়িয়ে ছিল সে। জাহাজটা দূরে, আরও দূরে, ধীরে ধীরে ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। তারপর অন্য একটা দ্বীপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। সেই যে দেখা হয়েছিল তারপর থেকে ঝিনুক ঝুমার কাছ থেকে প্রবল টানে উপড়ে নিয়ে গেছে তাকে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে বিনয়। তারপর প্রথম চিঠিটা লেখে প্রসাদ লাহিড়িকে। খুবই সংক্ষিপ্ত চিঠি। সে নিরাপদে আন্দামানে পৌঁছেছে, উদ্বাস্তু পরিবারগুলির সঙ্গে কাল চলে এসেছে জেফ্রি পয়েন্টে; গভীর অরণ্যের মধ্যে এখানেই রিফিউজি সেটলমেন্ট গড়ে উঠবে। দু'টো প্রতিবেদন আপাতত সে পাঠাচ্ছে। এরপর দু'দিন পর পর পাঠাতে থাকবে। 'নতুন ভারত'-এর কপি এয়ারমেলে যদি বিশ্বজিৎ রাহার ঠিকানায় পাঠানো হয় সে পেয়ে যাবে। ঠিকানাও লিখে দিল: C/o বিশ্বজিৎ রাহা, মেরিন জেটির কাছে। পোর্ট ব্লেয়ার। আন্দামান। প্রণাম জানিয়ে চিঠি শেষ করল বিনয়।

পরের চিঠিটা সে লিখল আনন্দকে। এটাও ছোট চিঠি। নির্বিঘ্নে পৌঁছবার খবর দিয়ে বিনয় জানাল, সে ভালোই আছে। তার জন্য কেউ যেন দুশ্চিন্তা না করে। বাড়ির কে কেমন আছে, ইত্যাদি জানিয়ে আনন্দ যেন মাঝে মাঝে চিঠি লেখে। বিনয়ও লিখবে। বিশ্বজিৎ রাহার ঠিকানা জানিয়ে সেখানেই যোগাযোগ করতে লিখল। তার চিঠিতে ঝুমার নামটা পর্যন্ত নেই।

বিনয় জানে, কলকাতায় আনন্দর কাছে চিঠি পৌঁছানোমাত্র খবর পেয়ে যাবে ঝুমা। তাকে না লিখে তার মামাকে লিখেছে, এতে ভীষণ ভেঙে পড়বে মেয়েটা। কিন্তু কিছু করার নেই বিনয়ের। চকিতের জন্য তার খেয়াল হল, অনন্তকাল সে আন্দামানে পড়ে থাকবে না। একমাস কি দু'মাস পর তাকে কলকাতায় ফিরে যেতেই হবে। তখন কি ঝুমা তার কাছে ছুটে আসবে না? তার ব্যাকুলতার সামনে দাঁড়িয়ে কী জবাব দেবে সে? না—এখন আর সেসব ভাবতে পারছে না বিনয়।

ঝুমার চিন্তাটা মাথা থেকে এক রকম জোর করেই বার করে দিয়ে শেষ চিঠিটা লিখতে শুরু করল বিনয়।

'প্রিয় ছোটদি,

এখন অনেক রাত। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে অনেক দূরে আজ

banglabooks.in

বিকেলে আমরা এমন একটা সৃষ্টিছাড়া জায়গায় এসে পৌঁছেছি, কলকাতায় বসে তুই তা কল্পনাই করতে পারবি না। তিনদিকে গভীর অরণ্য, একদিকে সমুদ্র। এই এলাকাতেই কাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানের উপনিবেশ তৈরির কাজ শুরু হবে। মনে হচ্ছে পশ্চিম আফ্রিকার সুগভীর অরণ্যে ঘেরা আদিকালের এক অজানা, রহস্যময় পৃথিবীতে এসে পড়েছি। যতদূর চোখ যায়, এলাকাটা এত নির্জন, এমনই নিঝুম যে গা ছম ছম করে। এখানে বেশ কিছুদিন আমাকে থাকতে হবে। আমার ধারণা, এমন সব ঘটনা আর অভিজ্ঞতা হবে, আগে আর কখনও তা হয়নি।

সে যাক, তোরা কেমন আছিস? তুই তো সেই ছেলেমানুষ বয়স থেকেই ছিঁচকাঁদুনে; একটুতেই কেঁদে কেটে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভাসিয়ে দিস। আমার জন্য ভেবে ভেবে মোটেও শরীর খারাপ করবি না। তোর ঠাকুরঘরে যে শ'খানেক দেবদেবী রয়েছে তাদের নামে দিব্যি করে বলছি, আমি ভালো আছি। আমার বিপদের কোনও ভয় নেই। যেসব অফিসার এবং পুনর্বাসন দপ্তরের কর্মীরা সেটলমেন্ট গড়ার দায়িত্ব নিয়েছেন তাঁরা সব সময় আমার দিকে লক্ষ রাখছেন। আদরযত্নের লেশমাত্র ত্রুটি নেই।

একজনের জন্য আমি ভীষণ দুর্ভাবনায় আছি। তিনি হেমদাদু। কলকাতায় থাকলে পূর্ব পাকিস্তানের অনেক খবর পাওয়া যায়। কিন্তু বেশ কয়েকদিন ধরে পৃথিবী নামে গ্রহটির সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক যেন ছিঁড়ে গেছে। পূর্ব পাকিস্তানে কী হচ্ছে, সেখানকার হাল আরও খারাপ হয়ে গেছে কি না, কিছুই বুঝতে পারছি না।

বর্ডার থেকে নিত্য দাস এর মধ্যে কি হেমদাদুর চিঠিপত্র দিয়ে গেছে? যদি দাদুর চিঠি আসে, খামে ভরে নিচের ঠিকানায় অবশ্যই পাঠিয়ে দিবি।.....'

এই পর্যন্ত লেখার পর হঠাৎ ঝিনুকের মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এই মেয়েটার প্রতি যার অনন্ত সহানুভূতি, সবাই মুখ ফিরিয়ে নিলেও একমাত্র সে-ই তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়েছিল। লাঞ্ছনায়, গ্লানিতে, অসম্মানে চিরদুঃখী ঝিনুক যখন নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, খুবই কষ্ট পেয়েছিল সুধা।

তার এই ছোটদির কাছে সেই জ্ঞানবুদ্ধি হবার বয়স থেকে কখনও কিছু লুকোয়নি বিনয়। তার জীবনের ভালোমন্দ, সংকট বা আনন্দের মুহূর্তগুলো অকপটে মেলে ধরেছে।

কিন্তু না, ঝিনুকের কথা এখন কিছুতেই লিখতে পারবে না। আপাতত তা গোপনই রাখবে। তার কারণও রয়েছে। ঝিনুকের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে মাত্র। কিন্তু কথা বলার সুযোগ পাওয়া যায়নি। সে রয়েছে মধ্য আন্দামানে, আর বিনু দক্ষিণ আন্দামানের জেফ্রি পয়েন্টে। দূরত্ব আর কতটুকু? বড়জোর ষাট কি সত্তর মাইল। সে তো মাইলের হিসেবে। কিন্তু এই দুর্গম দ্বীপপুঞ্জে যাতায়াত এমনই দুরূহ যে এক মাসের মধ্যে সেখানে যাওয়া অসম্ভব। এর থেকে লক্ষ কোটি মাইল দূরের নক্ষত্রলোকে পৌঁছনো অনেক সহজ।

সবার আগে মধ্য আন্দামানে গিয়ে ঝিনুককে খুঁজে বার করতে হবে। নিরুদ্দেশ হবার পর থেকে কতটা দুঃখ, কতখানি ক্লেশ, কতখানি অভিমান মনের গোপন কুঠুরিতে সে জমিয়ে রেখেছে প্রথমে তা জানতে হবে। সামনাসামনি তাকে দেখে ঝিনুকের কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে, ঘৃণায় ক্রোধে তাকে ফিরিয়ে দেবে কি না কিছুই জানা নেই।

বিনয়ের ধারণা, বিনয়ের বিশ্বাস ঝিনুক তাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। কিন্তু মাঝখানের কয়েক মাসে সে যদি পুরোপুরি বদলে গিয়ে থাকে? যদি সে তাকে ফিরিয়ে দেয়? বুকের ভেতরটা হঠাৎই ভীষণ উতলা হয়ে ওঠে বিনয়ের।

খানিকক্ষণ পর মন কিছুটা শান্ত হলে সে ফের লেখা শুরু করে।

'জানিস ছোটদি, আন্দামানে আসার পর এমন একটা ঘটনা ঘটেছে তার পরিণাম সুখকর হবে, নাকি অনন্ত বেদনাদায়ক, বুঝতে পারছি না। ঘটনাটি আমাকে প্রবল সংশয়ের মধ্যে ছুড়ে দিয়েছে। এ বিষয়ে এই চিঠিতে আর কিছু লিখছি না। তেমন বুঝলে পরে সমস্ত জানাব। দ্বারিকদাদু, জেঠিমা, হিরণদা আর তুই আমার ভালোবাসা এবং প্রণাম নিস। ইতি তোদের বিনু।'

নিচে বিশ্বজিৎ রাহার ঠিকানা দিয়ে লিখল, 'এখানে উত্তর দিলে আমি পেয়ে যাব।'

আগাগোড়া চিঠিটা একবার পড়ল বিনয়। আচমকা খেয়াল হল, ঝিনুকের ব্যাপারটা গোপন রাখবে ঠিক করেও নিজের অজান্তেই তার সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত দিয়ে ফেলেছে। লাইনগুলো কেটে দেবে কি? পরক্ষণে ভাবল, লেখা যখন হয়েই গেছে—থাক।

তিনটে চিঠি তিনটে খামে পুরে মুখ আঠা দিয়ে আটকে আনন্দ, প্রসাদ এবং সুধার পুরো নাম ঠিকানা লেখা যখন শেষ হয়েছে সেই সময় দূর থেকে অনেকগুলো ড্রাম বাজানোর একটানা তীব্র আওয়াজ ভেসে এল। কারা যেন উন্মাদের মতো বাজিয়ে চলেছে।

আদিম বনভূমির অন্তরাত্মা ভেদ করে শব্দপুঞ্জ উঠে আসছে। মধ্যরাতের নিরেট স্তব্ধতা ভেঙেচুরে খান খান হয়ে যাচ্ছে।

অজানা ভয়াবহ কোনও আশঙ্কায় পা থেকে মাথা অবধি কেঁপে যায় বিনয়ের।

এদিকে বাইরে তুমুল হইচই শুরু হয়ে গেছে। পুনর্বাসন দপ্তরের কর্মীরা সারাদিন অসুরের মতো খেটে কোনওরকমে খাওয়াদাওয়া সেরে অসাড়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ড্রামের শব্দে তাদের চোখ থেকে লহমায় ঘুম ছুটে গেছে। বিছানা থেকে উঠে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে যে যার ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে।

জানালার বাইরে বিহ্বলের মতো তাকিয়ে ছিল বিনয়। দেখতে পেল কতকগুলো ছায়ামূর্তি ক্ষিপ্র হাতে একের পর এক মশাল জ্বালাচ্ছে। বেশ কয়েকজনের হাতে লম্বা লম্বা টর্চ। ওদের মধ্যে থেকে কয়েকজন সমানে চেঁচিয়ে চলেছে, 'জারোয়া—জারোয়া—হোঁশিয়ার'।

নতুন সেটেলমেন্টের এধারের অংশটুকু আলোয় ভরে গেছে। এখন বাইরের লোকগুলোকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কলোনাইজেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট পরিতোষ বণিক, চেইনম্যান ধনপত সিং, তার চারজন বর্মি সহকারী, বিভাস, নিরঞ্জন এবং রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টের অন্য সব বাঙালি এবং অবাঙালি কর্মীরা, যাদের মধ্যে বেশ ক'জন পুরানো দাগি আসামি। এরা ব্রিটিশ আমলে যাবজ্জীবন 'কালাপানি'র সাজা নিয়ে আন্দামানে জেল খাটতে এসেছিল।

ওদিকে পাশের খাটে সচকিত হয়ে উঠে বসেছেন বিশ্বজিৎ। হাতের বইটা একধারে রেখে মশারি তুলে নেমে এলেন। বললেন, 'চলুন, দেখা যাক কী হল—'

॥ দুই ॥

উত্তর দিকে অনেকটা দূরে চাপ-বাঁধা, ঝাপসা, উদ্দাম জঙ্গলের ভেতর ড্রামের আওয়াজ ক্রমশ আরও তীব্র হয়ে উঠছে। সেই সঙ্গে ভেসে আসছে বেশ কিছু মানুষের হইচই। তারা একসঙ্গে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কী বলছে, এখান থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।

অত দূরের ওই জঙ্গলে এত রাতে কারা ড্রাম পেটাচ্ছে, কিছুই আন্দাজ করতে পারল না বিনয়। অজানা শঙ্কায় তার বুকের ভেতরটা কেঁপে গেল।

উত্তর দিকে তাকিয়ে ছিলেন বিশ্বজিৎ। পলকহীন। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে বিনয়। নিচু গলায় জিগ্যেস করল, 'কারা ড্রাম বাজাচ্ছে?'

বিশ্বজিৎ তার দিকে তাকালেন না। দূরে চোখ রেখে বললেন, 'বুশ পুলিশেরা।'

ব্যাপারটা বোধগম্য হল না। বিনয় জানতে চাইল, 'বুশ পুলিশ বলতে?'

এবার চোখ ফেরালেন বিশ্বজিৎ। দূরের দুর্ভেদ্য বনভূমির দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, 'ওখানে পেরিমিটার রোড রয়েছে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পশ্চিম থেকে ওটা পুব দিকে চলে গেছে।'

বিনয়ের কাছে ব্যাপারটা গুলিয়ে গেল। সে জিগ্যেস করে, 'জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা আছে নাকি?'

pathagar.net

banglabooks.in

'না না—'

বিশ্বজিৎ বুঝিয়ে দিলেন, পেরিমিটার রোড নামে রাস্তাটা পুরোপুরি কাল্পনিক। ওটা মোটামুটি ভেবে নেওয়া হয়েছে। জঙ্গলে সোজা একটা লাইন ধরে দেড়-দুশো গজ দূরে দূরে তিরিশ-চল্লিশ ফিট উঁচু উঁচু টঙ বানিয়ে দিনরাত পালা করে তিন শিফটে পুলিশের একটা দল পাহারা দেয়। কেননা পেরিমিটার রোডের ওধারে আরও গভীর অরণ্যে হিংস্র জারোয়ারা থাকে। মাঝে মাঝেই তারা এ ধারের পুরনো পেনাল কলোনি আর যেসব নতুন রিফিউজি সেটলমেন্ট বসছে, সেখানে হানা দেয়। ওরা হয়তো মনে করে আন্দামানের সব জঙ্গলের অধিকার একমাত্র তাদেরই। সেখানে অন্য কেউ এসে থাকুক, একেবারেই তা চায় না। এই-সব অনুপ্রবেশকারীকে তাড়াতেই তাদের অবিরত সশস্ত্র হানাদারি। ওদের গতিবিধির ওপর সর্বক্ষণ নজর রেখে চলেছে বুশ পুলিশ। তির-ধনুক বা অন্য ধরনের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যখনই তারা সেটলমেন্টগুলোর দিকে আসতে থাকে, ড্রাম পিটিয়ে, হল্লা করে বুশ পুলিশ সবাইকে সতর্ক করে দেয়। খুব সম্ভব আজ জারোয়াদের গতিবিধি লক্ষ করে তারা ড্রাম বাজিয়ে চলেছে।

ধনপত কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। এগিয়ে এসে বলল, 'আগে যা কর দেখুঙ্গা।'

বিশ্বজিৎ বললেন, 'দেখ—'

মশাল হাতে দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে ধনপত তক্ষুনি উত্তর দিকে জোর জোরে পা চালিয়ে দিল।

নয়া সেটলমেন্টের খানিকটা অংশ বিশাল বিশাল গাছ কেটে, ঝোপঝাড় নির্মূল করে বন বিভাগের কর্মীরা সাফ করে রেখেছিল। সে আর কতটুকু এলাকা! তারপর আন্দামানের হাজার বছরের প্রাচীন অরণ্য অপার রহস্য আর ভয়াবহতা নিয়ে আকাশের দিকে মাথা তুলে আছে।

ধনপতদের তিন জনের হাতে তিনটে মশাল। ফাঁকা জায়গাটা তারা সবে পেরিয়েছে, তখনই দেখা গেল আট-দশজন হট্টাকট্টা চেহারার বুশ পুলিশ, হাতে বন্দুক, জঙ্গল ভেদ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে বেরিয়ে এসে ধনপতদের দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের চোখেমুখে উত্তেজনা, ত্রাস। ধনপতদের সঙ্গে ওরা কিছুক্ষণ কথা বলল, তার একটা বর্ণও শুনতে পেল না বিনয়রা।

একটু পরেই দেখা গেল বুশ পুলিশের দলটাকে নিয়ে ধনপতরা ফিরে এল।

বুশ পুলিশরা প্রায় সবাই বিহারি আর পাঞ্জাবের লোক। চাকরি নিয়ে দুর্গম দ্বীপে চলে এসেছে।

বিশ্বজিৎ ওদের চেনেন। পুলিশের দলটাও তাঁকে খুব ভালো করেই চেনে। জিগ্যেস করলেন, 'ডিউটি ছেড়ে তোমরা পালিয়ে এলে কেন?'

বিনয় লক্ষ করল, বিশ্বজিতের কপাল কুঁচকে গেছে। পুলিশরা ঘাঁটি ছেড়ে চলে আসায় তিনি খুবই বিরক্ত।

পুলিশরা হাইমাই করে তড়বড়িয়ে একসঙ্গে বলতে শুরু করল, ফলে বিরাট এক হট্টগোলের সৃষ্টি হল।

গলা চড়িয়ে ধমকের সুরে বিশ্বজিৎ বললেন, 'হল্লাগুল্লা মাত কর। এক সাথ নেহি—' একজন সিপাহি শিখের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, 'তুম বোলো। আইস্তা আইস্তা। হড়বড়াকে নেহি।'

শিখ জানাল, তারা পেরিমিটার রোডে টঙের মাথায় বসে অন্যদিনের মতো জারোয়া এলাকার দিকে নজর রাখছিল। আচানক দেখতে পেল দূর থেকে জংলিরা তির-ধনুক ইত্যাদি মারাত্মক হাতিয়ার নিয়ে সেটলমেন্টের দিকে আসছে। নয়া আদমিরা অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের উৎখাত মানুষেরা বনজঙ্গল কেটে এখানে কলোনি বসাতে এসেছে তা তারা টের পেয়ে গেছে। এই এলাকায় বাইরের লোকজন এসে পাকাপাকিভাবে থাকুক সেটা তাদের আদৌ পছন্দ নয়। তাই জারোয়াদের মতলব ছিল মধ্যরাতে হামলা চালিয়ে উদ্বাস্তুদের ভাগিয়ে দেবে।

বুশ পুলিশ জারোয়াদের দেখামাত্র ড্রাম পিটিয়ে হল্লা বাধিয়ে সেটলমেন্টের সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, ড্রামের আওয়াজ-টাওয়াজ কেউ যদি শুনতে না পেয়ে থাকে তাই শিখেরা কয়েকজন এখানে দৌড়ে এসেছে।

এদিকে লম্বা লম্বা ব্যারাকগুলোতে উদ্বাস্তুরা মড়ার মতো অসাড়ে ঘুমচ্ছিল। হইচই শুনে তাদের চোখ থেকে ঘুম ছুটে যায়। বাচ্চাকাচ্চা ছেলেবুড়ো সুদ্ধ শ'পাঁচেক মানুষ হুড়মুড় করে বাইরে বেরিয়ে আসে।

বিনয় লক্ষ করল, মশালের আলোয় তাদের তিনদিক ঘিরে উদ্বিগ্ন মানুষের সারি সারি মুখ। ভিড়ের ভেতর থেকে হলধর দুবধর, মাখন রুদ্রপাল, এমনি কয়েকজন ভয়ে ভয়ে সামনে এগিয়ে আসে।

দূরে বুশ পুলিশের টঙগুলো থেকে অবিরাম ড্রামের গম্ভীর, হাড়-কাঁপানো শব্দ ভেসে আসছে। সেই সঙ্গে অরণ্য ভেদ করে আসছে হইচই।

হলধর জিগ্যেস করে, 'মইদ্য রাইতে ঢাকের বাদ্যি ক্যান টোবাবু? মেলা (অনেক) মাইনষে চিল্লাইতেও আছে।'

মাখন রুদ্রপাল বলল, 'এই অচিন দ্যাশে ডরে বুক কাপে টোবাবু। কুনো বিপদ কি ঘটল?'

আচমকা বর্মি চেইনম্যানদের একজন বলে ওঠে, 'জারোয়া আতা হ্যায়। উসি লিয়ে হোঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছে।' বহুকাল আন্দামানে থাকার কারণে সে এবং তার মতো সব বর্মি এবং কারেন হিন্দুস্থানিটা রপ্ত করে ফেলেছে। আঠারোশো সাতান্নর মহাবিদ্রোহের পর যুক্তপ্রদেশ থেকে যে বিপ্লবী সিপাহিদের আন্দামানে পাঠানো হয়েছিল তখন থেকেই এখানকার মুখের বুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে হিন্দুস্থানি হিন্দি আর উর্দুর মিশেলেও এই ভাষাটা সবাই বলে থাকে—সে বর্মিই হোক বা কারেন, কিংবা বাঙালি তামিল অর্থাৎ মারাঠি—তফাৎ ভারতের সমস্ত প্রদেশের মানুষও।

এতক্ষণ পাঁচশো মানুষের বিশাল জনতার মুখে চোখে ছিল উৎকণ্ঠা। লহমায় সেখানে আতঙ্ক ফুটে বেরুল। শোরগোল জুড়ে দিল তারা।

'গরমেন (গভর্নমেন্ট) আমাগো মারতে লইয়া আইছে এই আন্ধারমান দ্বীপে।'

'সমুন্দুরে ঝড় তুফানে আছাড়িপিছাড়ি খাইছি। টেউগুলান আকাশে তুইলা পাতালে নামাইয়া আমাগো দুরমুশ করতে করতে হাড্ডিগুড্ডি চুর চুর কইরা ছাড়ছে। হের পরেও বাইচা আছিলাম। কিন্তুক জারোর (জারোয়ার) হাত থিকা নিস্তার নাই। অরা আমাগো নিকাশ কইরা ছাড়ব।'

হলধর কাঁপা কাঁপ গলায় বিনয়কে বলল, 'রস' দ্বীপ থিকা ইস্টিমারে পুট বিলানে (পোর্ট ব্লেয়ারে) আসনের সোময় জারোগো কথা আপনেরে কইছিলাম। পাকিস্থানে রাজাকার, আর পশ্চিমা মুসলমানগো হাত থিকা কুনোরকমে বাপ-মায়ের দেওয়া পরানডা লইয়া ইন্ডিয়ায় আইছিলাম। আন্ধারমানে আমাগো নিঘ্‌ঘাত মরণ। আপনের উপুর ভরসা কইরা এই আমরা কই (কোথায়) আইলাম!'

বিনয় বিব্রতভাবে কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, আচমকা ডান ধারে ভিড়ের শেষ মাথায় যে উদ্বাস্তুরা দাঁড়িয়ে ছিল, তুমুল হুলস্থূল বাধিয়ে দিল। জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে উন্মাদের মতো বলতে লাগল, 'এইহানে আমরা থাকুম না। আমাগো এই যমের পুরী থিকা অন্য হানে লইয়া যান।'

বয়স্ক পুরুষগুলোর হইচই শুনতে শুনতে নানা বয়সের মেয়েমানুষ এবং বাচ্চারা ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। তারা ডাক ছেড়ে প্রচণ্ড কান্না জুড়ে দিল।

চিৎকার এবং কান্নার একটানা শব্দ জেফ্রি পয়েন্টের পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেতে খেতে মাঝরাতের আবহাওয়াটাকে উতরোল করে তোলে।

ড্রামের আওয়াজে এবং জারোয়াদের হাতিয়ার হাতে দূরের জঙ্গল থেকে ধেয়ে আসার খবর শুনে বিশ্বজিৎরা ভীষণ দুশ্চিন্তায়

banglabooks.in

ছিলেন। উদ্বাস্তুদের কান্না এবং চেঁচামেচিতে তাঁরা একেবারে হকচকিয়ে যান।

হতচকিত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে বিশ্বজিৎদের খানিকটা সময় লাগল। তারপর বিশ্বজিতের সঙ্গে পুনর্বাসন দপ্তরের কর্মীরা উদ্বাস্তুদের বোঝাতে লাগল, তাদের কোনও ভয় নেই। বুশ পুলিশ আছে, পুনর্বাসন এবং কাছাকাছি বন বিভাগের অগুনতি কর্মী আর ফরেস্ট গার্ড রয়েছে, তেমন বুঝলে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে আরও পুলিশ আনা হবে। জায়োরারা উদ্বাস্তুদের চামড়ায় একটি আঁচড় কাটতে পারবে না। কিন্তু কে কার কথা শোনে! তাদের কান্না এবং চিৎকার ক্রমশ আরও উদ্দাম হয়ে উঠতে থাকে।

ধনপত বিশ্বজিতের খুব কাছে এসে চাপা গলায় বলে, 'এ আদমিলোক কোনও কথা শুনবে না। হুকুম দেন তো থামাতে কোসিস করি।'

বিশ্বজিৎ বললেন, 'দেখ চেষ্টা করে।'

ধনপত উদ্বাস্তুদের দিকে সরে গিয়ে গলার স্বর শেষ পর্দায় তুলে হুঙ্কার ছাড়ে, 'রিফুজলোগ বিলকুল চোপ। রোনা (কাঁদা), চিল্লানা বন্ধ্ কর।' বিনয় আগেই শুনেছে উনিশ বছর আগে তিন তিনটি খুন করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আসামি হিসেবে কালাপানিতে সাজা খাটতে এসেছিল ধনপত। এই মধ্যরাতে তার ভেতর থেকে সেই দুর্ধর্ষ কয়েদিটি হঠাৎই বেরিয়ে এসেছে। তার হাঁকানিতে উদ্বাস্তুদের উতরোল কান্নাকাটি লহমায় মিইয়ে যায়। কেউ কেউ ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করে, 'জারো বাইর হইয়া আইছে। অহন আমাগো কী অইব?'

ধনপত এবার নরম গলায় বলল, 'ডরো মাত। আমরা তো আছি। বারিকে (ব্যারাকে) চলে যাও। আমরা জংলি আদমিদের সামলাব।'

উদ্বাস্তুরা আর দাঁড়ায় না; যে যার ব্যারাকে ঢুকে পড়ে। কিন্তু ত্রাস তাদের যতটা, কৌতূহল তার চেয়ে লেশমাত্র কম নয়। ব্যারাকে ঢুকলেও দরজা সামান্য ফাঁক করে অনেকে রুদ্ধশ্বাসে সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। সশস্ত্র জারোয়ারা সেটলমেন্ট পর্যন্ত এসে পড়বে কি না তাই নিয়ে তাদের প্রচণ্ড শঙ্কা।

ওদিকে অদৃশ্য পেরিমিটার রোড থেকে বনভূমি, আকাশ, পাহাড় খান খান করে যেন ড্রামের আওয়াজ আরও আরও প্রবল হয়ে উঠছে। আন্দাজ করা যাচ্ছে জারোয়ারা নিশ্চয়ই গভীর অরণ্যে তাদের বাসস্থানে ফিরে যায়নি।

বিশ্বজিৎ থেকে চেইনম্যান ধনপত, ক'জন বুশ পুলিশ থেকে পরিতোষ, নিরঞ্জন, বিভাস এবং পুনর্বাসন দপ্তরের সব কর্মী সেটলমেন্টের ফাঁকা এলাকাটার ওধারে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে আছে। পলকহীন। প্রায় দমবন্ধ করে নিঃশব্দে।

আচমকা চোখে পড়ল সাফ করা জায়গার ওধারের জঙ্গল থেকে আবছা ছায়ামূর্তির মতো একদল আধা উলঙ্গ কালো মানুষ বেরিয়ে এল। আফ্রিকার নিগ্রোয়েডদের মতো কালো কালো চেহারা, পাঁচ ফিটের মতো হাইট, হাতে তির-ধনুক এবং অন্য সব আদিম অস্ত্র।

অনেকগুলো মশাল জ্বলছিল ঠিকই কিন্তু তার আলো অতদূর অবধি পৌঁছায়নি। তবু কুয়াশা থেকে চুঁইয়ে আসা ঝাপসা আলোয় তাদের মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই জারোয়া।

এর আগে কখনও জারোয়া দেখেনি বিনয়। তাদের কথা শুনেছে মাত্র। সামনাসামনি তাদের আসতে দেখে বুকের ভেতর ঠান্ডা শিহরন খেলে যায় তার।

জারোয়াদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার। দক্ষিণ আন্দামানের এই অঞ্চলে উড়ে আসা আগন্তুকদের তাড়াবার জন্য তারা মাঝরাতে হানা দিয়েছে।

বিশ্বজিৎ সকলকে সতর্ক করে দিলেন, 'খুব সাবধান। জারোয়ারা যেন এখানে আসতে না পারে।'

একজন বুশ পুলিশ বলল, 'জরুর জংলি লোগোকো রুখ দুঙ্গা—'

সেই শিখ পুলিশটি বলল, 'সাহাব, আপকো হুকুম হো যায় তো, ফায়ার করে দিই। দো-চার জংলি মর যায়গা, ব্যস কাম ফতে। ও হারামিরা আর কভি ইঁহা আনেকো ভরসা নেহি পায়েগা। ফায়ার করু?'

বুশ পুলিশটি গুলি বন্দুক ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না। এদিকে সরকার থেকে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ভারতবর্ষের পাহাড়বাসী জনজাতি, আদিবাসী, কারও গায়ে একটি আঁচড় কাটা চলবে না। নিজস্ব পরিবেশে তাদের নিজের মতো করে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কত ধরনের মানুষ রয়েছে এই সুবিপুল ভূখণ্ডে। তাদের যেভাবেই হোক সংরক্ষণ করতে হবে। এই সব ছোট বড় অসংখ্য জনগোষ্ঠী নিয়েই তো দেশ। অন্য সবার মতো তাদেরও বেঁচে থাকার অধিকার আছে। এরা শেষ হয়ে গেলে বহুবর্ণময় বহুভাষাভাষী ভারতবর্ষের জনজীবন তার সুবিশাল মহিমা হারিয়ে ফেলবে। যে যেভাবে আছে সে সেইভাবেই থাকুক, এই হল সরকারের ঘোষিত নীতি। পূর্ব পাকিস্তানের আগন্তুকদের জন্য বনবাসী জারোয়ারা উৎখাত হয়ে যাক—এটা কোনওভাবেই কাম্য নয়। সম্পূর্ণ বেআইনিও।

বিশ্বজিৎ আঁতকে উঠলেন, 'না না, ওদের গায়ে গুলি চালানো চলবে না।

শিখ জিগ্যেস করল, 'তাহলে জংলিদের রুখব কী করে?'

একটু চিন্তা করে বিশ্বজিৎ বললেন, 'আকাশের দিকে বন্দুক তুলে তোমরা কয়েকবার ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার কর। মনে হয় ফাঁকা আওয়াজে কাজ হবে।'

শুধু শিখটিই নয়, যে ক'জন বুশ পুলিশ নয়া সেটলমেন্ট অবধি চলে এসেছিল তারা সবাই মাথার ওপর বন্দুক উঁচিয়ে পর পর ফায়ার করতে লাগল।

লহমায় ম্যাজিকের মতো কাজ হল। জেফ্রি পয়েন্টের আকাশ এবং বনভূমির নিরেট স্তব্ধতাকে চৌচির করে মুহুর্মুহু যে শব্দ হতে জঙ্গলের আদিম বাসিন্দারা ভীষণ ভয় পেয়ে যায়, খুব সম্ভব অরণ্যের গোপন অন্তঃপুরে থাকলেও বন্দুকের মহিমা তারা জানে।

কালো কালো ঝাপসা যে মূর্তিগুলো দেখা গিয়েছিল, লহমায় জঙ্গলের ভেতর তারা উধাও হয়ে যায়। এক ফোঁটা রক্তপাত হল না, কিন্তু কৌশলে কাজ হাসিল হয়ে গেল।

বুশ পুলিশের দলটা জানতে চাইল পেরিমিটার রোডের টঙে তারা ফিরে যাবে কি না।

বিশ্বজিৎ বললেন, 'আরও কিছুক্ষণ থাকো। জারোয়ারা ভীষণ একরোখা। তেমনি হিংস্র। খুব সহজে এখানে সেলটমেন্ট বসাতে দেবে না। বার বার এসে তারা হামলা চালাতে চাইবে।'

আরও ঘন্টাখানেক স্নায়ু টান টান করে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন বিশ্বজিৎরা। তারপর সবাইকে হুঁশিয়ার থাকতে বলে বুশ পুলিশের দলটাকে পেরিমিটার রোডে পাঠিয়ে বিভাস, নিরঞ্জন, পরিতোষ, ধনপত এবং পুনর্বাসন বিভাগের কর্মীদের জিগ্যেস করেন, 'তোমাদের এখানে ক্যানেস্তারা আছে?'

পরিতোষ জেফ্রি পয়েন্টের কলোনাইজেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট বা সি এ। বিভাস নিরঞ্জনরা আট-দশ দিনের বেশি এখানে থাকবে না। তাদের পোর্ট ব্লেয়ারে ফিরে যেতে হবে। কিছুদিন পর ফের তারা উদ্বাস্তু আনতে কলকাতায় যাবে। মুখের কথা খসালেই তো মেনল্যান্ড থেকে উদ্বাস্তু আনা যায় না। তার জন্য অনেক তোড়জোড় করতে হয়। জেফ্রি পয়েন্টের সব ঝক্কি সামলাতে হবে পরিতোষকে। অবশ্য তার সঙ্গে ধনপতের মতো জবরদস্ত একজন কর্মী ছাড়াও রিহ্যাবিলিটেশনের আরও অনেকেই রয়েছে। তবু জারোয়াদের জন্য দুশ্চিন্তাটা থেকেই যাচ্ছে বিশ্বজিতের।

পরিতোষ বলল, 'না স্যার—'

'যত তাড়াতাড়ি পার, ইনডেন্ট করে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে কুড়ি-পঁচিশটা ক্যানেস্তারা আনিয়ে নিও। জারোয়ারা এদিকে আসুক বা না-আসুক, সন্ধের পর থেকে কয়েক বার ক্যানেস্তারাগুলো পিটিয়ে আওয়াজ করবে। ওদিকে বুশ পুলিশ

banglabooks.in

আর তাদের ড্রাম তো রয়েছেই। বেশি আওয়াজ হলে জারোয়ারা সহজে এদিকে ঘেঁষবে না।'

পরিতোষ ঘাড় কাত করে জানায়, বিশ্বজিৎ যা বলেছেন অবিলম্বে তা করা হবে।

'যাও, এবার গিয়ে শুয়ে পড়। আশা করি, আজ রাত্তিরে আর কোনও উৎপাত হবে না।'

সবাই যে যার আস্তানায় চলে গেল। বিশ্বজিৎ বিনয়কে নিয়ে তাঁর ঘরের দিকে যেতে যেতে লক্ষ করলেন, উদ্বাস্তুরা কেউ তাদের লম্বা লম্বা ব্যারাকে শুয়ে পড়েনি। বন্ধ দরজার তলা দিয়ে আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। তার মানে ভেতরে লণ্ঠন জ্বলছে।

অনেকের চাপা গলার স্বর ব্যারাকগুলোতে শোনা যাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে জারোয়াদের এই অতর্কিত হামলাটা তাদের হতচকিত এবং সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। নির্ঘাত তাই নিয়ে তাদের কথাবার্তা চলছে। বাকি রাতটা নিশ্চয়ই ওরা ঘুমবে না। ভয়ে, উত্তেজনায় কাটিয়ে দেবে।

উদ্বাস্তুদের কথাবার্তা শোনার ভীষণ আগ্রহ ছিল বিনয়ের। কিন্তু সে সুযোগ পাওয়া গেল না। বিশ্বজিৎ তাকে দাঁড়াতে দিলেন না। সোজা নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন, 'শুয়ে পড়ুন। ভোর হতে দু-আড়াই ঘণ্টার বেশি সময় নেই। ঘুমন। নইলে শরীর খারাপ হবে।'

বিনয় শুয়ে পড়ল ঠিকই। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না। একটা প্রবল দুর্ভাবনা তার মাথায় চেপে বসেছে যেন।

এই যে ছিন্নমূল মানুষের দলটা কাল 'এস এস মহারাজা' জাহাজে আন্দামানে এখানে এসে পৌঁছেছে, সেটা পুরোপুরি স্বেচ্ছায় নয়। অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল তাদের মনে। তা ছাড়া রাজনৈতিক দলগুলো মিছিলে স্লোগানে অবিরল চিৎকার করে গেছে, উদ্বাস্তুরা যেন আন্দামানে না আসে, পশ্চিমবঙ্গেই পুনর্বাসনের দাবিতে অনড় থাকে।

সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের রিহ্যাবিলিটেশন দপ্তর এবং পশ্চিমবাংলার ত্রাণ বিভাগের অফিসাররা অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে তাদের অনেকটা নরম করেছিলেন। জানিয়েছিলেন উদ্বাস্তুদের জন্য বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপপুঞ্জে সোনায় মোড়া ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। পূর্ব পাকিস্তানে তারা যা ফেলে এসেছে তার বিশগুণ পাওয়া যাবে এখানে এলে।

এই বোঝানোর কাজটা বিনয়ও কম করেনি। সেও উদ্বাস্তুদের প্রচুর ভরসা দিয়েছিল। তাই এদের, বিশেষ করে কাল যারা এসেছে তাদের সম্বন্ধে কিছু দায় তারও রয়েছে। অন্তত সেটাই সে মনে করে।

'রস' আইল্যান্ড থেকে লঞ্চে পোর্ট ব্লেয়ারে আসার সময় হলধর সূত্রধর, মাখন রুদ্রপালরা ত্রস্তভাবে তাকে জারোয়াদের কথা বলেছিল। বিনয় তাদের অনবরত সাহস জুগিয়ে গেছে। জারোয়ারা তাদের মতো জঙ্গলে থাকে। হয়তো নতুন লোক দেখলে ছুটকো-ছাটকা ঝঞ্ঝাটও বাধাতে চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশ আছে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের লোকেরা আছে। যত হিংস্রই হোক, জঙ্গলের অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে এসে জারোয়ারা তাদের লেশমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না।

কিন্তু আসলে কী দাঁড়াল? আজ বিকেলে উদ্বাস্তুরা জেফ্রি পয়েন্টে সেটলমেন্ট বানাতে এসেছে, আর আজই মধ্যরাতে কিনা জারোয়ারা হানা দিয়ে বসল।

ত্রাণ শিবিরে বা শিয়ালদা স্টেশনের চত্বরে দিনের পর দিন কাটিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের উচ্ছেদ হয়ে আসা মানুষগুলোর জীবনশক্তি ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হয়ে এসেছে; মনোবল গিয়ে ঠেকেছে তলানিতে। আর প্রথম দিনই সশস্ত্র, তিরন্দাজ জারোয়াদের হামলায় তারা নিশ্চয়ই দিশেহারা হয়ে পড়েছে। জেফ্রি পয়েন্টে এমন একটা অভ্যর্থনার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। ভয়ে, আতঙ্কে তারা একেবারে বিধ্বস্ত।

ধনপত এই মানুষগুলোকে ধমকে ধামকে ব্যারাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু আজকের রাতটা কাটলে তারা কী করে বসবে, সেই চিন্তাটা কাঁটার মতো বিঁধে বিনয়ের মাথায় বিঁধে রইল।

অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎ খেয়াল হল পাহাড়, জঙ্গল, উপত্যকা, সব নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। বুশ পুলিশের ড্রামগুলো এখন আর বাজছে না। কোথাও কোনও শব্দ নেই। তার মানে জারোয়ারা দুর্গম বনভূমিতে তাদের বাসস্থানে ফিরে গেছে।

আর ঠিক এই সময় দু'চোখ জুড়ে আসতে লাগল বিনয়ের।

॥ তিন ॥

বহু মানুষের হইচই আর উতরোল কান্নার আওয়াজে আচমকা ঘুমটা ভেঙে গেল বিনয়ের। প্রথমটা সে বুঝে উঠতে পারল না, কোথায় আছে। মাথাটা সামান্য তুলতেই চোখে পড়ল, সারা ঘর ঝকঝকে রোদে ভরে গেছে। শিয়রের দিকে জানালার বাইরে লাইন দিয়ে পাহাড়ের সারি, আর নিবিড় জঙ্গল। এখন জোরালো হাওয়া বইছে, কাছাকাছি কোথাও সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

চকিতে সমস্ত মনে পড়ে গেল বিনয়ের। ধড়মড় করে উঠে বসে সে। নিজের অজান্তেই তার নজর চলে যায় পাশের খাটটার দিকে। বিছানা খালি। বিশ্বজিৎ কখন উঠে বাইরে বেরিয়ে গেছেন, টের পাওয়া যায়নি। খুব সম্ভব বিনয় ঘুমচ্ছে দেখে তাকে আর ডাকেননি।

ক্ষিপ্র হাতে মশারি সরিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ল বিনয়। ঘরের বাইরে যেতেই দেখতে পেল কাল যে উদ্বাস্তুরা এখানে এসেছিল—বুড়ো-থুড়ো, বাচ্চা-কাচ্চা, যুবক-যুবতী, আধবয়সি নারী-পুরুষ—তাঁরা সবাই ব্যারাকগুলোর সামনের ফাঁকা জায়গাটায় উন্মাদের মতো কেঁদে চলেছে আর একসঙ্গে জড়ানো জড়ানো গলায় কী সব বলে চলেছে। এদেরই কান্না আর হইচইতে তার চোখ থেকে ঘুম ছুটে গিয়েছিল। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন বিশ্বজিৎ, নিরঞ্জন, বিভাস, ধনপত এবং পুনর্বাসন দপ্তরের কর্মীরা। তারা হাত নেড়ে নেড়ে অবিরল উদ্বাস্তুদের কী বুঝিয়ে চলেছেন।

ছিন্নমূল মানুষগুলোর তুমুল কান্নাকাটি আর প্রচণ্ড অস্থিরতার কারণটা মোটামুটি আন্দাজ করে নিল বিনয়। পায়ে পায়ে সে জটলাটার কাছে চলে এল। চমকে উঠে লক্ষ্য করল উদ্বাস্তুরা যে যার মালপত্র—টিনের বাক্স, বিছানা এবং টুকিটাকি নানা মালপত্র বাঁধাছাঁদা করে ব্যারাক থেকে বার করে এনে বাইরে জড়ো করেছে।

সবাই মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সমানে বলে চলেছে, 'আমরা এই জঙ্গলে থাকুম না।'

'কিছুতেই থাকুম না।'

'এহানে থাকলে জারোর হাতে হগলটির (সকলের) মরণ।'

'আমরা ঠিক কইরা ফালাইছি, কইলকাতায় ফিরা যামু। আন্ধারমানে থাকুম না।'

নানা বয়সের পুরুষেরা সমানে শোরগোল করছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাঁদছে বাচ্চা-কাচ্চার দল আর মেয়েরা।

বিনয়ের ধারণা, কাল রাত্তিরে ধনপতের হাঁকডাকে উদ্বাস্তুরা ব্যারাকে ঢুকে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু চুপচাপ শুয়ে পড়েনি। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আন্দামানের এই মৃত্যুপুরীতে তারা আর এক লহমাও থাকবে না।

কাল রাতের মতো ধমক-ধামক দিয়ে চুপ করিয়ে দিতে চাইছিল ধনপত কিন্তু বিশ্বজিৎ ধীর, স্থির, অভিজ্ঞ তো বটেই, অত্যন্ত বুদ্ধিমান অফিসার। তিনি জানেন যারা মরিয়া হয়ে উঠেছে, লটবহর গুছিয়ে নিয়ে যারা চলে যাবার জন্য প্রস্তুত, হুঙ্কার ছেড়ে তাদের দমিয়ে রাখা যাবে না। সব সময় একই স্ট্র্যাটেজিতে কাজ হয় না। নানা সমস্যা সামলাতে নানা কৌশল দরকার।

বিশ্বজিতের ধৈর্যের সীমা পরিসীমা নেই। তিনি ধনপতকে টুঁ শব্দটি করতে না দিয়ে সমানে বুঝিয়ে চলেছেন। জারোয়ারা

banglabooks.in

হঠাৎই কাল সেটলমেন্টে চলে এসেছিল। আর যাতে এদিকে না আসতে পারে তার জন্য আরও জোরদার বন্দোবস্ত করা হবে। বুশ পুলিশের সংখ্যা চার-পাঁচগুণ বাড়িয়ে দেবেন। তা ছাড়া পুনর্বাসন দপ্তরের কর্মীরা দিনের বেলায় তো বটেই, পালা করে রাত জেগে জেগে দূরের জঙ্গলের দিকে নজর রাখবে। উদ্বাস্তুদের নিরাপত্তায় লেশমাত্র ত্রুটি রাখা হবে না।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। বিশ্বজিতের এত ঢালাও প্রতিশ্রুতি উদ্বাস্তুদের এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাদের চিৎকার, চেঁচামেচি এবং কান্নার মাত্রাটা ক্রমশ বেড়েই চলেছে, বেড়েই চলেছে।

বিশ্বজিতের সহিষ্ণুতার শেষ নেই। তিনি জিগ্যেস করেন, 'আপনারা তো এখানে থাকতে চাইছেন না। কী করতে চান তাহলে?'

ছিন্নমূল মানুষগুলোর ভেতর থেকে মাখন রুদ্রপাল সামনে এগিয়ে আসে। হাতজোড় করে বলে, 'আমরা কইলকাতায় ফিরা যামু।'

বিশ্বজিৎ বলেন, 'ফিরে তো যাবেন কিন্তু বলামাত্রই এখান থেকে ফেরা যায় না।'

'ক্যান যাইব না?' কাল বিকেলে যে সব ট্রাক চেপে উদ্বাস্তুরা এখানে এসেছিল সেটলমেন্ট এলাকা থেকে একটু দূরে একটা টিলার মাথায় চেটালো মতো জায়গায় লাইন দিয়ে সেগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে মাখন রুদ্রপাল বলল, 'উই তো গাড়িগুলান খাড়ইয়া রইছে। উইগুলানে চাপাইয়া আমাগো পুট বিলাসে (পোর্ট ব্লেয়ারে) লইয়া যান। হেইহান থিকা কইলকাতার জাহাজে উঠাইয়া দিবেন।'

বিশ্বজিৎ বুঝিয়ে বললেন, সরকারি পুনর্বাসন দপ্তরের নথিতে উদ্বাস্তুদের নাম পাকাপাকিভাবে তুলে আন্দামানে পাঠানো হয়েছে। তাদের জন্য এখানে জমির ব্যবস্থাও করা হয়ে গেছে। নথি থেকে নাম খারিজ করিয়ে এদের কলকাতায় ফেরত পাঠানো সহজ নয়। প্রক্রিয়াটি কার্যকর হতে অনেক সময় লাগবে। কমপক্ষে পাঁচ-ছ'মাস। একবার নাম কাটানোর আর্জি জানালে সরকার মাখন রুদ্রপালদের কোনওরকম দায়িত্ব নেবে না। তারা খাবে কী? থাকবে কোথায়? সরকারি দপ্তরের ব্যবস্থায় উদ্বাস্তুরা এখানে আসতে পেরেছিল। তারাই তাদের আদরযত্ন করে আন্দামানে নিয়ে এসেছিল। ফিরে যেতে হলে নিজেদের পয়সায় জাহাজের টিকেট কাটতে হবে। তত পয়সা কি মাখনদের আছে?

আরও একটা সমস্যা, কলকাতা থেকে জাহাজ এলে সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে যায় না। একটানা দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর 'এস এস মহারাজা' তিন সপ্তাহ এখানে নোঙর ফেলে থাকে। তারপর ফেরার প্রশ্ন। এই তিনটে সপ্তাহ উদ্বাস্তুদের চলবে কী করে?

মাখন ভীষণ দমে যায়। কী উত্তর দেবে ভেবে পায় না।

তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল ঢ্যাঙা, ক্ষয়াটে চেহারার আধ বুড়ো একটা লোক। তার নাম লক্ষ্মণ দাস। আদি বাড়ি ছিল পালং থানার তাহেরপুর গ্রামে। সে বলল, 'সার (স্যার) অন্য কারোরে বুজি (বুঝি) না, আপনেই আমাগো কাছে সরকার। গরমেনের (গভর্নমেন্টের) কাগজে আমাগো নাম-নুম যা আছে আপনেই কাইটা দ্যান।'

বিশ্বজিৎ হয়তো একটু আমোদ বোধ করেন। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলেন, 'অত ক্ষমতা আমার নেই।'

'আচে, আচে, হেয়া আমরা জানি।'

বিশ্বজিৎ যে ওদের কাছে ঈশ্বরের মতো সর্বশক্তিমান, সেটা বোঝাই যাচ্ছে। হাজারবার অস্বীকার করলেও এই ধারণাটা পালটাবে না। বৃথা চেষ্টা না করে তিনি বললেন, 'নাম না হয় কাটা গেল। তারপর?'

লক্ষ্মণ দাস বলল, 'জাহাজের টিকিট কাটতে তো শুনছি মেলা (অনেক) ট্যাহা লাগে। অত ট্যাহা আমাগো নাই। তয়—'

'তবে কী?'

'অল্প-স্বল্প কিচু পহা (পয়সা) আছে। তিন হপ্তা হইল একইশ দিন। অতদিন পর পর কইলকাতার জাহাজ ছাড়ে। অত সোমায় (সময়) এহানে থাকন যাইব না। আপনে দয়া কইরা ফেরনের ব্যবোস্তা কইরা দ্যান।'

বিশ্বজিৎ হতভম্বের মতো কয়েক লহমা তাকিয়ে থাকেন। তারপর জিগ্যেস করেন, 'আমি কী ব্যবস্থা করব?'

'আমাগো খান চাল্লিশেক নাও ঠিক কইরা দ্যান। যাগো নাও হেরা (তারা) দুইজন কইরা পিতিটি (প্রতিটি) নাওয়ে যাইব। কইলকাতায় পৌঁছাইলে হেরা তাগো নাও লইয়া আন্ধারমানে ফিরা আইব।'

লক্ষ্মণ দাস এক নিশ্বাসে বলে যেতে লাগল, 'নাও আমরাই বাইয়া লইয়া যামু। নাওয়ের মালিকগো কিছুই করণ লাগব না। হেরা খালি বইয়া থাকব।'

বলে কী লোকটা? স্তম্ভিত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে খানিকটা সময় লাগল বিশ্বজিতের। তারপর তিনি বললেন, 'আপনারা নৌকোয় করে সমুদ্র পাড়ি দিতে চান!'

লক্ষ্মণ দাস বলে, 'হ। আমরা পদ্মা-ম্যাঘনার দ্যাশের মানুষ। দশ-বারো বচ্ছর বস (বয়স) থিকা আলিসান আলিসান গাঙ পাড়ি দিয়া এত বড়ডা হইচি। পারুম না ক্যান?'

এতক্ষণ বিশ্বজিতের পাশে দাঁড়িয়ে হতবাক শুনে যাচ্ছিল বিনয়। এবার মুখ খুলল সে, 'আপনাদের মাথাগুলোই খারাপ হয়ে গেছে। পদ্মা-মেঘনা আর সমুদ্র এক হল?'

লক্ষ্মণের গা ঘেঁষে আরও অনেকেই রয়েছে। তাদের একজন হল রসময় শীল। যথেষ্ট বয়স হয়েছে। ষাটের ওপরে। সে বলে, 'সমুন্দুর আর কত বড়ডা হইব? পদ্মা-ম্যাঘনা-ধলেশ্বরী থিকা দুই গুণ কি তিন গুণ হইব। হের বেশি না। আমরা ঠিকই পাড়ি দিয়া চইলা যাইতে পারুম। আপনেরা খালি নাও জুটাইয়া দ্যান।'

নিরঞ্জন, বিভাস এবং পুনর্বাসন দপ্তরের কর্মীরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল। নিরঞ্জন বলে উঠল, 'পোলাপানের লাখান (মতো) কথা কইয়েন না দাস মশয়।' যে উদ্বাস্তুরা জেফ্রি পয়েন্টে এসেছে তাদের সবাইকে সে তো চেনেই, তাদের নামও জানে। বলতে লাগল, 'পদ্মা-ম্যাঘনা-কালাবদর-ধলেশ্বরী-আইডল খাঁ, এমুন হাজার হাজার নদী এক লগে করলেও সমুদ্রের এক কোনার সমানও হইব না। হেয়া (তা) ছাড়া আন্দামানে আহনের সোমায় ঝড়তুফানের মুখে পড়ছিলেন, মনে নাই? তিন মাইল চাইর মাইল জুইড়া একেকখান ঢেউ আকাশ তরি (পর্যন্ত) উইঠা যায়। অত বড় 'মহারাজা' জাহাজখানরে মোচার খোলার লাখান (মতো) নাচাইয়া ছাড়ছিল। তাইলে (তাহলে) ছোট ছোট নাওয়ের (নৌকোর) কী হাল হইব ভাইবা দ্যাখছেন? ঝড়তুফান লাগব না, এমনেই সমুদ্রে যে ঢেউ থাকে, আন্দামান থিকা পাচশো হাত দূরেও যাইতে হইব না, হেই ঢেউ নাওগুলারে আছাড় মাইরা ডুবাইয়া দিব। এই সমুদ্রে লাখে লাখে হাঙ্গর ঘুরতে আছে। সিধা এতগুলান মানুষ তাগো ফলার হইয়া যাইবেন।' একটু থেমে কী খেয়াল হওয়ায় ফের বলে, 'আরে আসল কথাখানই তো মাথায় আছিল না। আন্দামানে নাও পাইবেন কই?'

লক্ষ্মণ অবাক বিস্ময়ে জিগ্যেস করে, 'ক্যান, এই হানে নাও নাই?'

'না। সমুদ্রে নাও ভাসাইয়া ঘুরাফিরার কথা উন্মাদেও ভাবে না। এহানে হুদা (শুধু) লঞ্চ, স্টিমার, মোটর বোট কি জাহাজ। দাস মশয়, আপনেরা নাওয়ে কইরা কইলকাতায় ফিরনের চিন্তা ছাড়েন। পাগলেও এমুনডা ভাবে না।'

লক্ষ্মণ দাস যখন নৌকোয় সমুদ্র পাড়ি দেবার কথা বলছিল সেই সময় বাচ্চাগুলো এবং মেয়েমানুষদের কান্নাকাটি থেমে গিয়েছিল। ক্ষয়া ক্ষয়া উদ্বাস্তু পুরুষগুলোও শোরগোল করছিল না। আশায় আশায় সবাই বিশ্বজিৎদের কাছে এসে জড়ো হয়েছিল। যখন জানা গেল নৌকো পাওয়া যাবে না, কলকাতায় ফিরে যাবার ভাবনাটা নেহাতই দুরাশা, তারা একেবারে মুষড়ে পড়ে।

banglabooks.in

মাখন রুদ্রপালের কণ্ঠমণিটা ঘন ঘন ওঠানামা করছিল। সে ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করে, 'তাইলে কি এই জঙ্গলে জারোগো (জারোয়াদের) হাতেই আমাগো মরণ লিখা আছে?' বলে বিনয়ের দিকে তাকায় সে। —'আপনে কী ক'ন ছুটোবাবু?'

এতক্ষণ সামান্য দু-একটা কথা বলা ছাড়া প্রায় নীরবেই থেকেছে বিনয়। সরকারি আমলা এবং কর্মীরা যখন উদ্বাস্তুদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করছে সেখানে তার মতো একজনের মুখ খোলা ঠিক নয়। কিন্তু হলধর, মাখনের মতো উদ্বাস্তুরা, যাদের সঙ্গে সে কাল আন্দামানে এসেছে তার ওপর ওদের অনেক আশা-ভরসা। মাখন রুদ্রপাল যখন তাকেই সরাসরি প্রশ্নটা করেছে তখন তার জবাব দেওয়াটা খুবই জরুরি।

বিনয় যা বলল, তা এইরকম। রাজাকার, মুসলিম লিগ আর পশ্চিমা মুসলমানদের অবিরল উৎপাতে আতঙ্কগ্রস্ত মাখনরা চোদ্দো পুরুষের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হবার পর কলকাতায় চলে আসে। প্রথমে শিয়ালদা স্টেশনে, পরে ত্রাণ শিবিরের দমবন্ধ-করা নরককুণ্ডে ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছিল। আশাহীন, ভবিষ্যৎহীন, অদ্ভুত এক জীবন। বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়ার মধ্যে লেশমাত্র তফাত ছিল না।

হঠাৎ আন্দামানে একটা সুযোগ এসে গেছে। এখানে পরিবার পিছু সাত একর করে জমি মিলবে। যতদিন না জমি থেকে ফসল উঠছে সরকার থেকে ক্যাশ ডোল পাওয়া যাবে। এখানে স্কুল বসবে, স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে উঠবে। পূর্ব পাকিস্তানে যা যা হারিয়ে এসেছে মাখন হলধররা, এখানে তার পুরোটা না হলেও অনেকটাই পাওয়া যাবে। কলকাতায় পচে গলে বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে মরে যাওয়ার চেয়ে সেটা কি কাম্য নয়? যে চরম ক্ষতি তাদের হয়ে গেছে তার অনেকটাই বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপপুঞ্জে পূরণ হয়ে যাবে।

তা ছাড়া, আরও একটা বিরাট সমস্যাও রয়েছে। ধরা যাক আন্দামানে পুনর্বাসনের তালিকা থেকে নাম কাটিয়ে পরের জাহাজে কি তার পরের জাহাজে জেদ ধরে হলধররা চলে গেল। যদিও সেই আশা নেই বললেই হয়। কেননা জাহাজের টিকিট কাটার পয়সা তাদের নেই। তবু কোনও রকমে চলে গেল। কিন্তু সেখানে গিয়ে থাকবে কোথায়? যে রিলিফ ক্যাম্পগুলো থেকে তারা চলে এসেছে সেসব কি এখনও ফাঁকা পড়ে আছে? পূর্ব পাকিস্তান থেকে তো বটেই, আসাম থেকেও তাড়া খেয়ে হাজারে হাজারে ছিন্নমূল মানুষ চলে আসছে কলকাতায়। হলধরদের রিলিফ ক্যাম্পগুলো এতদিনে বোঝাই হয়ে গেছে। জারোয়াদের হামলার ভয়ে তারা যদি চলে যায় তাদের এদিকও যাবে, ওদিকও যাবে। সরকারি কর্তারা মিথ্যে স্তোক দেননি; জারোয়ারা যাতে তাদের গায়ে আঁচড় কাটতে না পারে, তার ব্যবস্থা তো হয়েই যাচ্ছে। আতঙ্কের কোনও কারণ নেই।

উত্তেজনায় ত্রাসে কিছুক্ষণ আগেও উদ্‌ভ্রান্তের মতো কাঁদছিল উদ্বাস্তুরা, চিৎকার করছিল। এখন একেবারে চুপ হয়ে গেছে। প্রথমে বিশ্বজিৎ, তারপর নিরঞ্জন, তারও পর বিনয় একে একে সবাই যেভাবে সমস্ত পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে দিয়েছে তাতে নতুন করে তারা ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছে। সত্যিই তো, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে যখন তারা এসেই পড়েছে এখন আর এখান থেকে বেরুবার উপায় নেই। নৌকোয় কালাপানি পাড়ি দেবার চিন্তা নেহাতই পাগলামি। তা ছাড়া নৌকোই মিলবে না। সরকার টিকিট না কাটলে জাহাজেই উঠতে দেবে না। পয়সাই নেই যে টিকিট কাটতে পারবে। ডাঙা নয় যে লটবহর মাথায় চাপিয়ে বউ-ছেলেমেয়ের হাত ধরে হেঁটে হেঁটে কলকাতায় ফিরে যাবে।

মাখন রুদ্রপাল বলল, 'আপনেগো হগল কথা হোনলাম (শুনলাম)। যা যা কইলেন হেগুলান (সেগুলো) উড়াইয়া দেওন যায় না। জবর সোমস্যাই। তভু—'

দ্বিধা এবং ত্রাস যে এখনও পুরোপুরি মাখনরা কাটিয়ে উঠতে পারেনি সেটা আন্দাজ করা যাচ্ছে। তবে আগের সেই জেদ আর নেই, অনেকটাই নরম হয়েছে তারা। এখান থেকে ফিরে যাবার যে প্রচুর সমস্যা, ফিরে গেলে যে সমস্যা শতগুণ বেড়ে যাবে সেসব তাদের মাথায় ঢুকতে শুরু করেছে।

বিনয় উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই বিশ্বজিৎ জিগ্যেস করলেন, 'তবু কী?'

মাখন বলল, 'আমরা নিজেগো মইদ্যে ইট্টু পরামশ্য কইরা লই সায়েব। হগলে কী কয় শুইনা আপনেগো কাছে আমাগো মত জানাইয়া দিতে আছি।'

'তাই জানান—'

মাখন হলধর এবং আরও কয়েকজন বয়স্ক উদ্বাস্তুকে সঙ্গে করে খানিক দূরে ডালপালাওলা বিশাল একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে গিয়ে বসল। প্রায় ঘণ্টাখানেক নিজেদের মধ্যে আলোচনা চলল। তারপর ফিরে এল।

বিশ্বজিৎরা সবাই ঠায় দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা যেন ঠিকই করে ফেলেছেন যে সংকট দেখা দিয়েছে সেটার সুরাহা না হওয়া অবধি এক পাও নড়বেন না।

মাখন বলল, 'আমরা ডাইবা দ্যাখলাম, কালাপানি ছাইড়া যখন যাইতেই পারুম না তহন আর কী করণ? এহানেই থাইকা যামু। আমাগো বলভরসা আপনেরাই। যেয়াতে (যাতে) বাইচা থাকতে পারি হেইটা দেইখেন সারেরা।'

গভীর সহানুভূতির সুরে বিশ্বজিৎ বললেন, 'আমরা সব সময় আপনাদের পাশে আছি। থাকবও।'

সেই সকাল থেকে যে তুমুল বিপত্তি শুরু হয়েছিল, আপাতত তার অবসান। একটানা কয়েক ঘণ্টা টান টান উত্তেজনার পর অনেকটাই স্বস্তি। বিশ্বজিৎরা বেশ আরামই বোধ করলেন।

সূর্য মাথার ওপর উঠে এসেছিল। এই দ্বীপপুঞ্জে রোদ, বাতাস সবই অপর্যাপ্ত। এবং প্রবলও। দূরে সমুদ্রের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। নোনা জলের উত্তাল ঢেউয়ের মাথা থেকে তেজি রোদ ছুরির ফলার মতো ঠিকরে ঠিকরে উঠে আসছে। তাকালে চোখ ঝলসে যায়।

কলোনাইজেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট পরিতোষ পায়ে পায়ে বিশ্বজিতের কাছে এসে দাঁড়ায়। নিচু গলায় বলে, 'স্যার, একহান কথা জিগাই—'

জারোয়াদের নিয়ে যে ঝঞ্ঝাটটা তৈরি হয়েছিল সেটা থেকে মুক্ত হয়ে বেশ হালকা লাগছিল বিশ্বজিতের। লঘু সুরে বললেন, 'জিগাও—'

'সকালের খাওনেরটা (খাবারটা) ভোরেই বানান (তৈরি) অইয়া গেছিল। জারোয়াগো তাফালে কারোরই খাওয়া হয় নাই। অহন কী করা?'

উদ্বাস্তুরা, পুনর্বাসন দপ্তরের কর্মী এবং অফিসাররা, কারও পেটে যে এত বেলা অবধি এক ফোঁটা জলও পড়েনি, সেটা খেয়াল ছিল না বিশ্বজিতের। তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। —'তাই তো।' তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পৌনে একটা বাজে। এখন আর সকালের খাবার দিয়ে কী হবে? দুপুরের জন্য রান্নাবান্নার কিছু ব্যবস্থা হয়েছে? না কি তোমরা এখানেই সেই সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছ?'

'না স্যার, আমি রান্ধনের লোকজনরে পাঠাইয়া দিচ্ছি। মাঝে মইদ্যে গিয়া দেইখাও আইছি। আর আধা ঘণ্টার ভিত্‌রে পাক (রান্না) শ্যাষ হইয়া যাইব।'

পরিতোষকে খুব একটা কাজের মানুষ বলে মনে করতেন না বিশ্বজিৎ। তার কর্মকুশলতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা তেমন উঁচু ছিল না। সেটা এখন অনেকটাই বদলে গেল। নাঃ, এত ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও সে আসল কাজটা ভোলেনি। বিশ্বজিৎ খুশি হলেন। বললেন, 'ঠিক আছে।' তারপর বিভাস নিরঞ্জনদের দিকে তাকালেন। —'তোমরা রিফিউজিদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সমুদ্র থেকে স্নান করিয়ে আনো। দেখো, কেউ যেন বেশি দূরে চলে না যায়, বিচের কাছাকাছিই স্নানটা সারে।' আসলে পাড়ের

banglabooks.in

কাছে বেশ খানিকটা এলাকা জুড়ে জল খুব বেশি হলে কোমরসমান। তারপর থেকে সমুদ্র গভীর হতে শুরু করেছে। সেখানে হাঙরের দঙ্গল হন্যে হয়ে ঘুরছে। রিফিউজিদের নাগালে পেলে ছিঁড়ে খাবে। তাই বিশ্বজিতের এই হুঁশিয়ারি।

নিরঞ্জন বলল, 'আমার খেয়াল আছে। কাইলও রিফিউজিগো দূরে যাইতে দেই নাই। কিনারের কাছে লামাইয়া (নামিয়ে) ছান (স্নান) করাইয়া আনছি।' বলে বিভাস এবং অন্য কয়েকজন কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে উদ্বাস্তুরা যেখানে জটলা করছিল সেখানে গিয়ে তাড়া লাগায়। —'গামছা গুমছা লইয়া হগলটি (সকলে) সমুন্দুরে চলেন। পাক (রান্না) হইয়া গ্যাছে।'

এদিকে বিশ্বজিৎ বিনয়কে সঙ্গে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন, 'হইচই শুনে সেই ভোরবেলা রিফিউজিদের কাছে চলে এসেছিলাম। মুখটুখ ধোওয়া হয়নি। এতক্ষণ প্রচণ্ড এক্সাইটমেন্টের মধ্যে ছিলাম। খিদেতেষ্টা কিছুই টের পাইনি। এখন মনে হচ্ছে পেটে হুতাশন জ্বলছে। চলুন, ব্রাশ-ট্রাশ করে স্নান সেরে খেয়ে নিই।'

বিনয়ও টের পাচ্ছিল, খিদেটা তার পেটের ভেতর অনবরত ছুঁচ ফুটিয়ে চলেছে। সে হাসল। পরক্ষণে কী মনে পড়তে ব্যগ্রভাবে বলে ওঠে, 'আসল কাজটাই কিন্তু আজ করা হল না।'

আগ্রহের সুরে বিশ্বজিৎ জিগ্যেস করলেন, 'কী বলুন তো?'

'আজ থেকে রিফিউজিদের জমি মেপে বিলি করার কথা ছিল না?'

'ছিল তো। কিন্তু কাল রাত্তির থেকে যে হুজ্জুত গেছে তাতে আজ জমি বিলির প্রক্রিয়াটা শুরু করা একেবারেই সম্ভব ছিল না। ইন ফ্যাক্ট ব্যাপারটা আমাদের মাথাতেই আসেনি। আজকের বাকি দিনটা আর রাত্তিরটা যদি ভালোয় ভালোয় কাটে, কাল থেকে জমি দেওয়া হবে।'

একটু চুপচাপ।

তারপর বিশ্বজিৎ বললেন, 'ভেবেছিলাম, আজ পিসফুলি যদি জমি ডিস্ট্রিবিউশনটা আরম্ভ করা যেত, কাল সকালে পোর্ট ব্লেয়ারে ফিরতে পারতাম। কিন্তু সেটা আর হবে বলে মনে হচ্ছে না। আরও দু-একদিন এখানে থেকে যেতে হবে। ওদিকে পোর্ট ব্লেয়ারে অনেক কেস পেন্ডিং রয়েছে। আমি না গেলে সেগুলোর হিয়ারিং বা জাজমেন্ট সব বন্ধ থাকবে। কিন্তু কী আর করা। এখানকার ব্যাপারটা ভীষণ আর্জেন্ট। এটাকে টপ প্রায়োরিটি দিতে হবে।'

বিশ্বজিৎ রাহা যে শুধু আন্দামানের রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টের সর্বেসর্বাই নন, এখানকার একজন ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটও সেটা বিনয় ভালো করেই জানে। বিশ্বজিৎ এই জেফ্রি পয়েন্টের সেটলমেন্টে আরও ক'টা দিন থাকবেন, তাঁর সঙ্গ পাওয়া যাবে, এতে খুশিই হল বিনয়। সে উত্তর দিল না।

বিশ্বজিৎ একটু ভেবে এবার বললেন, 'আমার একটা অনুরোধ আছে।'

মুখ ফিরিয়ে তাঁর দিকে তাকাল বিনয়। —'বলুন—'

'জারোয়ারা যে কাল রিফিউজিদের ওপর হামলা করতে এসেছিল, কাইন্ডলি আপনার রিপোর্টে এটা লিখবেন না। বুঝতেই পারছেন যে রিফিউজিরা মেন ল্যান্ডে রয়েছে, এই আইল্যান্ডে তারা আসতে চায় না। পলিটিক্যাল পার্টিগুলো তাদের সমানে উসকে চলেছে। জারোয়াদের খবরটা বেরলে একটা রিফিউজিকেও আন্দামানের জাহাজে তোলা যাবে না। পার্টিগুলো এই নিয়ে সারা ওয়েস্ট বেঙ্গল, বিশেষ করে কলকাতা তোলপাড় করে ফেলবে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে বিনয়। তারপর দ্বিধার সুরে বলে, 'কিন্তু—'

তার দ্বিধা বা অস্বস্তির কারণটা আন্দাজ করতে পারছিলেন বিশ্বজিৎ। বললেন, 'একজন অনেস্ট সাংবাদিক হিসেবে যা ঘটেছে সেটা পাঠককে আপনার জানানো দরকার। কিন্তু—'

বিনয় উদ্‌গ্রীব তাকিয়ে থাকে। কোনও প্রশ্ন করে না।

বিশ্বজিৎ বললেন, 'আন্দামানের সঙ্গে বাঙালি উদ্বাস্তুদের স্বার্থ জড়িয়ে আছে। কাইন্ডলি এমন কিছু লিখবেন না যাতে এই আইল্যান্ডগুলো তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। এখানকার জমি খুবই ফার্টাইল। প্রত্যেকটা ফ্যামিলি সাত একর করে জমি পাবে। সেটা কি সহজ ব্যাপার!'

বিনয় এবারও কিছু বলে না। নীরবে শুনতে থাকে।

বিশ্বজিৎ থামেননি। —'ওয়েস্ট বেঙ্গলে সরকারি রিলিফ ক্যাম্পগুলোতে যারা রয়েছে তাদের প্রতি মাসে কিছু কিছু ক্যাশডোল দেওয়া হয়। ক্যাশডোল তো এক রকম ভিক্ষেই। ভিক্ষের ওপর এত মানুষ সারা জীবন বেঁচে থাকতে পারে? সেটা কি অ্যাট অল সম্মানজনক? তা ছাড়া সারা জীবন তো ডোল পাওয়া যাবে না। একদিন না একদিন গভর্নমেন্ট তা বন্ধ করে দেবে! রিলিফ ক্যাম্পগুলোতে চিরকাল থাকতেও দেবে না। তখন কী হবে এদের? কী ভবিষ্যৎ তাঁদের ছেলেমেয়েদের? তাই বলছিলাম আন্দামানে রিফিউজিদের আসা যাতে বন্ধ না হয় সেটা দেখা দরকার। মানে—'

বিনয় জিগ্যেস করল, 'মানে?'

'একটা সম্পূর্ণ নতুন, অচেনা জায়গায় সেটেলমেন্ট গড়ে তোলার কাজ চলছে। ছোটখাট কিছু প্রবলেম তো দেখা দেবেই। বড় স্বার্থের জন্যে সেসব নিয়ে বেশি হইচই না করাই ভালো। ইগনোর করতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়।'

বিনয় জানে, বিশ্বজিৎ মনেপ্রাণে চান আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ

banglabooks.in

বাঙালিদের দ্বিতীয় স্বদেশ হয়ে উঠুক। সীমান্তের ওপারে অবারিত নীলাকাশ, শত জলধারায় বহমান অজস্র নদী, সোনালি শস্যে ভরা আদিগন্ত ধানের খেত, ফুল পাখি বৃক্ষলতা ইত্যাদি মিলিয়ে স্বপ্নের মতো যে মায়াবী ভূখণ্ডটি ফেলে তাদের চলে আসতে হয়েছে, বঙ্গোপসাগরের মাঝখানে ঠিক তেমনটিই তারা নিজেদের হাতে সৃষ্টি করুক। এখানকার সেটলমেন্টগুলোর সঙ্গে গভীর আবেগে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন।

বিশ্বজিৎকে যত দেখছে ততই মুগ্ধ হচ্ছে বিনয়, ততই তার শ্রদ্ধা বেড়ে চলেছে। ইচ্ছা করলে তিনি হিল্লি-দিল্লি কলকাতা বা মুম্বইতে পোস্টিং নিতে পারতেন। বিশাল বিশাল মেট্রোপলিসের অঢেল আরাম বা স্বাচ্ছন্দ্যের কথা তিনি ভাবেননি। সর্বস্ব খুইয়ে আসা ছিন্নমূল মানুষগুলোর জন্য এই সৃষ্টিছাড়া দ্বীপপুঞ্জে পড়ে আছেন।

বিনয় গভীর গলায় বলল, 'জারোয়ারা মাঝরাতে হানা দিয়েছিল ঠিকই কিন্তু কারও তো কোনও ক্ষতি হয়নি। সবাই বেঁচে আছে। আমার রিপোর্টে এই ঘটনাটা সম্বন্ধে একটা লাইনও লিখব না।'

বিশ্বজিতের মুখটা আলো হয়ে উঠল। তিনি সম্পূর্ণ দুশ্চিন্তামুক্ত। আন্দামানে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় কোনও রকম বাধা হলে সেটা যেন তাঁর নিজস্ব পরাজয়।

এক সময় দু'জনে তাদের ঘরে চলে এল।

॥ চার ॥

পরশু মাঝ রাতে উত্তর দিকের গভীর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে নয়া সেটলমেন্টে হানা দিতে এসেছিল। ফলে উদ্বাস্তুদের মধ্যে তুমুল আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। তার ধাক্কা সামলাতে কাল দুপুর পেরিয়ে গেছে। উদ্বাস্তুদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করতে বিশ্বজিৎ বিভাস নিরঞ্জন ধনপত সিং থেকে শুরু করে পুনর্বাসন দপ্তরের কর্মীদের দম বেরিয়ে গিয়েছিল।

কাল রাতটা অবশ্য নির্বিঘ্নেই কেটে গেছে। বুশ পুলিশ আর সেটলমেন্টের কর্মীরা খুবই সতর্ক ছিল। পালা করে তারা রাত জেগেছে। জারোয়ারা আর এদিকে আসেনি।

আজ সকাল হতে না হতেই বিভাস নিরঞ্জনরা হাঁকডাক করে উদ্বাস্তুদের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিল। পশ্চিম দিকের পাহাড়ের ঢাল যেখানে ঝোপঝাড় আর অজস্র বুনো গাছ আর লতায় ঠাসা, তাড়া দিয়ে দিয়ে তাদের সেখানে পাঠিয়েছে। আবরু বাঁচানোর জন্য চারদিক ঘিরে এখানে পায়খানা-টায়খানা তৈরি করে রাখা হয়নি। বুড়ো-ধুড়ো, বাচ্চা-কাচ্চা, জোয়ান ছেলেমেয়ে—প্রতিদিনের প্রাকৃত কর্মটি সারার জন্য ঝোপজঙ্গলের আড়ালে না গিয়ে উপায় নেই কারও। খোলা আকাশের নিচে এই মুক্ত, আদিম শৌচাগারই একমাত্র ভরসা।

জঙ্গল থেকে সমুদ্রে গিয়ে মুখটুখ ধুয়ে উদ্বাস্তুরা ফিরে আসতেই বিভাসরা হেঁকে হেঁকে বলতে লাগল, 'হগলে (সবাই) একহান কইরা থাল গিলাস (থালা গেলাস) লইয়া আহেন।'

আগের দিনই উদ্বাস্তুদের কিছু কিছু বাসনকোসন দেওয়া হয়েছিল। একটু পর দেখা গেল, কথামতো থালা এবং গেলাস নিয়ে বিভাসদের সামনে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

চারদিকের হাঁকাহাঁকিতে বিশ্বজিৎ এবং বিনয়েরও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তাঁরাও তাড়াহুড়ো করে সমুদ্র থেকে মুখটুখ ধুয়ে বিভাসদের কাছে চলে এলেন।

সকালে শুকনো খাবারের ব্যবস্থা। চিঁড়ে, আখের গুড় এবং এক গেলাস করে দুধ। আমেরিকার ক'টা চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ার এভাঙ্গেলিস্টরা পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্য ঢাউস ঢাউস সুদৃশ্য টিনের পাত্র বোঝাই করে পাউডার মিল্ক, চকলেট, চিজ, মাখন ইত্যাদি নিয়মিত কলকাতায় পাঠাচ্ছে। সর্বস্ব হারিয়ে আসা রুক্ষ, আধমরা, ছিন্নমূল মানুষগুলো যাতে অপুষ্টিতে ভুগে ভুগে শেষ না হয়ে যায় সে জন্য সাগরপারের দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর অনন্ত দুর্ভাবনা।

যেসব পুষ্টিকর খাদ্যবস্তু জাহাজ বা প্লেনে কলকাতায় পৌঁছয় তার সামান্য কণিকা আন্দামানের দুর্গম অরণ্যে যেসব সেটলমেন্ট বসছে সেখানেও পাঠানো হয়। তবে শুধুই পাউডার মিল্ক। অন্য সমস্ত বাদ।

গুঁড়ো দুধ গুলে প্রকাণ্ড একটা ড্রাম বোঝাই করে রেখেছিল সেটলমেন্টের কর্মীরা।

প্রতিটি উদ্বাস্তুর থালায় চিঁড়ে, গুঁড় ও গেলাসে দুধ বিলি করা শুরু হয়।

বিশ্বজিৎ আগেই কড়া হুকুমনামা জারি করে রেখেছিলেন, তাঁদের জন্য আলাদা দামি দামি খাবারের ব্যবস্থা যেন না করা হয়। উদ্বাস্তুরা যা খাবে যে দরের মহামান্য অফিসারই হোন, তাঁকেও তাই খেতে হবে।

বিশ্বজিৎ আর বিনয় খালি হাতে চলে এসেছিল। তাদের ঘরে আগে থেকেই থালা গেলাস রাখা ছিল। পরিতোষ দৌড়ে গিয়ে নিয়ে এল। চিঁড়ে-গুঁড়টুড় নিয়ে উদ্বাস্তুদের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে খেতে শুরু করলেন বিশ্বজিৎরা।

খাওয়াদাওয়া চুকতে চুকতে মিনিট চল্লিশেক লেগে গেল। এর মধ্যে বেশ খানিকটা বেলা হয়েছে। সূর্য পুব দিকের পাহাড়ের চূড়োর ওপর উঠে এসেছে। তেজি রোদে ভেসে যাচ্ছে বনজঙ্গল উপত্যকা। এই সকাল বেলাতেই সমুদ্রের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। রোদে নোনা জল থেকে এখনই ঝাঁঝ উঠে আসছে। বেলা যত বাড়বে এই ঝাঁঝ ততো বাড়বে। চোক আরও ধাঁধিয়ে যাবে।সসস

বিশ্বজিৎ পরিতোষ বিভাসদের ডেকে বললেন, 'আর দেরি কোরো না; জমি মেপে ভাগ-বাটোয়ারার বন্দোবস্ত কর।'

বিভাস বলল, 'হ। অহনই কামটা শুরু করুম।'

'একদিনে ক'টা ফ্যামিলিকে জমি দেওয়া সম্ভব?'

'লা-ডিনরে জিগাইয়া কইতে আছি।'

লা-ডিন এই সেটলমেন্টের আমিন। উনিশশো তিরিশে বর্মার মৌলমিন থেকে খুনের দায়ে কালাপানির সাজা নিয়ে আন্দামানে এসেছিল। ভারত স্বাধীন হল, ব্রহ্মদেশ ইন্ডিয়া থেকে আলাদা হয়ে নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা পেল। কিন্তু লা-ডিন আর মৌলমিনে ফিরে যায়নি। আন্দামানেই থেকে গেছে।

এখানে আসার পর প্রথম বছরটা সেলুলার জেলেই কাটাতে হয়েছে লা-ডিনকে। তারপর তাকে জেলের বাইরে পি ডব্লু ডি'তে কাজ দেওয়া হয়। জমি জরিপের খুঁটিনাটি শিখে সে তুখোড় আমিন হয়ে ওঠে। সেই কাজটাই করে যাচ্ছিল। যখন আন্দামানে পূর্ব পাকিস্তান থেকে উৎখাত হওয়া মানুষদের পুনর্বাসনের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া হল সেই সময় তাকে পি ডব্লু ডি থেকে রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টে বদলি করা হয়।

বিভাস লা-ডিনের কাছে চলে গেল। তার সঙ্গে আলোচনা সেরে ফিরে এসে বিশ্বজিৎকে বলল, 'পনরোটা ফ্যামিলিরে জমিন মাইপা দ্যাওন (দেওয়া) যাইতে পারে। এইটাই ম্যাক্সিমাম।'

বিশ্বজিৎ মনে মনে অঙ্ক কষে বললেন, 'তার মানে আড়াইশো ফ্যামিলিকে ল্যান্ড ডিস্ট্রিবিউট করতে সতেরো-আঠারো দিন লেগে যাবে।'

'হেয়া (তা) তো লাগবই। জঙ্গলের মইধ্যে জমি মাইপা (মেপে) সীমানা ঠিক করন তো সোজা কথা না। সোময় তো লাগেই।'

'কিন্তু—'

উৎসুক চোখে বিশ্বজিতের দিকে তাকাল বিভাস। কোনও প্রশ্ন করল না।

বিশ্বজিৎ বললেন, 'আমার পক্ষে এতদিন এই সেটলমেন্টে পড়ে থাকা সম্ভব না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পোর্ট ব্লেয়ারে ফিরে যেতে হবে।'

বিনয় পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সে আগেই শুনেছে, পোর্ট ব্লেয়ারে বিশ্বজিতের কোর্টে অনেক কেস জমে আছে। সেই সব মামলার শুনানি হবে, কম করে ছ-সাতটা রায় দিতে হবে।

বিভাস বলল, 'অতদিন থাকতে হইব না। আপনের সামনে

pathagar.net

banglabooks.in

কামটা খালি আরম্ভ হউক। পরে আমরা অন্য ফেমিলিগুলানরে জমিন বিলি কইরা দিতে পারুম।'

'জমি ডিস্ট্রিবিউশন শেষ হলেই তুমি আর নিরঞ্জন পোর্ট ব্লেয়ার চলে আসবে। সেখানে রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টের অনেক কাজ পড়ে আছে। নতুন নতুন আরও সেটলমেন্ট বসবে। কোথায় কোথায় বসবে, ঘুরে ঘুরে সেইসব জায়গা সম্পর্কে রিপোর্ট তৈরি করতে হবে।'

'হে (সেই) খেয়াল আমার আছে। আপনে চিন্তা কইরেন না।'

'যাও, এবার কাজে লেগে পড়।'

এর মধ্যে পরিতোষ সেটলমেন্টের এক ধারে অ্যাসবেস্টসের ছাউনি দেওয়া যে অফিসঘর রয়েছে সেখান থেকে মোটা বাঁধানো লম্বা একটা খাতা নিয়ে এসেছে। সেটায় উদ্বাস্তু ফ্যামিলিগুলো কাল এখানে এসেছে তাদের নাম, প্রতিটি পরিবারের আলাদা আলাদা বিবরণ লেখা আছে।

ওদিকে ধনপত এবং পুনর্বাসনের কয়েকজন কর্মী মালপত্র রাখার গুদাম থেকে কোদাল, শাবল, করাত এবং লম্বা লম্বা বর্মি দা এবং গোলাকার মস্ত দুটো জার এনে একধারে জড়ো করে রেখেছে। জার বা বয়ম দুটো গাঢ় ধরনের তরল জিনিসে বোঝাই।

উদ্বাস্তুরা সামনের ফাঁকা জায়গাটায় কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বা বসে বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। বিভাস পরিতোষের হাত থেকে খাতাটা নিয়ে গলার স্বর উঁচুতে তুলে উদ্বাস্তুদের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, 'হগলে মন দিয়া আমার কথা শুনেন।'

চিঁড়ে-টিড়ে খাওয়ার পর ছিন্নমূল মানুষগুলোর কেমন একটা এলানো ভাব এসে গিয়েছিল। এবার তারা চনমনে হয়ে ওঠে। যারা বসে ছিল তারা শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

বিভাস থামেনি। বলেই চলেছে, 'কাইল জারোয়াগো লেইগা মেলা (অনেক) তাফাল গ্যাছে। তাই আপনেগো জমিন দেওন যায় নাই। আইজ থিকা বিলি করন শুরু হইব। একদিনে এতগুলান ফেমিলিরে দেওন সোম্ভব না। রোজ পনরোটা ফেমিলিরে জমিন বিলি করন হইব। যারা আইজ জমিন পাইবেন হেয়াগো (তাদের) নাম পড়তে আছি।' হাতের খাতাটা খুলে সে পড়তে লাগল, 'জলধর বারুই, মনা ব্যাপারী, সহদেব রুদ্রপাল.....'

পনেরো জনের নাম পড়া হলে বিভাস বলল, 'প্রতিটি ফেমিলিরে শাবল, কুড়াল, দাও (দা) দেওন হইব। আপনেরা আউগাইয়া (এগিয়ে) আইয়া লইতে থাকেন।'

পনেরোটি পরিবারকে শাবল-টাবল দেওয়া হলে বিভাস ধনপতকে বলল, 'এইবার এয়াগো (এদের) হাতে লোশান দাও—' উদ্বাস্তুদের বলল, 'যারা আমাগো লগে জঙ্গলে জমিন লইতে যাইবেন হেরা (তারা) গায়ে লোশান মাইখা লন (নিন)। মাথাতেও মাখবেন।'

লোশান অর্থাৎ লোশন। সেটা যে কী বস্তু আন্দাজ করতে পারছিল না উদ্বাস্তুরা। জঙ্গলে জমি বুঝে নিতে হলে সেটা গায়ে মাথায় কেনই বা মাখতে হবে কেউ ভেবে পাচ্ছিল না। তারা রীতিমতো অবাকই হয়ে যাচ্ছিল।

উদ্বাস্তুদের মনোভাব কিছুটা আঁচ করে বিভাস বলল, 'ক্যান লোশান মাখতে লাগব, জঙ্গলে গ্যালেই ট্যার পাইবেন। ধনপত তুমি এয়াগো (এদের) হাতে লোশান দাও—'

ধনপত হতবুদ্ধি মানুষগুলোকে তাড়া দিয়ে দিয়ে তার কাছে ডেকে নিল। তারপর সেই মোটা জার থেকে পরপর তাদের দাঁড় করিয়ে হাতে গাঢ় তরল চটচটে জিনিস ঢেলে দিতে লাগল। নির্দেশমতো গায়ে মাথায় সেসব মেখে নিল উদ্বাস্তুরা।

বিনয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। সেও কম অবাক হয়নি। নিচুগলায় বিশ্বজিৎকে জিগ্যেস করল, 'রিফিউজিদের ওই লিকুয়িডটা মাখতে বলা হল কেন?'

বিশ্বজিৎ মৃদু হাসলেন। প্রশ্নের উত্তরটা না দিয়ে বললেন, 'আন্দামানে কীভাবে উদ্বাস্তুদের ল্যান্ড ডিস্ট্রিবিউট করা হয়, নিশ্চয়ই আপনাদের কাগজে তা লিখবেন।'

'হ্যাঁ, তা তো লিখতেই হবে।'

'তা হলে আমাদের সঙ্গে আপনাকেও জঙ্গলে যেতে হবে। আর তখন বুঝতে পারবেন লিকুয়িডটা কেন মাখা জরুরি।'

'আপনিও জঙ্গলে যাবেন নাকি?'

'অবশ্যই।' বিশ্বজিৎ জানালেন, আন্দামানের যেখানে যেখানে রিফিউজি সেটলমেন্ট বসেছে সেসব জায়গায় তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে জমি বিলিবণ্টনের শুরুটা করে দিয়েছেন। এখানেও করবেন।

বিশ্বজিৎ, বিভাস, নিরঞ্জন, লা-ডিন এবং পুনর্বাসনের কর্মীরা লোশন মেখে নিল। দেখাদেখি বিনয়ও মাখল।

যে ফ্যামিলিগুলোকে আজ জমি দেওয়া হবে তাদের হেড অফ দি ফ্যামিলি অর্থাৎ কর্তারা বিভাসের কথায় শাবল এবং বর্মি দা হাতে ঝুলিয়ে নিয়েছে। পুনর্বাসনের কর্মীরা দা-শাবল তো নিয়েছেই, সেইসঙ্গে নিয়েছে লম্বা লম্বা লোহার চেন।

ব্যারাকগুলোর সামনের ফাঁকা জায়গাটায় তিন দিকে—পুবে, পশ্চিমে এবং উত্তরে ঘোর জঙ্গল। এবার সবাই উত্তর দিকে চলল। যাদের জমি দেওয়া হবে তারা তো যাচ্ছেই, বাকি উদ্বাস্তুদের অনেকেই তাদের পিছুপিছু চলেছে। জমি কীভাবে ভাগ-বাঁটোয়ারা করা হবে ওরা স্বচক্ষে তা দেখতে চায়। কৌতূহল, অপার কৌতূহল।

কালই বিনয়ের চোখে পড়েছিল ব্যারাকের পেছন দিকে বিশাল বিশাল গাছ কেটে সেগুলোর গুঁড়ি এবং মোটা মোটা ডাল মস্ত এলাকা জুড়ে ডাঁই করে করে ফেলে রান্না হয়েছে। কাল নজরে পড়েনি, পাহাড়-প্রমাণ গুঁড়িগুলোর পেছন দিকে আট-দশ ফুটের মতো মাপ করে বাঁশ কেটে সেই টুকরোগুলোও টাল দিয়ে সাজানো রয়েছে।

বনবিভাগের কিছু কর্মী বিনয়দের সঙ্গে চলেছে। কিন্তু আরও কুড়ি-পঁচিশজন দশ-পনেরোটা করে বাঁশের খুঁটি দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে মাথায় চাপিয়ে একটু ঘুরপথে উত্তরের জঙ্গলে যাচ্ছে। এদের কারও কারও হাতে রয়েছে নানা মাপের এবং ওজনের করাত। যে করাতগুলো প্রকাণ্ড এবং বেজায় ভারী সেগুলো দু'জনে দু'মাথায় ধরে নিয়ে চলেছে। মাঝারিগুলো তুলনায় অনেক হালকা। এগুলোর জন্য দু'জন দরকার নেই। একজনই হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যেতে পারছে।

বাঁশের খুঁটি বা করাত কোন কাজে লাগবে, আন্দাজ করা যাচ্ছে না। তবে এ ব্যাপারে কোনও কৌতূহল প্রকাশ করল না বিনয়। জঙ্গলে ঢুকলেই তা জানা যাবে।

ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে জঙ্গলে ঢোকার মুখে এসে ঘুরে দাঁড়াল বিভাস। যে উদ্বাস্তুদের আজ জমি দেওয়া হবে না তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনেরা গায়ে লোশান মাইখা আহেন নাই। এহানেই খাড়হয়া খাড়ইয়া আমাগো কাম কাইজ (কাজকর্ম) দ্যাখেন।'

লোকগুলো দাঁড়িয়ে পড়ল। বিনয়রা জঙ্গলে ঢুকে বড় বড় সব গাছ যেগুলোর বেড় তিনশো চারশো ফিটের মতো সেগুলো কাটা হলেও, শিকড়বাকড় এখনও তুলে ফেলা হয়নি। কিন্তু বিরাট মহাবৃক্ষ আর ক'টা? চারিদিকে অগুনতি মাঝারি এবং ছোট ছোট গাছ, ঝোপঝাড়, বনতুলসীর উদ্দাম জঙ্গল। যে গাছগুলো অক্ষত দাঁড়িয়ে আছে সেগুলোকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে মোটা মোটা বেতের লতা।

বড় গাছগুলো কেটে ফেলায় কোথাও কোথাও জঙ্গল ততটা ঘন নয়, তাই আকাশ চোখে পড়ছে। কিন্তু যেখানে হাজার বছরের অরণ্য ডালপালা মেলে চাপ বেঁধে রয়েছে সেইসব এলাকায় আন্দামানের তেজি সূর্যালোকও ঢুকতে পারছে না। সমস্ত কিছু ছায়াচ্ছন্ন, অন্ধকার অন্ধকার। সেখানকার মাটি স্যাঁতসেঁতে, ঠান্ডা, শ্যাওলার পুরু স্তর জমে আছে। অসাবধানে পা ফেললে পিছলে পড়ার সম্ভাবনা।

জঙ্গলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে বাড়িয়া পোকা, মাছি

banglabooks.in

আর মশাদের দঙ্গল কোত্থেকে যেন বেরিয়ে এসে বিনয়দের ছেঁকে ধরল। সরসর আশেপাশে অদৃশ্য সরীসৃপেরা বুকে ভর দিয়ে দূরে চলে যাচ্ছে। মাথার ওপর নাম না-জানা হাজারে হাজারে বুনো পাখি চক্কর দিয়ে কর্কশ গলায় সমানে চেঁচিয়ে চলেছে। ঊর্ধ্বশ্বাসে ক'টা বুনো শুয়োর দৌড়তে দৌড়তে ঝোপঝাড় ভেদ করে আরও দূরে উধাও হয়ে গেল যেখানে জঙ্গল আরও জমাট, আরও দুর্ভেদ্য।

হঠাৎ উটকো কিছু মানুষ এসে পড়ায় এখানকার আদি বাসিন্দা জারোয়ারা খেপে গিয়ে কাল রাতে হানা দিয়েছিল। আজ দেখা যাচ্ছে পোকামাকড় সরীসৃপ পাখি থেকে জন্তুজানোয়ার, সবাই মহাবিরক্ত। উড়ে এসে যারা জুড়ে বসতে চাইছে, ভাগ বসাতে চাইছে তাদের অবিহমানকালের অধিকারে তাদের ওপর ওরা আদৌ খুশি নয়। যতই চেঁচিয়ে-মেচিয়ে, চক্কর মেরে তারা হুলুস্থুল বাঁধাক, যে লক্ষ লক্ষ মানুষ সর্বস্ব খুইয়ে সীমান্তের ওপার থেকে এপারে চলে এসেছে তাদের জন্য উপনিবেশ তো গড়ে তুলতেই হবে।

কয়েক পা এগুতেই গাছের ডাল থেকে থপ করে কী যেন বিনয়দের মাথার ওপর পড়ল। খুব একটা ভারী নয়—নরম, হড়হড়ে, ঠান্ডা।

বিনয় চমকে ওঠে। পরক্ষণে চোখে পড়ে অগুনতি জোঁক তারগা বেয়ে নিচে পড়ে যাচ্ছে। শুধু তারই নয়, অন্য সবারই এক হাল।

লোশনটার মহিমা এতক্ষণে বোঝা গেল। ওটা না মাখলে জোঁকগুলো তাদের গা থেকে রক্ত শুষে নিত। হাত দিয়ে ক'টাকে আর ছাড়ানো যেত!

বিশ্বজিৎ তাকে লক্ষ করছিলেন। চোখাচোখি হতে একটু হাসলেন। তার হাসিটা যেন বুঝিয়ে দিল কেন লোশন মাখতে হয়েছে, এবার টের পেলেন তো।

একটা সামান্য ফাঁকা মতো জায়গায় এসে সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। বিভাস গলার স্বর উঁচুতে তুলে হাঁকল, 'মোহনবাঁশি কর্মকার—'

একটা আধবুড়ো রোগাটে চেহারার লোক— মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, খাড়া খাড়া কাঁচা-পাকা চুল—পরনে ময়লা ফতুয়া আর খাটো ধুতি—সামনে এসে বলল, 'আইজ্ঞা—'

'পরথম আপনেরে জমিন দেওন অইব। বড় গাছগুলান সরকার থিকা কাইটা দেওন অইছে। মাঝারিগুলানও কাইটা দিমু কিন্তুক ছুটো গাছ, ঝোপঝাপ আপনেগো হগল রিফুজিগো সাফ কইরা লইতে অইব।'

মোহনবাঁশি হুঁশিয়ার লোক। সে ঢোক গিলে জিগ্যেস করল, 'বড় গাছগুলান কাটা অইছে ঠিকই কিন্তুক মাটির উপুরে হাতখানেক কইরা রইয়া গ্যাছে; মাটির তলে রইছে শিকড়বাকড়। হেগুলান (সেগুলো) উঠান (ওঠানো) তো আমাগো শক্তিতে কুলাইব না।'

বিভাস বলল, 'বড় গাছের গোড়া আর শিকড় আপনেগো তুলতে অইব না, আমরাই তুইলা দিমু।'

সহদেব রুদ্রপাল এবং জলধর বারুইয়ের বয়স অনেক কম। তিরিশের বেশি হবে না। দেশভাগের পর এপারে এসে শিয়ালদা স্টেশনে কিছুদিন কাটিয়ে তারপর ত্রাণশিবিরে গিয়ে উঠেছিল। তাদের ওপর দিয়ে ঝড়ঝাপটা কম যায়নি কিন্তু শরীরস্বাস্থ্য সেভাবে ভেঙে পড়েনি। মোটামুটি অটুটই আছে। দু'জনেরই শক্তপোক্ত চেহারা।

সহদেব বলল, 'শিকড়বাকড় আপনেরা উঠাইবেন বাকি ঝোপঝাপ আমরা সাফ করুম। জঙ্গলের মুখ থিকা জমিন বাইর করতে যে মেলা (অনেক) সোময় লাইগা যাইব ছার (স্যার)।'

বিভাস বলল, 'হেয়া তো লাগবই।'

সংশয়ের সুরে জলধর বলল, 'জঙ্গলে ভরা জমিন দিয়াই কী কইবেন, এইবার নিজেগো প্যাটের চিন্তা নিজেরা কর।'

তার মনোভাবটা বুঝতে পারছিল বিভাস। হেসে হেসে বলল, 'ভাইবেন না। আন্দামানে আপনেগো শুকাইয়া মারণের লেইগা আনি নাই। যতদিন না চাষবাস কইরা ফসল ফলাইতে পারেন, আপনেগো প্যাটের চিন্তা সরকারের। আমাগো উপুর ভরসা রাখেন।'

দূরের জঙ্গলে লম্বা লম্বা করাত নিয়ে যারা ঢুকেছিল সেখান থেকে একটানা ঘষঘষ আওয়াজ আসছে। বিনয় আন্দাজ করে নিল বড় গাছ কাটা শুরু হয়ে গেছে। মাঝারি মাপের করাত নিয়ে যারা এসেছিল তারা গভীর জঙ্গলে যায়নি। কাছাকাছি যে পাতলা জঙ্গল রয়েছে সেখানকার মাঝারি গাছগুলো কাটছে।

গাছ কাটার কায়দাটা বিচিত্র ধরনের। দু'জন করে লোক গাছে চড়ে ক্ষিপ্র হাতে করাত চালিয়ে প্রথমে ডালগুলো ছেঁটে ফেলছে, তারপর নিচে নেমে এসে কবন্ধ গাছের গুঁড়িগুলো খণ্ড খণ্ড করে টাল দিয়ে রাখছে।

বনভূমির চতুর্দিকে শুধু করাত রাত চালানোর কর্কশ আওয়াজ। জঙ্গলের মাথায় পাখিদের চেঁচামেচি আরও বেড়েছে। বেড়েছে বনচর প্রাণীদের দুদ্দাড় দৌড়ে পালানোর শব্দ। বেড়েছে মশা-মাছি নানা ধরনের পোকা আর পতঙ্গের ওড়াউড়ি।

বিনয়রা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার খানিকটা দূর দিয়ে এক পাল হরিণ বিদ্যুৎ গতিতে বাঁ পাশের পাহাড়ের দিকে চলে গেল।

বিশ্বজিৎ একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ব্যস্ততার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বারোটি ফ্যামিলি আজ পনেরো বিঘে করে মোট একশো আশি বিঘে জমি পাবে। এতটা জমি মাপজোখ করা কি মুখের কথা। তিনি বললেন, 'বেলা বেড়ে গেছে। আর দেরি করো না। এবার আসল কাজ আরম্ভ করে দাও।'

আমিন লা-ডিন, চেনম্যান ধনপত এবং পুনর্বাসন দপ্তরের আরও ক'জন কর্মী মুহূর্তে তৎপর হয়ে ওঠে। প্রথমেই মোহনবাঁশিকে জমি দেওয়া হবে। তাকে সঙ্গে নিয়ে লা-ডিনরা জঙ্গলের ডানদিকে গেল। তাদের সঙ্গে বিভাস বিনয় এবং বিশ্বজিৎও গেলেন। বিভাস জমি মাপার কাজটা যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় তার তদারক করবে। একবার কাজটা শুরু করে দিতে পারলে বাকিটা মসৃণভাবে চলবে। ঠিক হল, জঙ্গলের ডান পাশে জমি পাবে মোহনবাঁশি। কিন্তু নিবিড় কাঁটাঝোপ, ফনফনিয়ে বেড়ে ওঠা ঘণ বনতুলসীর ঝাড়, গাছ, বুক সমান উঁচু ঘাস বনের ভেতর জমি মাপা সহজ নয়। একটা দল সমানে ধারালো চালিয়ে ঝোপঝাড় কেটে সাত আট ফিটের মতো জায়গা সাফ করছে; সেখান দিয়ে লোহার লম্বা চেন পেতে জমি মাপার কাজ চলল।

লা-ডিন আর ধনপত হাঁকডাক করে বলল, 'খুঁটি বসাতে বসাতে চল— তুরন্ত—'

বনবিভাগের যে কর্মীরা বাঁশের সমান মাপের টুকরোগুলো নিয়ে এসেছিল, শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ে দশ হাত পর পর খুঁটি পুঁততে লাগল। এই খুঁটি অবধিই মোহন বাঁশির জমির সীমানা। চৌকোনা পনেরো বিঘে জমি খুঁটি দিয়ে ঘিরতে সময় লাগল ঘণ্টা দেড়েক।

মোহনবাঁশির পর সহদেবের পালা। মোহনবাঁশির জমির চারপাশে যেসব খুঁটি বসানো হয়েছে সেগুলোর পর চার ফিটের মতো বাদ দিয়ে একই প্রক্রিয়ায় জমি মেপে সহদেবকে দেওয়া হল।

কিন্তু পোকামাকড়, হরিণ, শুয়োর, তক্ষকই নয়, মাঝে মাঝে থোকায় থোকায় ঝোপঝাপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে বাদামি রঙের চেলা বিছেরা। লম্বায় এক বিগধ এক ফুটের মতো, চওড়ায় ইঞ্চিখানেক।

হোঁশিয়ার-হোঁশিয়ার। কানখাজুরা (চেলা বিছে) বহোত জহরিলা। সাপের চেয়েও খতারনাক। কামড়ালে জান চলে যাবে।'

মোহনবাঁশি সহদেবরা দৌড়ে বিশ হাত দূরে চলে যায়। তাদের মুখ আতঙ্কে সাদা হয়ে গেছে। তারা চিৎকার করতে

banglabooks.in

আমাগো আন্ধারমানে আইনা যমের মুখে ফেইকা (ছুড়ে) দিছে। একদিকে জারো (জারোয়া), একদিকে কানখাজুরা, সমুন্দুরে হাঙ্গর। আমাগো নিঘঘাত মরণ।

বিভাস হুংকার ছাড়ে।— 'চুপ। এক্কেরে চুপ। পদ্মা ম্যাঘনার দ্যাশ থিকা আইছেন। সেই হগল জাগায় (জায়গায়) সাপ বাঘ কুমৈর (কুমির) আছিল না? বেবটাকে (সবাই) বাঘ আর কুমিরের প্যাটে গ্যাছেন? নিকি সাপের ছোবল মইরা ঝইরা গ্যাছেন?'

বিভাসের তর্জন-গর্জনে মোহনবাঁশিদের চেঁচামেচি থেমে যায়। তারা চুপচাপ দূরে দাঁড়িয়ে থাকে।

বিনয় আগে লক্ষ করেনি। এবার দেখতে পেল, যারা বাঁশের খুঁটি, শাবল, কুড়ুল এবং করাতটরাত নিয়ে এসেছিল তারা কয়েকটা বড় বড় পেটমোটা বোতলও সঙ্গে করে এনেছে। বোতলগুলো পেট্রোলে বোঝাই।

কানখাজুরা বা চেলা বিছেগুলো দলা পাকিয়ে কিলবিল করছে। ধনপত চকিতে একটা বোতল থেকে বিষাক্ত সরীসৃপগুলোর গায়ে পেট্রোল ছিটিয়ে দিয়ে দেশলাইয়ের কাঠি ধরিয়ে তাদের দিকে ছুড়ে দেয়। চোখের পলকে দাউদাউ আগুনে পুড়ে বিছেগুলো দলা পাকিয়ে যায়।

বিভাস মোহনবাঁশিদের দিকে ফিরে বলল, 'এইবার ডর কাটছে তো? আমরা আপনেগো পাশে আছি। কানখাজুরা জারোয়া কেও আপনেগো কিছু করতে পারব না। আহেন আহেন, আবার জমিন মাপামাপি শুরু হইব। নিজেগো চৌখে দেইখা হগল (সব) বুইঝা লন (নিন)।'

মোহনবাঁশিদের সাহস অনেকখানি ফিরে আসে। হয়তো ভাবে কাল রাতে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বুশ পুলিশ এবং ধনপতরা জারোয়াদের ঠেকিয়েছে, আজ কানখাজুরা মারল। এসবই তো তাদের নিরাপত্তার জন্য। পায়ে পায়ে উদ্বাস্তুরা ফিরে আসে।

যে এলাকা দিয়ে জমি মাপামাপির জন্য লম্বা লোহার চেন বসানো হবে সেখানকার ঝোপঝাড় কেটে আবার নতুন উদ্যমে কাজ শুরু হয়ে যায়। তবে পুরোপুরি নির্বিঘ্নে নয়। কতকাল ধরে যে কানখাজুরা আর জোঁকেরা জঙ্গলের ভেতর চিরস্থায়ী আস্তানা গেড়ে আছে। দশ পা এগতে না এগতেই গাছের ডালপালা থেকে থোকায় থোকায় জোঁক মাথায় এসে পড়ছে। সারা গায়ে এবং মাথায় লোশন লাগানো রয়েছে তাই বাঁচোয়া। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো গা-মাথা থেকে খসে পড়ছে। ঝোপজঙ্গলে দা কিংবা কোদালের কোপ পড়লেই বুড় বুড় করে বেরিয়ে আসছে কানখাজুরা এবং অন্য সব বুনো সরীসৃপের দঙ্গল। পেট্রোল দিয়ে তাদের পোড়াতে পোড়াতে জমি মাপা এবং খুঁটি পোঁতা চলতে লাগল। মোহনবাঁশির পরিবারের জন্য পনেরো বিঘে জমি মেপে তার চরপাশে খুঁটি পুঁতে পুঁতে সীমানা ঠিক করে দিয়ে, তারপর সহদেবের পরিবারের জন্য জমি দেওয়া হল। এইভাবে সূর্য যখন পশ্চিম দিকে ঢলতে শুরু করেছে তার মধ্যে পাঁচটি ফ্যামিলিকে জমি বিলি করা সম্ভব হল।

সেই সকালবেলায় চিঁড়ে গুড় খেয়ে জঙ্গলে ঢুকেছিল সবাই। খিদেয় এখন পেট জ্বলে যাচ্ছে। মুখে কেউ খিদের কথা না বললেও সেটা বোঝা যাচ্ছিল। বিশ্বজিৎ বললেন, 'এ বেলার মতো কাজ বন্ধ থাক। খেয়েদেয়ে এসে আবার করা যাবে।'

বিভাস হেঁকে হেঁকে সবাইকে বলল, 'অহন কেম্পে ফিরা চলেন।'

স্নান এবং খাওয়াদাওয়া চুকিয়ে যখন সবাই আবার জঙ্গলে ঢুকল, সূর্য আরও খানিকটা হেলে গেছে।

বিশ্বজিৎ বললেন, 'ও বেলা মাত্র পাঁচটা ফ্যামিলিকে জমি দেওয়া হয়েছে। এভাবে কাজ হলে এতগুলো ফ্যামিলিকে জমি দিতে অনেক সময় লেগে যাবে। যে উদ্বাস্তুরা এখানে এসে পৌঁছেছে এক উইকের ভেতর তাদের ল্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কমপ্লিট করতেই হবে। মাসখানেক বাদে আবার একশো ফ্যামিলি মেনল্যান্ড থেকে এসে পড়বে। এখন প্রচুর কাজ।'

ঠিক করা ছিল, আজ বারোটি ফ্যামিলিকে জমি দেওয়া হবে কিন্তু উত্তর দিকে ঝোপ-ঝাড় অনেক বেশি ঘন। সেসব সাফ করে আর মাত্র চারটি ফ্যামিলিকে জমি দেওয়া সম্ভব হল।

আজ সব মিলিয়ে ন'টা উদ্বাস্তু ফ্যামিলি জমি পেল।

সূর্য পশ্চিমদিকের পাহাড়ের পেছনে অনেকখানি নেমে গেছে। সেটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। পাহাড় আর বিশাল বিশাল মহাবৃক্ষগুলির ছায়া নেমে এসেছে উপত্যকায়। সেই ছায়া এমনই ঘন যে সন্ধে হবার আগেই চারিদিক দ্রুত অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। অন্ধকার ভেদ করে সহজে নজর চলে না।

বিভাস হেঁকে বলল, 'আইজকার মতো কাম বন্ধ। কাইল ভুরের (ভোরের) আলো ফুটলেই আবার জমিন দেওন শুরু হইব। চলেন কেম্পে যাই—'

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সবাই ব্যারাকগুলোর দিকে এগিয়ে যায়।

বিনয় আর বিশ্বজিৎ বিরাট দলটার একেবারে পেছনে ছিলেন। সারাটা দিন জঙ্গলের পুরু শ্যাওলায় ঢাকা, স্যাঁতসেঁতে, পিছল, উৎকট সোঁদা গন্ধে-ভরা জমি, নানা ধরনের পোকামাকড়, জোঁক আর কানখাজুরার মধ্যে কাটিয়ে ভীষণ ক্লান্তি বোধ করছিলেন দু'জনে।

পশ্চিমদিকের পাহাড় এবং বনজঙ্গল গাঢ় ছায়ায় ঢেকে গেলেও পুবদিকের পাহাড়ে বেলাশেষের একটু আলো এখনও আলগাভাবে লেগে রয়েছে। দক্ষিণ প্রান্তে পাহাড়-টাহাড় নেই; একেবারে খোলা। সেখানে অফুরান বঙ্গোপসাগর। যদিও নিভু-নিভু, তবু সমুদ্রের ঢেউগুলোর মাথায় মাথায় প্রচুর আলো দোল খাচ্ছে।

চলতে চলতে হঠাৎ পুবের পাহাড়ের দিকে নজর চলে যায় বিনয়ের। এক দঙ্গল হাতিকে প্যাঁচানো পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নামিয়ে নিয়ে আসছে ক'টা লোক। খুব সম্ভব তারা মাহুত। হাতিদের পেছনে দুটো বিরাট ট্রাক। ট্রাক বা হাতি, কারও কোনও তাড়া নেই। তারা ধীর চালে এধারের ঢাল দিয়ে নেমে আসছে।

অবাক বিনয় দাঁড়িয়ে পড়েছিল। জেফ্রি পয়েন্টে হাতির পাল আর পেল্লায় পেল্লায় ট্রাক নিয়ে কেন লোকগুলো আসছে, বোঝা যাচ্ছে না।

বিশ্বজিৎও কম অবাক হননি। হাতিটাতি এসে হাজির হবে, খুব সম্ভব জানতেন না। তাই তিনি দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

উদ্বাস্তুদের নিয়ে বিভাসরা বেশ খানিক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। হাতি দেখে তারাও থমকে গেছে।

কয়েক মিনিটের ভেতর ক'টা বিপুল আকারের প্রাণী, দু'টো ট্রাক আর বেশ কিছু মানুষ নিচের উপত্যকায় নেমে এল।

বিশ্বজিতের সঙ্গে বিনয়ও সেদিকে এগিয়ে গেল। ওদিকে হাতি দেখে বিভাসরা শুধু নয়, যে উদ্বাস্তুরা ক্যাম্পে ছিল তারাও ছুটে এসেছে। বাচ্চাকাচ্চা, যুবকযুবতী, বুড়োধুড়ো—কেউ বাকি নেই। সবার চোখে অপার কৌতূহল।

বিনয় গুনে গুনে দেখল সবসুদ্ধ পাঁচটি হাতি। মাহুতরা পায়ে মোটা শিকল লাগিয়ে গাছের গুঁড়িতে সেগুলোকে বেঁধে ফেলল। কাল যে ছোট লরিগুলোতে চেপে উদ্বাস্তুরা এসেছিল সেগুলো কাতার দিয়ে ক্যাম্প থেকে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে। দুই ট্রাকের ড্রাইভার লরিগুলোর পেছনে তাদের গাড়ি দাঁড় করিয়ে নেমে পড়ল। ট্রাকে আরও কয়েকজন রয়েছে। মাহুতসুদ্ধ তারা সবাই বিশ্বজিতের কাছে দৌড়ে এল। এদের মধ্যে নানা জাতের মানুষ রয়েছে—বর্মি, শিখ, সাঁওতাল, তামিল ইত্যাদি। সবার বয়স পঞ্চাশের ওপারে। বিনয় আন্দাজ করে নিল এরা একদিন বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপপুঞ্জে কালাপানির সাজা খাটতে এসেছিল। এখন মুক্তি পেয়ে তারা স্বাধীন ভারতের সরকারি কর্মচারী।

সবাই এসে সসম্ভ্রমে কপালে হাত ঠেকিয়ে বিশ্বজিৎকে বলে, 'সেলাম হুজৌর—'

banglabooks.in

বিশ্বজিৎ ওদের না চিনলেও, ওরা বিশ্বজিৎকে খুব ভালো চেনে। মোটামুটি একটা আন্দাজ করে নিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ কর?'

সবার হয়ে একটা হট্টাকাট্টা চেহারার, চাড়া-দেওয়া গোঁফওয়ালা লোক, নিশ্চয়ই পুরো দলটার চালক বা সর্দার, বলল, 'হাঁ, হুজৌর।' লোকটা খুবই বিনয়ী, নম্র; গলার স্বর নরম। কে বলবে সে একদিন দুর্ধর্ষ দাগি আসামি হয়ে এখানে এসেছিল।

'তোমাদের এখানে কে পাঠিয়েছে?'

'তিরুরের ফরিস্টার (ফরেস্টার) সাহাব।'

তিরুর অঞ্চলের ফরেস্ট অফিসারকে ভালোই চেনেন বিশ্বজিৎ। বললেন, 'মণ্ডল সাহেব পাঠিয়েছেন?'

'হ্যাঁ সাহেব। এখান থেকে গাছের মোটা মোটা বল্লা নিয়ে যেতে হবে। উসি লিয়ে—'

'তোমার নাম কী?'

'আজীব সিং।'

'ঠিক আছে। কবে থেকে কাজ শুরু করবে?'

'কাল সুবেসে।'

একটু ভেবে বিশ্বজিৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের খানাদানার কী বন্দোবস্ত? এখানকার রিফিউজিদের সঙ্গে খাবে?'

আজীব সিং বলল, 'জি, নেহি।' সে জানায়, নিজেদের রসদ চাল ডাল আটা তেল ঘি রশুন পেঁয়াজ মরিচ মশলা আর এক বস্তা আলু সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। হাতিগুলোর জন্যও খাবার আনা হয়েছে। বস্তা বস্তা ছোলা, কলাগাছ, কলার কাঁদি এবং অন্যান্য বুনো ফল। রসদ ফুরিয়ে গেলে আবার তারা ট্রাক পাঠিয়ে আনিয়ে নেবে। শুধু তা-ই নয়, তাদের থাকার ব্যবস্থাও নিজেরাই করবে। রসদের সঙ্গে অনেকগুলো তাঁবুও এসেছে। সেটেলমেন্টের একধারে সেগুলো খাটিয়ে নিলেই হবে।

'ঠিক আছে। তোমরা অনেকদূর থেকে আসছ। এবার কিছুক্ষণ আরাম করে তাঁবুটাবু বসিয়ে নাও।' বিশ্বজিৎ আর দাঁড়ালেন না। বিনয়কে সঙ্গে করে তাঁর ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

বিনয়ের মাথায় বল্লা শব্দটা ঘুরছিল। কথাটার মানে সে জানে না। জিজ্ঞেস করল, 'বল্লা কী?'

বিশ্বজিৎ বুঝিয়ে দিলেন যে, বড় বড় গাছ কাটার পর বিশাল আকারের গুঁড়ি এবং মোটা মোটা ডাল চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে সেগুলো হল বল্লা।

'হাতি ওগুলো কীভাবে সরাবে?'

'কাল থেকেই দেখতে পাবেন।' বিশ্বজিৎ বললেন, 'আমাদের এখানে ক্রেন নেই। হাতিরাই ক্রেনের কাজ করবে।'

বিনয় আর কোনও প্রশ্ন করল না।

ওদিকে উদ্বাস্তুরা কিন্তু হাতিগুলোর সঙ্গ ছাড়েনি। খুব সম্ভব একসঙ্গে এত হাতি আগে আর কখনও দেখেনি। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে তারা পাহাড়প্রমাণ প্রাণীগুলোকে লক্ষ করছিল।

হাতিরা উঁচুনিচু পাহাড় ডিঙিয়ে এতটা পথ হেঁটে আসার ধকলে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। তারা বসে পড়েছে। কিন্তু জঙ্গলে নিশ্চিন্তে জিরোবার কি উপায় আছে? মশা আর বাড়িয়া পোকার ঝাঁক তাদের ছেঁকে ধরেছে। অবিরাম শুঁড়ের ঝাপটা মারতে মারতে তারা মশাটশা তাড়িয়ে চলেছে।

বিশ্বজিৎ আজীব সিংদের কিছুক্ষণ আরাম করে নিতে বলেছিলেন। কিন্তু এখন তাদের বসে বসে জিরোবার সময় নয়।

ওদের একজন হাতিগুলোর চারপাশে মশা এবং পোকা মারার ধূপ জ্বালিয়ে দিল। দু'জন পাঁচটা কাঠের বিরাট গামলা বোঝাই করে ছোলা, কলা, কলাগাছ ইত্যাদি হাতিদের সামনে এনে রাখল। হাতিপিছু একটা করে গামলা।

পোকা আর মশামারা ধূপ জ্বালাতে অনেক পোকামাকড় লহমায় মরে গেল। বাকি সবাই মহা বিপদের গন্ধ পেয়ে জঙ্গলের দিকে উধাও। হাতিদের খিদে পেয়েছিল জবর। তারা এখন অপার স্বস্তিতে খাওয়া শুরু করল।

আজীব সিংয়ের বাহিনীর অন্য লোকগুলো বসে নেই। তারা ট্রাক থেকে তাঁবুটাবু নামিয়ে মাটিতে খুঁটি পুঁতে পর পর সেগুলো খাটিয়ে ফেলতে থাকে। কয়েকজন অন্য লটবহর নামিয়ে আনে। তাঁবুগুলোর একধারে একজন মাটি খুঁড়ে উনুন বানিয়ে ফেলে। দু'জন জঙ্গলে গিয়ে শুকনো কাঠকুটো জোগাড় করে নিয়ে আসে। শুকনো কাঠই এখানে জ্বালানি।

উদ্বাস্তুদের মধ্যে যারা যুবকযুবতী বা আরও বয়স্ক হাতি দেখার সঙ্গে সঙ্গে আজীব সিংদের কার্যকলাপ খুব মন দিয়ে লক্ষ করছিল। কিন্তু বাচ্চাগুলো এতক্ষণ চুপচাপ থাকার পর হাতিগুলোকে ঘিরে চক্কর দিতে দিতে তুমুল হইচই বাধিয়ে দেয়।

আজীব সিং দু'হাত তুলে নাড়তে নাড়তে বলে, 'বচ্চেলোগ, চিল্লামিল্লি মত করো। হাঁথি গুসা করেগা তো বহুৎ খতরা হো যায়েগা।'

সবাই মোটামুটি আন্দাজে বুঝল, এত চেঁচামেচিতে হাতিদের মেজাজ বিগড়ে যাবে। এই বিশাল প্রাণীগুলো একবার খেপে গেলে রক্ষা নেই; মহা সর্বনাশ ঘটবে।

উদ্বাস্তুদের মধ্যে যারা বয়স্ক, বিপদের গুরুত্বটা তারা বুঝতে পারছিল। তারা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বাচ্চাকাচ্চাদের ঠান্ডা করে, 'এই পোলাপানেরা চিল্লাইস না, চিল্লাইস না। হাতি চেতলে (খেপে গেলে) শুঁড়ে প্যাচাইয়া (পেঁচিয়ে) আছাড় মাইরা শ্যাষ করব।'

বাচ্চাদের হল্লা থেমে যায়।

বিনয়কে নিয়ে বিশ্বজিৎ তাঁর ঘরে ফিরে এলেন। বাইরে দিনশেষের ফ্যাকাশে আলো থাকলেও ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। তবে পুনর্বাসন বিভাগের কোনও কর্মী লণ্ঠন জ্বালিয়ে তার তেজ কমিয়ে রেখে গিয়েছিল। চাবি ঘুরিয়ে সেটার শিখা বাড়িয়ে দিলেন বিশ্বজিৎ। উজ্জ্বল আলোয় ঘর ভরে গেল।

বিশ্বজিৎ এবার জুতো খুলে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলেন। বললেন, 'হোল ডে জঙ্গলে ভীষণ ধকল গেছে। একটু রেস্ট নিয়ে নিন।'

বিনয়ের হাত-পা যেন আলগা আলগা হয়ে আসছিল। সেও হুড়মুড় করে শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর বিশ্বজিৎ বললেন, 'কাল তো আমাকে পোর্টব্লেয়ার চলে যেতে হচ্ছে।' মাসখানেক বাদে আবার একশো উদ্বাস্তু ফ্যামিলি আসবে। তার বন্দোবস্ত করতে হবে। নিরঞ্জন আর বিভাসকে দু খেপ কলকাতায় রিফিউজি আনতে পাঠিয়েছিলাম। এবার অন্য লোক যাবে। বিভাসদের পোর্টব্লেয়ারে রিহ্যাবিলিটেশন অফিসে প্রচুর কাজ জমে আছে। সেসব ওদের শেষ করতে হবে। সেগুলো আমাকে চেক করে দিল্লিতে পাঠাতে হবে। তাছাড়া আমার কোর্টে অনেকগুলো কেস জমে রয়েছে। আমি না গেলে হিয়ারিং শুরু করা যাবে না।'

এসব কথা গতকালও বলেছিলেন বিশ্বজিৎ। বিনয় জিজ্ঞেস করল, 'কাল কখন যাবেন?'

'যেতে যেতে বিকেল হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।'

ওঁদের কথাবার্তার মধ্যে বনবিভাগের একজন কলাই-করা দুটো বড় কাপ বোঝাই করে চা নিয়ে এল। তার সঙ্গে প্রচুর বিস্কুট।

কর্মীটি বর্মি। চায়ের কাপটাপ টেবিলে রেখে ঘরের চার কোনায় মশা এবং পোকা মারা ধূপ জ্বালিয়ে দিল। কেননা সন্ধে নামতে না-নামতেই মশাদের দঙ্গল ঘরে ঢুকতে শুরু করেছে।

চায়ের পেয়ালা থেকে ধোঁয়া উড়ছিল। সটান উঠে বসলেন বিশ্বজিৎ। বললেন, 'এই বস্তুটির জন্যে মন-প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছিল।' বর্মিটিকে দেখিয়ে বলেন, 'লোকটা বোধ হয় অন্তর্যামী। ঠিক সময় ঠিক জিনিসটি এনে হাজির করেছে। নিন—চা খান।'

বিনয়ও এর মধ্যে উঠে পড়েছে। একটু হেসে সে চায়ের পেয়ালা তুলে নিল।

banglabooks.in

বর্মিট কাজ শেষ করে আর দাঁড়ায়নি। নিঃশব্দে চলে গেছে।

চা খেতে খেতে দু'জনের কথা হচ্ছিল। বিশ্বজিৎ বললেন, 'যদি মনে হয়, আপনাদের কাগজের জন্যে আরও দু-একটা রিপোর্ট লিখবেন, আজই লিখে ফেলুন। কাল আমার সঙ্গে দিয়ে দেবেন।'

বিনয় বলল, 'হ্যাঁ, লিখতে তো হবেই। তবে এক্ষুনি নয়; রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার পর লিখব।

'ঠিক আছে।'

একটু ভেবে বিনয় এবার জিগ্যেস করে, 'বলেছিলেন কাকা দু-চারদিনের মধ্যে এখানে এসে পড়বেন। তাঁকে ভীষণ দরকার। তাঁর কাছ থেকে ব্রিটিশ আমলের আন্দামানের অনেক কথা জানা যেত।'

এই কাকা হলেন শেখরনাথ রাহা। বিশ্বজিতের বাবার সবচেয়ে ছোট ভাই। তাঁর কথা আগেই বিশ্বজিতের কাছে শুনেছে বিনয়। শেখরনাথ ছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবী। অহিংস নির্বিষ আন্দোলনে ইংরেজ সরকারকে এদেশ থেকে উৎখাত করা যাবে, তিনি বা তাঁর মতো বিপ্লবীরা আদৌ তা বিশ্বাস করতেন না। ভারতের মতো একটা কলোনি থেকে চরকা কেটে, সত্যাগ্রহ বা অসহযোগ আন্দোলন করলে তারা চাটিবাটি গুটিয়ে দেশ থেকে সুবোধ-বালকের মতো বিদায় হবে, এসব আকাশ-কুসুম কল্পনা। পাগলের প্রলাপও বলা যায়। এই উপ-মহাদেশের মতো কামধেনু ফেলে কেউ কি সহজে চলে যেতে চায়! এদের তাড়াতে হলে সশস্ত্র অভ্যুত্থান চাই। তার জন্য চাই বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, বন্দুক, রাইফেল, পিস্তল। মুখের কথা খসালেই তো সেসব মুড়ি মুড়কির মতো পাওয়া যায় না। তার জন্য টাকা দরকার। ট্রেন ডাকাতি করে টাকা জোগাড় করতে গিয়ে ধরা পড়ে উনিশশো কুড়ি সালে শেখরনাথ কালাপানির সাজা নিয়ে আন্দামানে এসেছিলেন। পোর্টব্লেয়ারে সেলুলার জেল এবং বঙ্গোপসাগরের দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে তাঁর বিপুল অভিজ্ঞতা।

তাদের 'নতুন ভারত'-এর চিফ রিপোর্টার, নিউজ এডিটর থেকে শুরু করে কাগজের মালিক জগদীশ গুহঠাকুরতা পর্যন্ত সবাই চান শুধু রিফিউজি সেটেলমেন্টই নয়, সেলুলার জেল, ব্রিটিশ আমলের পেনাল কলোনি ইত্যাদি সম্পর্কেও যেন নিয়মিত প্রতিবেদন পাঠায় বিনয়। ইন্ডিয়ার মেন ল্যান্ডের মানুষজনের কাছে আন্দামান এক অচেনা দ্বীপপুঞ্জ। যেমন ভীতিকর তেমনি রহস্যময়। এই দ্বীপগুলি সম্বন্ধে সবার অপার কৌতূহল। শেখরনাথের সঙ্গে দেখা হলে তাঁর কাছ থেকে সেকালের এবং একালের অজস্র তথ্য জোগাড় করা যাবে।

বিশ্বজিতের সঙ্গে এই নিয়েও অনেক কথা হয়েছে বিনয়ের। তিনি বললেন, 'জেফ্রি পয়েন্টে নতুন সেটেলমেন্ট বসছে আর কাকা আসবেন না তাই কখনও হয়। নিশ্চিন্ত থাকুন, দু-একদিনের মধ্যে তিনি ঠিক এসে পড়বেন। এখানকার উদ্বাস্তুরা এখন তাঁর ধ্যানজ্ঞান।'

রাত্তিরেও সেটেলমেন্ট অফিসের সামনের খোলা চত্বরে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা। দু'দিন খিচুড়ি খাওয়ানো হয়েছে। আজ দুপুরে দেওয়া হয়েছিল ভাত ডাল আর সুবয়াই মাছের ঝোল। এবেলা অর্থাৎ রাত্তিরে চাপাটি তরকারি এবং ডাল।

খোলা চত্বরটায় অনেকগুলো গ্যাস বাতি আর হ্যাজাক জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। আলোয় আলোয় ভরে গেছে সমস্ত এলাকাটা।

বড় বড় কাঠের পরাতে পাহাড় প্রমাণ চাপাটি। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডেকচি বোঝাই ডাল, তরকারি। তরকারি বলতে আলু কুমড়োর ছক্কা। ছক্কার স্বাদ বাড়াবার জন্য প্রচুর আস্ত আস্ত ছোলা দেওয়া হয়েছে।

উদ্বাস্তুরা নিজের নিজের থালা গেলাস হাতে নিয়ে যথারীতি কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিরঞ্জন আর বিভাসের তদারকিতে ধনপত এবং পুনর্বাসন বিভাগের কর্মীরা তাদের থালায় চাপাটি টাপাটি তুলে দিচ্ছে। খাবার নিয়ে তারা ফাঁকা জায়গায় চলে যাচ্ছে।

বিশ্বজিৎ বিনয়কে সঙ্গে করে চলে এসেছেন। খাবার নিয়ে খেতে খেতে তাঁরা কথা বলছিলেন।

মজার গলায় বিনয় জিগ্যেস করল, 'রিফিউজিদের জন্যে এই সরকারি লঙ্গরখানা কতদিন চালু থাকবে?'

বিশ্বজিৎ একটু ভেবে বললেন, 'দ্যাট ডিপেন্ডস—'

কথাটা বুঝতে পারল না বিনয়; সে তাকিয়ে থাকে।

বিশ্বজিৎ বললেন, বড় বড় গাছগুলো তো আমরা কেটে দিচ্ছিই। 'জমি ডিস্ট্রিবিউশনের পর বাকি ঝোপঝাড় মাঝারি আর ছোট গাছটাছ কেটে সাফ করবে রিফিউজিরা আপনাকে আগেই তা বলেছি। তারপর যে যার জমির একধারে নিজেদের ঘর তুলে নেবে। চাষের জমির পাশেই বাড়ি। এই বাড়ির সব মেটিরিয়াল—বাঁশ টিন দড়ি কাঠ—গভর্নমেন্ট থেকে দেওয়া হবে।'

বিশ্বজিৎ আরও জানালেন, ঘর তোলা হলে অ্যাডাল্টদের মাথা পিছু পঁচিশ টাকা আর মাইনরদের মাথা পিছু কুড়ি টাকা করে ক্যাশডোল দেওয়া হবে। সেই টাকায় উদ্বাস্তুরা নিজেদের ফ্যামিলি চালাবে। অবশ্য আইরিশ আর আমেরিকান এভাঙ্গেলিস্টরা যে পাউডার মিল্ক পাঠাচ্ছে সেটা ওদের ফ্রি দেওয়া হবে। তখন রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট এই কমন কিচেন বন্ধ করে দেবে। আগে যেসব সেটেলমেন্ট বসানো হয়েছে সেসব জায়গাতেও এটা করা হয়েছে।

বিনয় বেশ ধন্দে পড়ে যায়।—'কিন্তু'

'কী?'

'টাকা না হয় দেওয়া হল, কিন্তু এই জঙ্গলের ভেতর মানুষগুলো চাল ডাল তেল নুন কোথায় পাবে? এখানে তো হাটবাজার কিছু নেই।'

বিশ্বজিৎ জানালেন, রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টে একটা কো-অপারেটিভ সেকশন রয়েছে। সেই সেকশনের লোকজন এখানে এসে দোকান বসাবে। পোর্টব্লেয়ার থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এনে উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিক্রি করবে। না-লাভ, না-লোকসান, এই পদ্ধতিতে।

ওঁদের কথাবার্তার মধ্যেই মোহনবাঁশি, সহদেব, হলধর দাসরা হাতে খাবারের থালা এনে কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। মোহনবাঁশিদের কী একটা যেন বলার আছে কিন্তু বলতে পারছে না। ভয়ে ভয়ে শুধু বিশ্বজিতের দিকে বার বার তাকাচ্ছে।

বিশ্বজিৎ মোহনবাঁশিদের লক্ষ করেছিলেন। জিগ্যেস করলেন, 'কিছু বলবেন?'

মোহনবাঁশি মাথা নেড়ে খুব বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'হ, স্যার—'

'বেশ তো বলুন না—'

'জমিন দেওয়া শুরু হইছে। তমস্ত (সমস্ত) দিন আমাগো যার যার জমিনে কাইটা যাইব। সন্ধ্যার পর আর কুনো কাম নাই। ওই সোময়টা কিছুক্ষণ যদিন আমরা ইট্টু গানবাজনা করি, আপত্ত নাই তো?'

সহদেব বলল, 'দ্যাশ ছাইড়া আসনের সোময় আমি একহান দোতারা লইয়া আইছি। কেও কেও সারিন্দাও আনছে। গান বাজনা করলে মনডা ভাল থাকব।'

চকিতে বিশ্বজিৎ একবার বিনয়ের দিকে তাকালেন। তাঁর চাউনির মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যাতে আন্দাজ করা যায় তিনি খুশি হয়েছেন। খুশির কারণটাও মোটামুটি আঁচ করা যাচ্ছে। পরশু রাত্তিরে জারোয়ারা যখন আচমকা সেটেলমেন্টে হানা দিয়েছিল, উদ্বাস্তুরা ভয়ে আতঙ্কে পাগলের মতো চেঁচাচ্ছিল; তারা কিছুতেই এই দ্বীপে থাকবে না, কলকাতায় ফিরে যাবে। আজ তারাই কিনা পাহাড়ে-ঘেরা বিজন বনভূমিতে গান বাজনার আসর বসাতে চাইছে। এই সেটেলমেন্টে বাকি জীবন কাটানো যে ওদের ভবিতব্য সেটা ওরা বুঝতে পারছে। এখানে তাদের মন বসতে শুরু করেছে। ভালো লক্ষণ।

বিশ্বজিতের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। উৎসাহ দেবার সুরে

banglabooks.in

বেশ জোর দিয়েই বললেন, 'নিশ্চয়ই গাইবেন, বাজাবেন। গান বাজনায় মন ভালো থাকে। যদি আরও কিছু বাজনার জিনিস দরকার হয়, যেমন ধরুন হারমোনিয়াম, তবলা, সব সরকার থেকে কিনে দেওয়া হবে।'

মোহনবাঁশির চোখ দু'টো উদ্দীপনায় চকচক করছে, তাদের আর্জি যে এত সহজে পূরণ হবে, ভাবতে পারেনি। বলল, 'আমাগো মইদ্যে (মধ্যে) কেঠা কেঠা (কে কে) হারমুনি আর তবলা বাজাইতে পারে, একবার খবর লই, হের পর আপনেরে কমু—'

'আমি তো কালই চলে যাচ্ছি। তবে এখানকার অফিসার পরিতোষ বণিক থাকবেন। তাঁকে বলবেন সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

'সার (স্যার), ভরসা যহন দিলেন, আর দুইখান কথা কই।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন।'

ফাঁকা চত্বরটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে মোহনবাঁশি বলল, 'আমরা ওইহানে খুটি কুইপা (পুঁতে), বাঁশের পাটাতন বহাইয়া (বসিয়ে) একহান বড় কইরা মাচান বানাইতে চাই।'

বিশ্বজিৎ একটু অবাক হলেন। —'মাচান দিয়ে কী হবে?'

'হের উপুর বইসা গীত গামু। কুলোনির মাইন্‌ষে ঘিরা বইয়া শুনব।'

গীত বাদ্যের একটা পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করতে চাইছে মোহনবাঁশিরা। মঞ্চ সাজিয়ে তারা আসর বসাবে, কিন্তু শ্রোতা ছাড়া আসরের তো মানেই হয় না, তাই তাদের ঘিরে বসবে সেটেলমেন্টের নতুন বাসিন্দারা।

বিশ্বজিৎ বললেন, 'নিশ্চয়ই মাচান বানিয়ে নেবেন। আর কী যেন বলবেন?'

'আইজ রাইতেই খাওয়া দাওয়া সাইরা কিছু সোময় গীত গাইতে চাই। বাত্তিগুলান নিভাইয়া না দিলে ভালা হয়। আন্ধারে তো গাওন (গাওয়া) যায় না।'

'না-না, আলো অবশ্যই জ্বলবে। আমি বলে দেব। যান, আপনারা খেয়ে নিন।'

মোহনবাঁশিরা চলে গেল।

খাওয়া চুকলে নিজেদের ঘরে চলে এল বিনয়রা। বিশ্বজিৎ বললেন, 'এবার লেখা শুরু করে দিন।'

মশা এবং পোকামাকড় মারা ধূপগুলো জ্বলছিল। কাজেই জঙ্গলের দিক থেকে তারা এদিকে ঘেঁষছিল না।

খোলা জানালার ধার ঘেঁষে যে লেখার টেবলটা রয়েছে সেটার ওপর একটা লণ্ঠন তুলে কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়ল বিনয়।

ওধারের খাটে কাত হয়ে শুয়ে একটা বই খুলে পড়তে লাগলেন বিশ্বজিৎ। বিনয় যতক্ষণ লিখবে, তিনি পড়বেন।

কয়েক লাইন লেখার পর হঠাৎ হইচই কানে এল। জানালার বাইরে তাকাতেই চোখে পড়ল, ওধারের চত্বরে তুমুল ব্যস্ততা চলছে। উদ্বাস্তুরা তো বটেই, পুনর্বাসন দপ্তরের কয়েকজন কর্মী বিপুল উদ্যমে অনেকটা জায়গা জুড়ে লম্বা লম্বা চট বিছিয়ে লোকজনের বসার ব্যবস্থা করছে। বিভাস, নিরঞ্জন বা পরিতোষরাও গা গুটিয়ে নেই। তাদেরও বিপুল উৎসাহ। ক'টা হ্যাজাক আর গ্যাসবাতি এনে চারপাশে এবং মাঝখানে বসিয়ে দিচ্ছে।

আসর সাজানো শেষ। সেটেলমেন্টের কেউ বাকি নেই; সবাই মাঝখানে খানিকটা অংশ বাদ দিয়ে গোল হয়ে বসে পড়তে শুরু করেছে। বোঝাই যায়, মাঝখানের জায়গাটা বাজনদার আর গাইয়েদের জন্য ফাঁকা রাখা হয়েছে।

একটু পরেই সহদেব, হলধর, মোহনবাঁশি এবং হরিপদ দোতারা সারিন্দা টারিন্দা নিয়ে আসরের মধ্যিখানে বসে পড়ল। খুলনার আছেরপুর গাঁয়ের হরিপদ এবং তার দাদা সোমেন বিশ্বাসকে স্পষ্ট মনে আছে বিনয়ের। 'রস' আইল্যান্ডে রিফিউজি কোটা পূর্ণ করার জন্য পঁয়তাল্লিশ মিনিটে যে ছ' ছ'টা বিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে হরিপদও ছিল।

যেসব ফ্যামিলি কলকাতা থেকে 'মহারাজা' জাহাজ বোঝাই হয়ে এই খেপে আন্দামানে এসেছে তাদের দু' ভাগে ভাগ হয়ে একদল গেছে মিডল আন্দামানে। আরেক দল সাউথ আন্দামানের এই জেফ্রি পয়েন্টে। এদের ভেতর যে হরিপদরা ছিল, আগে খেয়াল করেনি বিনয়। আসলে আন্দামানে পৌঁছুবার পর এত ধকল গেছে, এতসব ঘটনা ঘটেছে যে আলাদা করে হরিপদর কথা তার মাথায় আসেনি।

হরিপদ কী করবে ওখানে? গাইবে? বাজাবে?

মোহনবাঁশি দোতারা আর সহদেব সারিন্দা নিয়ে এসেছিল। একটু পর মোহনবাঁশির আঙুলের টোকায় দোতারা টুং টাং সুরে বেজে ওঠে। ধীর লয়ে সারিন্দায় ছড় টানে সহদেব। ক্রমশ লহর তুলে দুই বাদ্যযন্ত্রের সুর পর্দায় পর্দায় চড়তে থাকে।

ঠিক এই সময় একটা হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে গাইতে শুরু করে হরিপদ।

'বন্ধু আমার নিধনিয়ার ধন
তারে দেখলে জুড়ায় জীবন যৈবন
না দেখলে হয় আমার মরণ
যেদিন হইতে বন্ধুহারা
আমি হইয়াছি পাগলের পারা গো
আমার দুই নয়নে বহে ধারা
কে করে আমায় বারণ...'

রোগাটে গড়নের ভীরু, লাজুক, মুখচোরা, গেঁয়ো যুবকটির এমন এক আকুল-করা, সতেজ কণ্ঠস্বর রয়েছে, কে তা ভাবতে পেরেছিল! পদ্মা-মেঘনা-মধুমতী পারের স্মৃতিটাকে বহুদূরের বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে লহমায় তুলে এনেছে হরিপদ। তিন দিকের পাহাড়ে গানের সুরটা প্রতিধ্বনি তুলে চলেছে অবিরল;

banglabooks.in

হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে সমুদ্রের দিকেও। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে বিনয়।

ওধারে হাতের বইটা নামিয়ে রেখে উঠে বসেছেন বিশ্বজিৎ। গানটা তাঁকেও প্রবল নাড়া দিয়েছে। নিচু গলায় বললেন, 'এক্সেলেন্ট! এ একেবারে খাঁটি ইস্ট বেঙ্গলের জিনিস। শহুরে ভেজাল ভাটিয়ালি নয়। চলুন, বাইরে গিয়ে শোনা যাক।'

দু'জনে বেরিয়ে আসর থেকে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন। ওঁদের দেখলে হরিপদ হয়তো ঘাবড়ে যাবে; গানের সুর তাল কেটে যাবে, তাই খুব কাছে না যাওয়াই ভালো।

হরিপদ আধবোজা চোখে বিভোর হয়ে গেয়ে চলেছে।

'বনের আগুন সবাই দেখে
আমার মনের আগুন কেউ না দেখে গো
আমি বনপোড়া হরিণের মতো
পুড়িয়া হই ছাই যখন।
শিখাইয়া দারুণ পীরিতি
আসলো না মোর প্রাণনিধি গো
সারা জীবন সার হইল
সার হইল, গো আমার কান্দন—'

একের পর এক গান গেয়ে হরিপদ যখন থামল, বেশ রাত হয়ে গেছে। সে যতক্ষণ গাইছিল তারিফের সুরে শ্রোতারা মাঝে মাঝেই বলে উঠছিল, 'আহা হা, কী গীতই না হুনলাম (শুনলাম)!' বা 'পরান খান উথালি পাথালি করে গো—'

আসর ভাঙার পর বিশ্বজিৎ আর বিনয় হরিপদর কাছে এগিয়ে যায়। মুগ্ধ গলায় বিশ্বজিৎ বললেন, 'তুমি তো গুণী লোক হে। একজন সত্যিকারের আর্টিস্ট।'

গুণী শব্দটা হরিপদর জানা। কিন্তু আর্টিস্ট কথাটার মানে জানে না। তবে বিশ্বজিৎ যে তার সুখ্যাতি করছেন সেটা বুঝতে পারছিল। সঙ্কোচে সে একেবারে এতটুকু হয়ে যায়। মুখ নামিয়ে বলে, 'আপনারা আমার হাবিজাবি গান শুনিছেন!'

বিশ্বজিৎ বললেন, 'হাবিজাবি কী বলছ! চমৎকার গেয়েছ।'

আরও নুয়ে পড়ল হরিপদ। কী যেন বলতে চাইল; পারল না। গলার ভেতর উত্তরটা আটকে গেল।

বিশ্বজিৎ তার কাঁধে একটা হাত রাখলেন।— 'এতগুলো মানুষকে আনন্দ দেওয়া, সেটা কি সোজা কথা! সাত পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে, সেখানে আর ফিরে যাওয়া যাবে না। এখন এই দ্বীপ তোমাদের দেশ। নিজে আনন্দে থাকো, সবাইকে আনন্দ দাও।' মোহনবাঁশি সহদেবদের বললেন, 'তোমরাও গুণী মানুষ। যেমন বলেছিলে তেমনি রোজ সন্ধের পর আসর বসাবে। অনেক রাত হয়ে গেছে, এবার ব্যারাকে গিয়ে শুয়ে পড়। কাল সকাল থেকে আবার জমি দেওয়া শুরু হবে। বেশি রাত পর্যন্ত জেগে থাকলে তাড়াতাড়ি উঠতে পারবে না।'

বিশ্বজিৎও আর দাঁড়ালেন না, বিনয়কে জেনে থাকলে তাড়াতাড়ি উঠতে পারবে না।'

বিশ্বজিৎ আর দাঁড়ালেন না, বিনয়কে সঙ্গে করে নিজের ঘরে চলে এলেন।

বিনয় প্রতিবেদন লিখতে লিখতে উঠে গিয়েছিল। ভেবেছিল ফিরে এসে বাকিটা শেষ করে ফেলবে। কিন্তু এখন আর টেবলে গিয়ে বসতে ইচ্ছে করছে না। হরিপদর গান আর মোহনবাঁশিদের বাজনার রেশ জেফ্রি পয়েন্টের পাহাড়ে, বনভূমিতে এবং সমুদ্রে এখনও থেকে গেছে যেন। খুব ভালো লাগছে বিনয়ের। হরিপদরা যেন পূর্ববাংলা নামে বহুদূরের এক স্বপ্নের ভূখণ্ডে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। আজ আর অন্য কাজে মন বসবে না।

পুনর্বাসন দপ্তরের কোনও কর্মী কখন যেন এসে তাদের দু'জনের মশারি খাটিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। বিনয় টেবলের ওপর যে লণ্ঠনটা জ্বলছিল সেটা নিভিয়ে মশারির ভেতর ঢুকে পড়ল।

বিশ্বজিত শুয়ে পড়লেন। তাঁর খাটের পাশে নিচু টেবলে আরেকটা লণ্ঠন জ্বলছিল। চাবি ঘুরিয়ে সেটা নিভিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'আজ আর লেখাটা কমপ্লিট করা গেল না—তাই তো?'

বিনয় বলল, 'হ্যাঁ, কাল সকালে উঠে ওটা শেষ করব। আসলে হরিপদর গানটা—'

বিশ্বজিৎ বললেন, 'খুব সাধারণ চেহারা—মোস্ট আন-ইমপ্রেসিভ। পাশ দিয়ে গেলে কেউ ফিরেও তাকাবে না। কিন্তু ছেলেটার গলায় ম্যাজিক আছে; একেবারে হিপনোটিক। কার ভেতরে কী যে থাকে, মুখ দেখে বোঝা যায় না।

॥ পাঁচ ॥

পরদিন ঘুম ভাঙতে বেশ দেরিই হয়ে গেল বিনয়ের। ধড়মড় করে উঠে মশারির বাইরে এসে দেখল বিশ্বজিৎ নেই। জমি বিলি হওয়ার কথা খুব সকাল থেকে। বিনয় গভীর ঘুমে ডুবে আছে, তাই আর তাকে ডাকেননি। নিশ্চয়ই উদ্বাস্তু এবং পুনর্বাসনের কর্মীদের নিয়ে জঙ্গলে চলে গেছেন।

একটা তোয়ালে নিয়ে সমুদ্রের ধারে চলে এল বিনয়। তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে চা এবং সকালের খাবার খেয়ে কালকের লেখাটা নিয়ে বসতে হবে।

সূর্য পুবদিকের পাহাড়ের মাথায় উঠে এসেছে। তিনদিকের ঘন জঙ্গলে এবং সমুদ্রে রোদ ঝলকে যাচ্ছে। রোদটা এত তেজি যে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না।

বিচটা একেবারে ফাঁকা। কেননা জেফ্রি পয়েন্টের বাসিন্দারা এখন সবাই উত্তর দিকের জঙ্গলে।

মুখটুখ ধুয়ে তোয়ালেতে মুছতে মুছতে বিচের ওপর দিয়ে সে যখন ফিরতে শুরু করেছে, হঠাৎ ভট ভট শব্দ কানে এল। ঘুরে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল একটা মোটর বোট সমুদ্রের পাড় ঘেঁষে খুব আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। বোটটার গায়ে নাম লেখা: সি-গাল। সি-গালের মানে তো সিন্ধুশকুন, নাকি সাগর পাখি।

বোটটায় জনা চারেক লোক রয়েছে। তাদের মধ্যে একজন বর্মি, সেটা তার মঙ্গোলিয়ান চেহারা দেখে লহমায় ধরে ফেলা যায়। বাকি তিনজন বেশ কালো। সবার চুল চামড়া ঘেঁষে ছোট ছোট করে ছাঁটা। কেউ মাঝারি হাইটের, কেউ বেড ঢ্যাঙা। বর্মিটার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, পরনে ঢোলা ফুলপ্যান্ট আর হাত-কাটা জামা। অন্য সবাই পরেছে খাটো হাফ প্যান্ট, প্যান্টগুলো আঁট হয়ে গায়ে লেপটে আছে। শার্টটার্ট নেই। দু'জনের গলায় কালো কারে ক্রস ঝুলছে। বোঝাই যাচ্ছে—খ্রিস্টান। বাকি লোকটির গলায় কিছু নেই।

ওরা বিনয়কে দেখতে পেয়েছিল। বোটটা থামিয়ে বর্মিটি হিন্দি এবং উর্দু মেশানো হিন্দুস্থানিতে জিগ্যেস করল, 'সাহাব, এই জেফ্রি পয়েন্টে রিফিউজি সেটলমেন্ট বসার কথা শুনেছিলাম। পাকিস্তানের রিফিউজিরা কি এসে গেছে?' বাঙালি, বিহারি, মারাঠি শিখ বর্মি কারেন—সবাই এখানে হিন্দুস্থানিতে কথা বলে। সেই মিউটিনির সময় যে সিপাহিদের কালাপানি সার করে এই দ্বীপে পাঠানো হয়েছিল তখন থেকেই হিন্দুস্থানি বুলি অর্থাৎ ভাষাটা চালু হয়েছে। প্রায় একশো বছর ধরে সেটা চলছে।

বিনয়ের চেহারাটা উদ্বাস্তুদের মতো ক্ষয়াটে, ভাঙা-চোরা, নুয়ে-পড়া ধরনের নয়। তাকে দেখলে মনেই হয় না, দারিদ্র, কষ্ট বা চরম দুর্দশার মধ্যে আছে সে। বরং চোখেমুখে সম্ভ্রান্ত, মার্জিত একটা ছাপ রয়েছে। তাই বর্মিটা তাকে 'সাহাব' বলেছে। তার কথাবার্তায় রীতিমতো সম্ভ্রম মেশানো।

বিনয় বলল, 'হ্যাঁ, অনেক উদ্বাস্তু ফ্যামিলি এসে গেছে। আরও আসবে।'

নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করল লোকগুলো। তারপর বর্মিটা বলল, 'হামলোগ আতে হেঁ। এদিকে যখন এসেই পড়েছি নয়া সেটলমেন্টের কামকাজ কেমন হচ্ছে, একবার দেখেই যাই।'

মোটর বোটটা যদিও ছোট কিন্তু কিনারে ঘেঁষতে পারছে না, কেননা সেখানে জলের গভীরতা দেড় দু'ফিটের বেশি হবে না। বোটের তলার দিকটা জলতলের বালিতে আটকে যাবে। খানিক দূরে জল যেখানে কোমর সমান গভীর সেখানে নোঙর ফেলে

banglabooks.in

বর্মিরা চারজন সমুদ্রে নেমে পড়ল। তারপর জল ঠেলে ঠেলে পাড়ে এসে উঠল। তাদের প্যান্টট্যান্ট ভিজে গেছে, কিন্তু তা নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। ভাবখানা এইরকম—ভিজে যখন গেছে তখন শুকিয়েও যাবে।

বর্মি আর সঙ্গীরা বিনয়ের কাছে চলে এসেছিল। বর্মিটা জিগ্যেস করল, 'আপলোগ সেটলমেন্টকা অফসর হ্যায়?'

'অফসর' অর্থাৎ অফিসার। কলকাতা আসার পর কাজ চালাবার মতো হিন্দি এবং একটুআধটু উর্দু শিখে নিয়েছে বিনয়। বুঝতে পারে, মোটামুটি বলতেও পারে। সে বলল, 'না না, আমি কলকাতার একটা নিউজ পেপারে কাজ করি। আন্দামানের সেটলমেন্ট দেখতে এসেছি।'

'আপনি আখবরে কাম করেন? পত্রকার? বর্মির ভক্তি যেন কয়েক গুণ বেড়ে গেল।

আখবর কথাটার মানে জানত না বিনয়। আন্দাজে বুঝে নিল—খবরের কাগজ। পত্রকারটা আগেই শুনেছে—সেটা হল সাংবাদিক।

বিনয় বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু আপনাদের পরিচয়টা কিন্তু জানতে পারিনি।'

বর্মিটি বিপুল উৎসাহে জানায়, সে শেল কালেক্টর। নাম লা পোয়ে। আন্দামানের দরিয়া ইজারা নিয়ে জলের তলা থেকে নানারকম শঙ্খ কড়ি টার্বো ট্রোকাস ইত্যাদি তুলে ঘষেমেজে সাফ করে কলকাতা বোম্বাই এমনি বিরাট বিরাট শহরে পাঠায়। আন্দামানের শেলের সারা দুনিয়া জুড়ে কদর। কলকাতা বোম্বাইয়ের বড় বড় শেঠেরা সেসব পৃথিবীর নানা জায়গায় চালান দেয়। শেল নিয়ে লাখো লাখো টাকার কারবার চলছে।

শেলের ব্যাবসা নিয়ে কিছুই ভাবছিল না বিনয়। সে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। বিদ্যুৎ চমকের মতো ঝিনুকের মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। সে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই লা পোয়ে জানায়, 'সি-গাল' বোটটার মালিক সে নিজে। সরকারের কাছ থেকে সে নিজেই শেল তোলার লাইসেন্স নেয়, ফি বছর লাইসেন্স রিনিউ করতে হয়। বছরের পর বছর এইভাবেই চালিয়ে যাচ্ছে।'

লা পোয়ে তার সঙ্গীদের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেয়। তারা হল যোশেফ, জন এবং রামন। তিনজনই কেরালার লোক। দু'জন খ্রিস্টান, একজন হিন্দু। ওরা ডাইভার। অর্থাৎ জলের তলায় ডুব দিয়ে দিয়ে হাঙর এবং অন্য সব হিংস্র সামুদ্রিক জন্তুর সঙ্গে লড়াই করে ট্রোকাস টার্বো ইত্যাদি দামি দামি শেল তুলে আনে।

ঝিনুকের চিন্তায় বিনয়ের মাথার ভেতরটা তোলপাড় করে দিচ্ছিল। সে আগেই শুনেছে, শেল কালেক্টররা আন্দামানের নানা দ্বীপের চারদিকে ঘুরে ঘুরে শেল তোলে। ঝিনুক রয়েছে মিডল আন্দামানে। এখান থেকে কম করে ষাট-সত্তর মাইল দূরে। লা পোয়েরা কি সেখানে যায়?

'রস' আইল্যান্ডে চকিতের জন্য ঝিনুককে দেখার পর থেকে তীব্র ব্যাকুলতায় বুকের ভেতরটা ভরে আছে বিনয়ের। ঝিনুকের সঙ্গে তার সম্পর্কটা ঠিক কী, বিশ্বজিৎকে জানাতে পারেনি। সংকোচ হয়েছে। একটু ঘুরিয়ে শুধু বলেছে, সে মিডল আন্দামানের নতুন নতুন সেটলমেন্টগুলো দেখতে চায়। সেইসব অঞ্চলের রিপোর্টও সে 'নতুন ভারত'-এ পাঠাবে। এগুলো তার অ্যাসাইনমেন্টের মধ্যে পড়ে। কিন্তু আসল উদ্দেশ্যটা হল, একবার মিডল আন্দামানে পৌঁছাত পারলে সেটেলমেন্টের পর সেলটমেন্ট ঘুরে সে ঝিনুককে যেভাবেই হোক খুঁজে বার করবে।

কিন্তু বিশ্বজিৎ বিশেষ গরজ দেখাননি। বলেছেন, তাড়াহুড়োর কিছু নেই। সাউথ আন্দামানে সেটেলমেন্টের পত্তন কীভাবে হচ্ছে, প্রথম সেটা দেখুক বিনয়, পরে তাকে মিডল আন্দামানে পাঠবার ব্যবস্থা করা হবে। তিনি কেমন করে জানবেন একটি চিরদুঃখী তরুণীর জন্য কতটা অস্থির হয়ে আছে বিনয়!

লা পোয়ের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর আশায় উত্তেজনায় উথালপাতাল হয়ে যাচ্ছিল বিনয়। কৌশলে জেনে নিতে হবে ওরা মিডল আন্দামানে শেল তুলতে যায় কিনা। যদি যায় যেভাবেই হোক ওদের সঙ্গে সেখানে চলে যাবে।

লা পোয়ে জিগ্যেস করল, 'বড়ে সাহাবকে আপনি চেনেন?'

'বিনয় একটু অবাক হল।— 'কোন বড়ে সাহেব?'

'রাহা সাহাব। যাঁর হাত দিয়ে এই সব সেটলমেন্ট বসছে।'

'রাহা সাহাবকে চনব না? তিনিই তো আমাকে এই জেফ্রি পয়েন্টে নিয়ে এসেছেন।'

'সাহেব কি এখন এখানে আছেন?'

'আছেন। জঙ্গলে রিফিউজিদের জমি দেওয়া হচ্ছে। তিনি তার দেখাশোনা করছেন।'

খুশিতে চোখমুখ চক চক করতে থাকে লা পোয়ের। 'আজ আমার নসিবটা বহুত আচ্ছা। বড়ে সাহাবের সঙ্গে দেখা হবে। ওঁকে সালাম দিয়ে যাই। উনি কোন দিকের জঙ্গলে আছেন?'

'উত্তর দিকের।'

লা পায়ে আর সঙ্গীদের নিয়ে দূরের জঙ্গলের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

এই শেল কালেক্টরটাকে কোনও ভাবেই ছাড়া যায় না। বিনয়ের খেয়াল রইল না, এখনও তার চা'টা খাওয়া হয় নি। খেয়াল রইল না, কাল রাত্রিরে যে লেখাটা শুরু করেছিল, সেটা শেষ করা জরুরি। সেও লা পেয়ে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

উত্তরের জঙ্গলে এখন তুমুল ব্যস্ততা। একদিকে বন দপ্তরের কর্মীরা লম্বা লম্বা করাত চালিয়ে বিশাল বিশাল ঝাড়লো মহাবৃক্ষকে কাটছে। লা ডিন তার দল বল নিয়ে চেন দিয়ে জমি মাপছে, আর একটা দল বাঁশের খুঁটি পুঁতে জমির সীমানা ঠিক করে দিচ্ছে। তাদের কাজকর্ম তদারক ধনপত, নিরঞ্জন এবং বিভাস। উদ্বাস্তুরাও রয়েছে প্রচুর। তারা তাদের জমি বুঝে নিচ্ছে।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ করছেন বিশ্বজিৎ। ঝোপ ঝাড় লতাপাতা ঠেলে আসার শব্দে পেছন ফিরে তাকিয়ে লা পোয়েদের সঙ্গে বিনয়কে দেখে তিনি রীতিমতো অবাক।

লা পেয়ে এবং তার তিন কেরেলি ডাইভার কপালে হাত ঠেকিয়ে কোমর ঝুঁকিয়ে বলল, 'সেলাম বড়ে সাহাব। আপনার তবিয়ত আচ্ছা হ্যায় তে?'

লঘু সুরে বিশ্বজিৎ বললেন, 'আমার তবিয়ৎ কখনও খারাপ হয় না। সব সময় আচ্ছা থাকে।' তা তেমারা এখানে আমার খবর পেলে কী করে? 'বলে একটু কী ভেবে বিনয়কে দেখিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই এই সাহেবের কাজ?'

'হা—' লা পোয়ে জানায় মোটর বোট নিয়ে তারা জেফ্রি পয়েন্টে এসেছিল। বিনয়কে সমুদ্রের বিচে দেখে নেমে আসে। তারা আগেই খবর পেয়েছিল এখানে রিফিউজি সেটলমেন্ট বসছে। বিনয়ের কাছেই শুনেছে বিশ্বজিৎ এখানে আছেন। তাই—

বিশ্বজিৎ বললেন, 'তোমাদের কাজকর্ম ঠিকমতো চলছে?'

'জি বড়ে সাহেব। সবই আপনার মেহেরবানিতে। এহী সাল আগের সালের চেয়ে তিন গুনা (গুণ) সিপি (শেল অর্থাৎ শঙ্খ কড়ি টড়ি) উঠছে।'

বিশ্বজিৎ হাসলেন। 'তাহলে লাভ ভালোই হবে বলছ?'

'হাঁ বড়ে সাহাব। আপনি যদি আমাদের না দেখতেন, বালবাচ্চা নিয়ে ভুখা মরতে হত। আপনার জন্য আমরা বেঁচে গেছি। এই জিন্দগিতে আপনার মেহেরবানি কভি—'

'বাস, বাস— 'একটা হাত তুলে লা পোয়েকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, 'এত গুণকীর্তন করে তাঁকে অকাশে চড়াতে হবে না।'

লা পোয়ে থেমে গেল।

বিনয় চুপচাপ একধারে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছিল। সে জানে বিশ্বজিৎ রাহা আন্দামানের ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট এবং রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টের একজন বড় কর্তা। বর্মি শেল কালেক্টরকে তিনি কীভাবে মেহেরবানি করলেন, বোধগম্য হল

banglabooks.in

না। বিশ্বজিতের যে ধরনের দায়িত্ব তাতে তার আওতায় সমুদ্র থেকে শেল তোলার ব্যাপারটা আসে না।

বিশ্বজিৎ লা পোয়েকে বললেন, 'তোমরা এদিকে কতদিন 'শেল' তুলবে?'

'দশ পন্দ্র রোজ তো জরুর।'

হঠাৎ কিছু মনে পড়তে বিশ্বজিৎ বিনয়ের দিকে তাকালেন। 'জানেন এই লা পোয়ে নাইনটিন টোয়েন্টি ফাইভে বর্মায় মৌলমিন থেকে কালাপানির সাজা খাটতে আন্দামানে এসেছিল। লা পোয়েকে জিগ্যেস করলেন, 'কী ঠিক বলছি তো?'

'হাঁ, বড়ে সাহাব' শাস্তি ভোগ করতে আসার কথায় নিজেকে গুটিয়ে নিল লা পোয়ে। মিনিমিনে গলায় বলল, 'ও সব পুরানা বাত'—

বোঝা যাচ্ছে অতীতে যা ঘটে গেছে তা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি হোক, সেটা একেবারেই চায় না লা পোয়ে। মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

বিশ্বজিতের হয়তো একটু মজা করার ইচ্ছা হল। বললেন, 'কটা যেন মার্ডার করে এখানে এসেছিলে—তিনটে না চারটে?'

জবাব না দিয়ে নীরবে ঘাড় চুলকাতে লাগল। এতকাল বাদে পুরানো দুষ্কর্মের ইতিহাস খুঁচিয়ে বার করার কি কোনও মানে হয়? 'বড়ে সাহাব' তাকে কী ফ্যাসাদেই যে ফেলে দিয়েছেন!

বিশ্বজিৎ বলতে লাগলেন, 'নাইনটিন থার্টি ফাইভে বর্মা ইন্ডিয়া থেকে আলাদা হয়ে গেল। তারপর ইন্ডিয়া, বর্মা দুই কান্ট্রিই স্বাধীন হল। সাজার মেয়াদও ফুরিয়ে গিয়েছিল। ইচ্ছা করলে লা পোয়ে নিজের দেশে মৌলমিনে ফিরে যেতে পারত। যায়নি। এখানেই বিয়েটিয়ে করে 'শেল'-এর কারবার করছে। লা পোয়ে এখন পাকা জেন্টলম্যান। কী হে তা-ই তো?' শেষ কথাটা লা পোয়েকে।

বর্মি শেল কালেক্টরের ঘাড় চুলকানি আরও বেড়ে গেল। বিশ্বজিৎ এমনিতে গম্ভীর প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। কাজের সময় কারও পান থেকে চুন খসার উপায় নেই। কিন্তু অন্য সময় ভারী মজাদার মানুষ। অন্যের পেছনে লেগে রঙ্গ করতে ভালোবাসেন। নিছক নির্দোষ কৌতুক।

বিনয়ের মাথায় ঝিনুকের চিন্তাটা ঘুরছিলই। তার ইচ্ছে লা পোয়েরা যদি শেল তুলতে মিডল আন্দমানে যায় সে তাদের মোটর বোটে উঠে পড়বে। কিন্তু ওঠাটা সহজ নয়। বিশ্বজিৎ বললে লা পোয়েরা নিশ্চয়ই তাকে সঙ্গে নেবে। তবে আপাতত বিশ্বজিৎকে জানাবে না, সে মধ্য আন্দামানে যেতে চায় এবং এই যাওয়ার পেছনে রয়েছে ঝিনুক। বলা যাবে না সেখানে সমুদ্রের ধারে গহন বনভূমির ভেতর নতুন যেসব সেটেলমেন্টের পত্তন হচ্ছে সেই উপনিবেশগুলিতে হানা দিয়ে ঝিনুককে খুঁজে বার করবে। ঝিনুকের কথা লা পোয়েদেরও বলবে না। এ জন্য মনে মনে একটা কৌশল মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে।স

বিশ্বজিৎ বললেন, 'আমি এখন খুব ব্যস্ত। আর কথা বলতে পারব না। তোমরা তোমাদের কাজ কর গিয়ে। দরকার হলে আমার সঙ্গে পোর্ট ব্লেয়ারে গিয়ে দেখা করো।'

'জি বড়ে সাহাব—'

লা পোয়েরা সমুদ্রের দিকে পা বাড়াতে যাবে, ব্যগ্রভাবে বিনয় বিশ্বজিৎকে বলে, 'আমার একটা কথা আছে।'

বিশ্বজিৎ জিগ্যেস করলেন 'কী কথা?'

বিনয় বলল, 'লা পোয়ের কাছে শুনেছি ওরা সমুদ্র থেকে হাঙর বা অন্য ধরনের ফেরোশাস সি অ্যানিম্যালদের সঙ্গে লড়াই করে শেল তুলে আনে। এই নিয়ে আমাদের কাগজে দু একটা লেখা পাঠানো যায়।'

বিশ্বজিৎকে বেশ উৎসাহিত দেখা গেল। বললেন, 'হ্যাঁ, ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং। সেই সঙ্গে ভীষণ রিস্কিও। যে ডাইভাররা শেল তোলে তারা যদি একটু অসাবধান হয় হাঙরেরা তাদের ছিঁড়ে খাবে। এরকম দু চারটে ঘটনা যে ঘটে না তা নয়।' একটু থেমে ফের শুরু করেন, 'আন্দামানের ডাইভারদের পক্ষে ভীষণ বিপজ্জনক প্রফেশন। পেটের জন্যে মানুষকে কত কিছুই না করতে হয়।'

বিনয়ের কৌতূহল হচ্ছিল। সে বলে, 'হাঙরটাঙরদের সঙ্গে ওরা কীভাবে লড়াই করে?'

'সেটা ঠিক বলা যাবে না। লড়াইয়ের নির্দিষ্ট কোনও পদ্ধতি নেই। পরিস্থিতি বুঝে ওরা স্ট্রাটেজি ঠিক করে নেয়।'

বিনয় বলল, 'আমার একটা বিশেষ অনুরোধ আছে।'

'হাঁ হাঁ, বলুন না—

'আমি এই শেল কালেক্টিং সম্পর্কে 'নতুন ভারত-এ' লেখা পাঠাতে চাই। কিন্তু নিজের চোখে না দেখলে তো, মানে অভিজ্ঞতা না হলে শুনে শুনে এসব লেখা যায় না। আপনি যদি লা পোয়েদের বলে দেন, ওরা আমাকে ওদের বোটে ঘুরিয়ে সব দেখাবে।'

'অবশ্যই।' বিশ্বজিৎ বিনয়কে দেখিয়ে লা পোয়েদের বললেন, 'উনি আমার বন্ধু। কলকাতার পত্রকার।'

লা পোয়ে বলল, 'জানি বড়ে সাহেব। ওঁর মুখেই শুনেছি।'

'উনি তোমাদের কাজকর্ম দেখতে চান। তোমরা তো এখন এখানেই আছ। ওঁর যখন সময় হবে তোমাদের বোটে তুলে সব দেখিয়ে দেবে। যা জানতে চান, ভালো করে জানাবে। তোমাদের কথা উনি আখবরে লিখবেন। ইন্ডিয়ার হাজারো মানুষ তোমাদের নাম জেনে যাবে।'

লা পোয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে জানায় বড়ে সাহেবের হুকুম নিশ্চয়ই তামিল করা হবে। কলকাতার পত্রকারজি যেদিন চাইবেন সেদিনই তাঁকে জাজিরার (দ্বীপের) চার পাশ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাদের কার্যকলাপ দেখানোর বন্দোবস্ত করবে তারা।

বিনয়ের কৌশলের প্রথম ধাপটা মাপে মাপে খেটে গেল। বিশ্বজিৎ তাঁর কথায় রাজি হয়েছেন। পরের ধাপটা ঠিক করে নিতে হবে লা পোয়ের সঙ্গে। সেটা কোনওভাবেই বিশ্বজিৎকে জানানো হবে। না পরে তিনি নিশ্চয়ই জানতে পারবেন। তখন ঝিনুকের ব্যাপারটা না বলে পারা যাবে না। সব শুনলে তিনি বিরক্ত তো হবেনই না, বরং সহানুভূতিই জানানে, এমন বিশ্বাস তার আছে।

লা পোয়েরা লম্বা সেলাম ঠুকে বিশ্বজিতের কাছ থেকে বিদায় নিল। 'অব যাতা হুঁ বড়ে সাহাব।'

লা পেয়োদের এখন কোনওভাবেই ছাড়া যাবে না। তাদের সঙ্গে বোঝাপড়াটা ঠিক করে নিতে হবে। বিনয় বলল, 'আমিও যাই। কালকের সেই লেখাটা ইনকমপ্লিট রয়েছে। ওটা শেষ করে ফেলি গিয়ে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ যান। আমি দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর একটু রেস্ট নিয়ে পোর্ট ব্লেয়ার ফিরে যাব। তার ভেতর যা যা দেবার সব রেডি করে রাখবেন।

বিনয় লা পোয়েদের সঙ্গে রিহ্যাবিলিটেশনের ক্যাম্প অফিসের দিকে হাঁটতে লাগল। চলতে চলতে সমানে বকরবকর করছে লা পোয়ে। তার মুখে অনবরত একই কথা—বিশ্বজিৎ। দুনিয়ায় বিশ্বজিতের মতো মানুষ হয় না। তার কাছে বিশ্বজিৎ ঠিক স্বয়ং ফায়ার (বুদ্ধেদেবের) পরেই। অঢেল এই গুণগানের কারণটাও জানা গেল। ইংরেজ আমলের শেষ দিকে যখন লা পোয়ের সাজা শেষ হয়ে গেছে সেই সময় মধ্য আর দক্ষিণ আন্দামানের কোষ্ট লাইন ইজারা নিয়ে সে 'সিপি' বা শেল তুলে আসছিল। স্বাধীনতার পরও নির্বিঘ্নেই চলছিল তার কাজকর্ম। কিন্তু মাদ্রাজ থেকে একজন শেলের কারবারী এসে দরিয়া ইজারা নেবার জন্য অনেক বেশি দর দিয়ে বসল। সে-ই শেল তোলার কাজটা পেয়ে যেত। এই কারবারের সঙ্গে লা পোয়ের পুরো ফ্যামিলি তো বটেই আর তিন ডাইভার এবং তাদের ঘরবাসী বাচ্চাকাচ্চাদের বাঁচা-মরা নির্ভর করে। কাজটা হাতছাড়া হয়ে গেলে তাদের মহা সংকট। তারা গিয়ে রাহা সাহেবের পা জড়িয়ে ধরেছিল। তাঁর জন্যই শেষ পর্যন্ত 'লিজ'টা পেয়ে যায় লা পোয়েরা। রাহা সাহেবের ওপর তাঁদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। ইত্যাদি ইত্যাদি।

banglabooks.in

এসব আগেও কিছু কিছু বলেছে লা পোয়ে। বিনয় অন্যমনস্কর মতো শুনে যাচ্ছিল। তার ভাবনায় এখন একমাত্র ঝিনুক। বর্মিটাকে না থামালে বিশ্বজিৎ রাহার গুণকীর্তন শেষ হবে না। বিশ্বজিৎকে শ্রদ্ধা করে বিনয়, ভালোবাসে। তিনি মার্কামারা রসকষহীন সরকারি আমলা এবং ম্যাজিস্ট্রেট নন, আগাগোড়া হৃদয়বান মানুষ। খুবই সহানুভূতিপ্রবণ। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে যদি লা পোয়ে সমানে বলে যায়, আর বলতে বলতে সমুদ্রে গিয়ে মোটর বোটে উঠে পড়ে, তার কথাটাই জানানো যাবে না।

বিনয় লা পোয়ের বকবকানির মধ্যেই এক সময় বলে ওঠে, 'আমার একটা কথা ছিল—'

এবার যেন বিনয় সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে লা পোয়ে। সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। 'হাঁ-হাঁ, বোলিয়ে—'

'আপনারা তো এই এলাকায় দশ পনেরো দিন থাকছেন?'

'হাঁ। সমুন্দরে চক্কর দিতে দিতে 'সিপি' তুলতে হবে।'

'তারপর কোথায় যাবেন?'

'মিডল আন্দামানে।'

আশায় উত্তেজনায় দু'চোখ চকচক করে ওঠে বিনয়ের। সে জিগ্যেস করে, 'ওখানে কতদিন থাকবেন?'

লা পোয়ে জানায়, 'লগভগ দো হপ্তা। ওখানে গিয়ে সিপি তুলব।'

গলা নামিয় বিনয় জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি জানেন মিডল আন্দামানে কোথায় কোথায় রিফিউজিদের সেটেলমেন্ট বসছে?'

লা সোয়ের অহমিকায় বুঝি বা একটু বাঁধল। সে বলে, 'লগভগ তিশ সাল ইস জাজিরামে (দ্বীপপুঞ্জে) গুজর গেল। এখানকার না জানি কী? আমার আঁখকে ফাঁকি দিয়ে আন্দামানে কুছু হতে পারে না।'

'কতগুলো সেটেলমেন্ট বসছে?'

একটু ভেবে লা পোয়ে জানায়, সবে মধ্য আন্দামানে উদ্বাস্তুদের উপনিবেশ পত্তনের কাজ শুরু হয়েছে। খুব সম্ভব তিনটে কি চারটে কলোনির জন্য জঙ্গল সাফ করা হয়েছে। পাকিস্তানের দু-তিন শো ফ্যামিলিকে ওখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। লা পোয়ে খবর পেয়েছে, জাহাজ বোঝাই করে আরও অনেক উদ্বাস্তু আসবে। তাদের জন্য আরও জঙ্গল নির্মূল করা হবে, ইত্যাদি।

যেসব তথ্য লা পোয়ের কাছে পাওয়া গেল সেগুলো নতুন কিছু নয়, এই মুহূর্তে যেমন জরুরিও নয়। আগেই বিভাস নিরঞ্জন এবং বিশ্বজিৎ রাহার কাছে সে শুনেছে। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'রাহাসাহেব বলে দিয়েছেন সময় পেলে আপনাদের বোটে করে ঘুরব।'

'হাঁ-হাঁ এই তো বললেন, দশ মিনিটও হয়নি। আমার ইয়াদ আছে। যেদিন বলবেন আপনাকে বোটে তুলে আমাদের কামকাজ দেখাব।'

'সে তো দেখবই। আমার একটা কথা রাখতে হবে কিন্তু।

'হাঁ—হাঁ জরুর। আপনি বড়ে সাহাবের দোস্ত, আমাদের জাজিরার মেহমান। যা বলবেন তা-ই করব।'

'আপনারা দু'সপ্তাহ পর যখন মিডল আন্দামানে যাবেন আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে হবে।'

'কোই বাত নেহি। আলবত নিয়ে যাব।'

'আপনাদের কাজ তো দেখবই। মিডল আন্দামানে যেখানে যেখানে রিফউজি কলোনি বসছে সেই সব জায়গাতেও কিন্তু নিয়ে যেতে হবে।'

'ওখানকার সেটেলমেন্ট নিয়ে আপনাদের আখবরে লিখবেন বুঝি?'

মূল উদ্দেশ্য দু'টো। পুনর্বাসন নিয়ে লেখালেখি তো আছে ই, ঝিনুককে খুঁজে বার করাটা কম জরুরি নয়। বরং এই মুহূর্তে অনেক বেশি প্রয়োজন। যে মেয়েটা সেই কোন ছেলেবেলা থেকে তার জীবনে শ্বাসবায়ুর মতো জড়িয়ে আছে তাকে 'রস' আইল্যান্ডে দেখার পর থেকে বুকের ভেতরটা কতখানি উতলা হয়ে রয়েছে সেটা শুধু সে-ই জানে।

লা পোয়েকে কাগজে লেখার কথাই শুধু বলল বিনয়। ঝিনুকের ব্যাপারটা পুরোপুরি গোপন রাখল। বিশ্বজিৎ বলেছিলেন, তাকে অবশ্যই মিডল আন্দামানে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। করতেনও। সেজন্য কতদিন অপেক্ষা করতে হবে, কে জানে। কিন্তু অযাচিতভাবে এই সেল কালেক্টরগুলো এসে পড়েছে। এতবড় একটা সুযোগ কোনওক্রমেই হাতছাড়া করা যাবে না।

বিনয় জিজ্ঞেস করল, 'মিডল আন্দামানে তো এক সপ্তাহ থাকবেন। তারপর?'

লা পোয়ে বলল, 'ফির সাউথ আন্দামানে এসে সিপি তুলব।' সে বুঝিয়ে দেয়, এইভাবে কয়েকদিন দক্ষিণ আন্দামান, কয়েকদিন মধ্য আন্দামানে ঘুরে ঘুরে তারা পুরো সিজন ধরে সমুদ্রের তলা থেকে শঙ্খ কড়ি টার্বো ট্রোকাস নটিনাস ইত্যাদি তুলে আনে। বিনয় বলল, 'ওখানে কলোনি বানানো হচ্ছে। নিশ্চয়ই সেসব কাজ দেখাশোনার জন্য সরকারি ক্যাম্প অফিস বসেছে।'

'জি, হাঁ। আমি ওখানকার সি এ-কে (কলোনাইজেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট) চিনি। নাম বিজয় জেয়ারদার। বহুৎ আচ্ছা আদমি।'

বিনয় উৎসাহিত হয়ে ওঠে, শুধু মধ্য আন্দামানে গেলেই তো হয় না। গেলাম, গিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ঝিনুকের সন্ধান পেয়ে যাব তা তো আর হয় না। খোঁজাখুঁজি করতে দু-চার দিন কি তারও বেশি সময় লেগে যেতে পারে। সেখানে থাকবে কোথায়? জেফ্রি পয়েন্টের ক্যাম্প অফিসের মতো ওখানকার ক্যাম্প অফিসই একমাত্র ভরসা। লা পোয়ে জানিয়েছে বিজয় জোয়ারদার মানুষটি ভালো। কিন্তু তার মতো অচেনা উটকো লোককে সে কি ক্যাম্প অফিসে থাকতে দেবে?

বিনয় বলল, 'আমাকে কিন্তু বিজয় জোয়ারদারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে হবে।'

লা পোয়ে মাথা হেলিয়ে দেয়।—'জরুর।'

একটু ভেবে বিনয় বলল, 'আমি ওখানে কয়েকদিন থাকতে চাই। ওরা থাকতে দেবে কি?'

এর চেয়ে বিস্ময়কর কথা আগে আর বুঝি কখনও শোনেনি লা পোয়ে। দু'চার লহমা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে সে। তারপর যা বলে তা এইরকম। বিনয় রাহা সাহেবের দোস্ত, আখবরে কাজ করে, এসব শোনার পর তাকে মাথায় করে রাখবে বিজয় জোয়ারদার। চিন্তার কারণ নেই।

বিনয়ের দুর্ভাবনা কেটে যায়। সে বলে, 'আপনারা সিপি তুলবেন, আমি আমার কাজ সারব। তারপর আমাকে আবার এই জেফ্রি পয়েন্টে পৌঁছে দিয়ে যেতে হবে।'

'আলবত।'

কথায় কথায় ওরা বিচে চলে এসেছিল। লা পোয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে সেলাম ঠুকে বলল, 'আজ আমরা যাই। দশ-পন্দ্র রোজ বাদ এসে আপনাকে নিয়ে যাব।'

বিনয় মাথা কাত করে একটু হাসে। বিশ্বজিৎ রাহার বন্ধু হওয়ার কারণে আন্দামানের লোকজন তাকে যথেষ্ট খাতির করছে।

লা পোয়েরা সমুদ্রের জলে নেমে তাদের মোটর বোটে নিয়ে ওঠে। আর বিনয় ফিরে আসতে থাকে।

ক্যাম্প অফিসের কাছাকাছি যখন পৌঁছে গেছে; কোত্থেকে পরিতোষ দৌড়াতে দৌড়াতে এসে হাজির। বলল, 'আপনে সকালের খাওয়া খান নাই। আপনেগো ঘরে পাঠাইয়া দিমু?'

ঘুমভাঙার পর সমুদ্রে মুখ ধুতে গিয়েছিল বিনয়, তারপর লা পোয়েদের সঙ্গে দেখা, তাদের নিয়ে বিশ্বজিতের সঙ্গে দেখা করানো, নানারকম কথাবার্তা, এসবের মধ্যে বেলা অনেকটা চড়ে গিয়েছিল। খাওয়ার কথা একেবারেই খেয়াল ছিল না।

যে ক'দিন জেফ্রি পয়েন্টে বিনয় থাকবে তার সুবিধা-অসুবিধার দিকে পরিতোষকে নজর রাখতে বলেছিলেন বিশ্বজিৎ। যতটা সম্ভব বিনয়ের স্বাচ্ছন্দ্যের যেন ব্যবস্থা করা হয়। পরিতোষ সেটা ভোলেনি, অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছে। সকালে সবার

banglabooks.in

খাওয়া হয়ে গেছে, শুধু বিনয়ই খেতে আসেনি। সেটা লক্ষ রেখেছিল পরিতোষ।

বিনয় বিব্রতভাবে বলল, 'না—না, পাঠাতে হবে না, আমি নিজে গিয়ে খেয়ে আসছি।'

ক্যাম্প অফিসের সামনে যেখান থেকে উদ্বাস্তু এবং পুনর্বাসন বিভাগের কর্মীদের চারবেলা খাবার দেওয়া হয়, সেখানে চলে এল বিনয়। জায়গাটা প্রায় শুনশান। দু'চারজন মুখ চেনা কর্মী ছাড়া অন্য কেউ নেই। পরিতোষ ব্যস্তভাবে তাদের বলল, 'বিনয়বাবুর খাওন হয় নাই। তেনারে খাইতে দাও।'

সকালের খাবার হল হাতে-গড়া রুটি-তরকারি আর চা। কোনও কোনওদিন চিঁড়ে-গুড়-টুড়। আজ রুটি হয়েছিল। শালপাতার থালায় খাবার সাজিয়ে বিনয়কে দেওয়া হল।

তাড়াহুড়ো করে খাওয়া সেরে বিশ্বজিতের ঘরে এসে কালকের সেই লেখাটা নিয়ে বসে পড়ল সে। প্রতিবেদনটা শেষ করতে করতে ঘণ্টাদেড়েক লেগে গেল। সেটা একটা খামে পুরে মুখ আঠা দিয়ে আটকে দিল। খামের ওপর প্রসাদের নাম-ঠিকানা লিখে দিল।

আগেও দুটো প্রতিবেদন এবং সুধা আর আনন্দকে চিঠি লিখে খামে ভরে রেখেছিল। তিনটে প্রতিবেদন এবং দু'খানা চিঠি—সব মিলিয়ে পাঁচটা খাম।

লেখালেখি শেষ হতে সূর্য মাথার ওপর সরাসরি উঠে এল। আর তখনই নানা মানুষের গলা কানে আসতে লাগল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বিনয় দেখতে পায়, উদ্বাস্তু এবং পুনর্বাসনের কর্মীরা জঙ্গল থেকে ফিরে আসছে। সবাই একসঙ্গে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। ফলে যে শব্দপুঞ্জের সৃষ্টি হচ্ছে সেটা লক্ষ কোটি মাছির ভনভনানির মতো শোনাচ্ছে। বিনয় বুঝতে পারে এ বেলার মতো জমি বিলি শেষ। চান-খাওয়া এবং খানিকক্ষণ জিরিয়ে নেবার পর ওবেলা ফের সবাই জঙ্গলে গিয়ে দ্বিতীয় দফার কাজ শুরু করবে।

বিশাল জনতার সামনের দিকে রয়েছেন বিশ্বজিৎ। তিনি সোজা ঘরে চলে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি লেখা শেষ?'

বিনয় জানায়, 'এইমাত্র শেষ করলাম। চিঠি এবং রিপোর্টের খামগুলো আলাদা আলাদা করে রেখে দিয়েছি।'

'ফাইন। আমাকে দিন। সুটকেসে ভরে ফেলি।'

চান-খাওয়া চুকিয়ে ঘণ্টা দেড়েক জিরিয়ে নিলেন বিশ্বজিৎ। এর মধ্যে একটা লম্বা ফর্দ দিয়ে গিয়েছিল পরিতোষ। এখানকার ভাঁড়ার প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। বুড়োধুড়ো বাচ্চা-কাচ্চা, যুবকযুবতী ইত্যাদি নানা বয়সের কয়েকশো ছিন্নমূল মানুষ ছাড়াও রয়েছে পুনর্বাসন এবং বনবিভাগের কর্মীরা। এতগুলো লোকের জন্য রোজ চারবেলা চুলো ধরাতে হবে। হিসেব করে পনেরো দিনের মতো চালডাল সবজি তেল মশলা চা চিনি গুঁড়ো দুধ, এমনি কতটা করে দরকার লিখে দিয়েছে পরিতোষ। রসদ ফুরবার দু-চার দিন আগে আবার পোর্ট ব্লেয়ারে নতুন তালিকা পাঠিয়ে দেবে সে।

বেলা পড়ে এলে বিশ্বজিৎ তাঁর জিপে উঠে পড়লেন। সঙ্গে গেল বিভাস আর নিরঞ্জন। বিনয়, পরিতোষ এবং দু-তিনজন কর্মী ওদের সঙ্গে সঙ্গে জিপটা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেই পর্যন্ত গেল। বাকি সবাই জঙ্গলে আগেই চলে গিয়েছিল। জমি বিলির কাজ একবেলার জন্যও বন্ধ রাখা যাবে না। বিশ্বজিতের কড়া নির্দেশ দশ দিনের ভেতর মাপজোক করে সীমানা বরাবর বাঁশের খুঁটি পুঁতে প্রতিটি উদ্বাস্তু পরিবারকে বরাদ্দ জমি বুঝিয়ে দিতে হবে। কোনওরকম ঢিলেমি বরদাস্ত করা হবে না। দশ মানে দশ দিনই। তার বেশি একদিনও যদি দেরি হয় তার ফলাফল হবে মারাত্মক। পুনর্বাসন দপ্তরের কর্মীরা হাড়ে হাড়ে জানে রাহাসাহেব কী ধরনের জবরদস্ত অফিসার। এক সময় ড্রাইভার স্টার্ট দিল। বিশ্বজিৎদের গাড়িটা পাহাড়ের গা বেয়ে পেঁচানো রাস্তায় পাক খেতে খেতে একটা বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

॥ ছয় ॥

বিশ্বজিৎ চলে যাবার পর দিন তিনেক কেটে গেছে। এর মধ্যে বিশাল বিশাল মহাবৃক্ষ তো বটেই, ছোট মাঝারি গাছগুলোর নামও ধনপতের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে বিনয়। শুধু তা-ই না, ঝোপঝাড় লতাগুল্ম সবই চিনিয়ে দিয়েছে ধনপত। সেই কতকাল আগে কালাপানির সাজা খাটতে এখানে এসেছিল সে। বনবিভাগে চেনম্যানের কাজ নিয়ে দ্বীপে দ্বীপে ঘুরতে ঘুরতে আন্দামানের আদিম অরণ্যের নাড়িনক্ষত্র জেনে গেছে সে।

সেই সকাল থেকে বনদপ্তরের একদল কর্মী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড করাত দিয়ে বিশাল বিশাল মহাবৃক্ষ— যেমন দিদু চুগলুম প্যাডক বা ঝাড়ালো রেনট্রিগুলো কেটেই চলেছে, কেটেই চলেছে। সমস্ত বনভূমি জুড়ে আওয়াজ উঠছে— ঘসর ঘস, ঘসর ঘস।

অন্যদিকে জমি মেপে উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিলির কাজও চলছে পুরোদমে। যারা যারা জমি পেয়েছে তারা কোদাল দা করাত ইত্যাদি হাতিয়ার দিয়ে ঝোপঝাড় ছোট গাছ টাছ নির্মূল করার কাজ শুরু করে দিয়েছে। যার নামে জমি দেওয়া হল সে-ই শুধু নয়, তার ফ্যামিলির সবাই ছেলেমেয়ে বউ— তার সঙ্গে হাত লাগিয়েছে। সব চেয়ে বেগ দিচ্ছে উদ্দাম জলডেঙ্গুয়া। অর্থাৎ বনতুলসীর ঝাড়গুলো। সেগুলোর শিকড় মাটির গভীরে বহুদূর অবধি ছড়িয়ে আছে। উপড়ে ফেলা কি মুখের কথা!

সেদিন যে চারটে হাতি নিয়ে তিরুর থেকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের আজীব সিংরা এসেছিল তারাও হাত-পা গুটিয়ে বসে নেই। এখানে পৌঁছুবার পরদিন থেকেই হাতিগুলোকে সে এবং তার সঙ্গীরা কাজে লাগিয়ে দিয়েছে।

যে মস্ত মস্ত ট্রাকে চাপিয়ে হাতিগুলো আনা হয়েছিল সে দুটো ব্যারাকগুলোর ডান পাশে, খানিকটা দূরে নামিয়ে আনা হয়েছে। তারপর ট্রাকের পেছন দিকটা খুলে একটা কংক্রিটের ঢালু পাটাতন মাটিতে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যেসব বড় গাছ আগেই কাটা হয়েছিল সেগুলোর খণ্ড খণ্ড গুঁড়ি, মোটা মোটা ডাল চারিদিকে ডাঁই করে রাখা আছে।

দুই মাহুত জিভ দিয়ে অদ্ভুত টকাস টকাস শব্দ করতেই তাদের দুই হাতি থামের মতো ভারী ভারী পা দিয়ে ধাক্কা মারতে মারতে ট্রাকের পাটাতন অবধি নিয়ে আসছে; তারপর শুঁড়ে পেঁচিয়ে পাটাতনের মসৃণ গড়ানে গায়ের ওপর দিয়ে ঠেলে ঠেলে ট্রাকে তুলে দিচ্ছে। ট্রেনিং পাওয়া শিক্ষিত হাতি। মাহুতের জিভের আওয়াজে কী সংকেত থাকে, সেটা নিমেষে তারা বুঝে ফেলে। বিনয় লক্ষ করেছে ট্রাক দুটো বোঝাই হলেই ড্রাইভার আর বনদপ্তরের চারজন কর্মী সে দুটো নিয়ে চলে যাচ্ছে। সে শুনেছে সরকারি করাত-কলে গাছের গুঁড়িটুঁড়ি পৌঁছে দিয়ে তারা ফিরে আসছে। এভাবে দু'খেপ তারা গেল এবং এল। যতদিন গাছ কাটা হবে লরিগুলোকে যাতায়াত করতেই হবে।

দু'টো হাতি গাছের গুঁড়ি ট্রাকে তোলে। বাকি দুটোর কাজ অন্যরকম। যেসব বড় গাছ কাটার পর শিকড়বাকড় সমেত খানিকটা অংশ মাটির ওপরে এবং নিচে থেকে গেছে সেগুলোও তাদের দিয়ে পুরোপুরি উপড়ে ফেলা হচ্ছে। পদ্ধতিটা এইরকম। কেটে ফেলার পর মাটির ওপরে তিন-চার হাত অংশটা থাকছে তাতে মোটা বঁড়শির মতো লোহার মস্ত হুক ঢুকিয়ে তার সঙ্গে স্টিলের শিকল আটকে হাতির গলায় সেই শিকলের একটা দিক বেঁধে দেওয়া হচ্ছে; তারপর সহিস জিভ চকচক করে সুরেলা আওয়াজ করে চলেছে। এই শব্দটাও সংকেত। হাতি দুটো প্রবল শক্তিতে টানাটানি করে শিকড়টিকড় নিয়ে গাছের শেষ অংশটা তুলে ফেলছে। সেগুলো ট্রাকে তুলে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

জেফ্রি পয়েন্টের পাহাড় সমুদ্র এবং দুর্গম অরণ্যে ঘেরা এই এলাকাটা জুড়ে সকাল থেকে সন্ধের আগে পর্যন্ত তুমুল কর্মকাণ্ড চলছে। দক্ষিণ আন্দামানের এমন একটা এলাকায় নতুন সেটেলমেন্ট গড়ে তোলা কি সহজ কাজ!

বিনয় রোজ সকালে রিহ্যাবিলিটেশনের কর্মী এবং উদ্বাস্তুদের

banglabooks.in

সঙ্গে জঙ্গলে চলে যায়। জমি মাপামাপি দেখে। দুপুরে সবার সঙ্গে ফিরে চান-খাওয়া এবং বিশ্রাম। তারপর আবার জঙ্গলে গিয়ে ঢোকা। দিনের আলো যতক্ষণ থাকে সেখানেই কাটিয়ে আসে। রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার পর বিশ্বজিতের ঘরে এসে সারাদিনে যা-যা দেখল তার প্রতিবেদন লিখতে বসে।

বিশ্বজিৎ পোর্ট ব্লেয়ার চলে গেছেন। পুরো ঘরখানা এখন একা বিনয়ের দখলে।

ওধারে ব্যারাক দুটোর সামনের দিকে মস্ত ফাঁকা চত্বরটায় কাঠের মোটা মোটা অগুনতি খুঁটি পুঁতে তার ওপর চেরা বাঁশের পাটাতন বসিয়ে বিরাট মঞ্চ বানিয়েছে মোহনবাঁশিরা। শ'খানেক মানুষ সেখানে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে পারে।

রাত্তিরে খাওয়াদাওয়া চুকলে মোহনবাঁশি সহদেবরা একতারা দোতারা সারিন্দা, এমনি সব বাদ্যযন্ত্র নিয়ে আজকাল রোজই গানবাজনার আসর বসাচ্ছে।

বিশ্বজিতের ঘরে বসে রিপোর্ট লিখতে লিখতে গান শোনে বিনয়। এই নির্জন দ্বীপ মায়াবী সুরের দোলায় যেন অলীক কোনও স্বপ্নের দেশ হয়ে ওঠে। কী ভালো যে লাগে বিনয়ের।

বিশ্বজিৎ চলে যাবার তিন দিন বাদে দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর সবার সঙ্গে রোজকার মতো জঙ্গলে গেছে বিনয়। পুরোদমে কাজ চলেছে চারদিকে। হঠাৎ গাড়ির আওয়াজে ডান দিকে তাকায় সে। ওধারে উপত্যকার তলায় উদ্বাস্তুদের জন্য লম্বা লম্বা ব্যারাক আর সেটেলমেন্টের ক্যাম্প অফিস। সে সেবের পেছন দিকে পাহাড়।

বিনয় দেখতে পেল, একটা জিপ পাহাড়টার গা বেয়ে নেমে আসছে। বিশ্বজিৎ বা পুনর্বাসন দপ্তরের অন্য কোনও অফিসারের তো আজ আসার কথা নয়। তাঁরা এলে কলোনাইজেশন অ্যাসিস্টান্ট পরিতোষ বণিককে আগেভাগেই জানিয়ে দেওয়া হয়। পরিতোষের সঙ্গে প্রায় সারাক্ষণই তো কাটে বিনয়ের। কেউ আসবেন, এমন খবর পেলে সে নিশ্চয়ই জানিয়ে দিত। কে আসতে পারে তাহলে?

বিনয় লক্ষ করল, জিপটা ক্যাম্প অফিসের সামনে এসে থামল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা থেকে যিনি নামলেন তাঁর বয়স তিপ্পান্ন-চুয়ান্নর মতো। মাঝারি হাইট। মাথায় কাঁচাপাকা এলোমেলো চুল, চোখে চশমা। পরনে পাজামা এবং খাটো ঝুলের শার্ট। দূর থেকে এর বেশি আর কিছু বোঝা গেল না।

ক্যাম্প অফিসের কাছাকাছি দু-তিনজন কর্মী কী করছিল, তারা দৌড়ে বয়স্ক লোকটির কাছে চলে এল। তাদের সঙ্গে দু-এক মিনিট কী কথা বললেন, তারপর জঙ্গলের দিকে লম্বা লম্বা পায়ে হাঁটতে শুরু করলেন। কর্মী দুটি তাঁর পিছুপিছু আসছিল। তিনি হাত তুলে তাদের থামিয়ে দিলেন। বোঝা গেল, তিনি একাই জঙ্গলে আসতে চান, পথ দেখাবার জন্য কারওকে দরকার নেই।

কর্মী দু'জন আর এগুল না। মাঝবয়সি লোকটি সোজা জঙ্গলে চলে এলেন।

তাঁকে দেখে আমিন লাডিন, চেনম্যান ধনপত এবং পুনর্বাসনের অন্য কর্মীরা কাজকর্ম ফেলে দৌড়ে এল। সসম্ভ্রমে মাথা ঝুঁকিয়ে কেউ বলল, 'সালাম', কেউ বলল, 'নমস্তে'— কেউ বলল, 'আপকা তবিয়ত ঠিক হ্যায় তো?'

মধ্যবয়সি মানুষটি যে সামান্য লোক নন, লা ডিনদের সসম্ভ্রমে কথা বলতে দেখে সেটা আন্দাজ করতে পারছিল বিনয়।

কাছাকাছি আসায় মানুষটিকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। রোগা, ক্ষয়াটে চেহারা, গাল ভাঙা, হাতের শিরাগুলো প্রকট। কণ্ঠার হাড় চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। আরও একটা ব্যাপার চোখে পড়ল। তাঁর দুই হাতের কবজিতে মোটা কালচে দাগ। অনেকদিন হাতে গোলাকার ধাতুর জিনিস পরিয়ে রাখলে যেমন হয়, ঠিক সেইরকম আর কী।

মধ্যবয়সী, দেখা গেল, সবাইকে চেনেন। প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে জিগ্যেস করলেন, 'তুমি কেমন আছ লা ডিন? তুমি কেমন আছ ধনপত?' ইত্যাদি।

সবাই জানায়, মাঝবয়সির মেহেরবানিতে তারা ভালোই আছে।

বয়স্ক মানুষটি বললেন, 'কাজ বন্ধ করে গল্প নয়। তোমরা যাও। পরে কথা হবে।'

লা ডিনদের সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলছিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর চোখ বারবার বিনয়ের দিকে চলে যাচ্ছিল। ভিড়টা হালকা হয়ে গেলে তিনি এগিয়ে এলেন। একটু হেসে বললেন, 'আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, তুমি নিশ্চয়ই বিনয়। কলকাতার কাগজের রিপোর্টার?'

বিনয় অবাক। বলল, 'আপনি আমাকে চিনলেন কী করে? আগে আমাদের কখনও দেখা হয়েছে বলে তো মনে হয় না।'

'না, হয়নি। তবু তোমার কথা আমি জানি। আমার নাম শেখরনাথ রাহা; হয়তো নামটা শুনেছ। আমি বিশ্বজিতের কাকা। বিশুর কাছে তোমার কথা শুনেছি।'

বোঝাই যায় বিশ্বজিতের ডাকনাম বিশু। এই মানুষটি ইংরেজ রাজত্বের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন। তারপর দ্বীপান্তরী সাজা দিয়ে তাঁকে আন্দামানে পাঠানো হয় উনিশশো পঁচিশে। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে এবং পরে কত বিপ্লবী ভারতের মেনল্যান্ডে ফিরে গেছেন কিন্তু শেখরনাথ ফেরেননি। বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপপুঞ্জেই থেকে গেছেন।

সাভারকার, উল্লাসকর দত্ত থেকে শেখরনাথ পর্যন্ত কত বিপ্লবীর নামই তো শুনেছে বিনয়। এঁরা সবাই পরমাশ্চর্য রূপকথার সব নায়ক। অসমসাহসী, আদর্শবাদী, আদ্যোপান্ত দেশপ্রেমিক। ভারতকে স্বাধীন করাই ছিল তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। যে ইংরেজদের রাজত্বে কোনওদিন সূর্যাস্ত হত না সেই বিপুল অপরাজেয় শক্তির বিরুদ্ধে দুর্জয় মনোবলে এঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। মৃত্যু এঁদের কাছে ছিল নেহাতই ছেলেখেলার জিনিস। মহা কৌতুকে তিন তুড়িতে মৃত্যুর চিন্তাকে তাঁরা উড়িয়ে দিতেন। বিচারক যাবজ্জীবন কারাবাস বা মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিলে এঁরা হেসে হেসে গড়িয়ে পড়তেন। যেন এরচেয়ে মজার কথা ভূভারতে কেউ কোনওদিন শোনেনি।

এইসব মরণজয়ী বিপ্লবীদের একজন শেখরনাথ। মেনল্যান্ডে সত্যাগ্রহ করে জেল খেটেছে, এমন কয়েকজনকে আগে দেখেছে বিনয় কিন্তু কালাপানি পার হয়ে সেলুলার জেলে বন্দি ছিল, এমন কারও সঙ্গে কথাও হয়নি। অবাক বিস্ময়ে শেখরনাথের দিকে তাকিয়ে থাকে বিনয়। বুকের ভেতর অদ্ভুত এক শিহরন; গায়ে যেন কাঁটা দিচ্ছিল তার।

বিহ্বল ভাবটা কাটিয়ে উঠতে একটু সময় লাগল। তারপর ঝুঁকে শেখরনাথের পা ছুঁতে যাচ্ছিল। শেখরনাথ তার দু'কাঁধ ধরে তুলে ধরে হেসে হেসে বললেন, 'থাক থাক। পায়ে ধুলো-ময়লা লেগে আছে। হাত দিলে নোংরা লেগে যাবে।'

বিনয় বলল, 'বিশ্বজিৎবাবুর মুখে শুনেছিলাম, খুব শিগগিরই আপনি এখানে আসবেন। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। রোজই ভাবি, এই বুঝি এলেন।'

'বিশু বলেনি, আমি লিটল আন্দামানে গিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বলেছেন। সেই দ্বীপটা কত দূরে?'

'পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ষাট-পঁয়ষট্টি মাইল হবে। ওটাই হল আন্দামানের সাদার্নমোস্ট আইল্যান্ড। ওখানে কারা থাকে জানো?'

'না। আমি তো এই প্রথম আন্দামানে এসেছি। পোর্ট-ব্লেয়ারে নামার পরই তো জেফ্রি পয়েন্টে চলে এলাম। আর কোথাও যাবার সময়ই পাইনি।'

'তা ঠিক। লিটল আন্দামানে থাকে ওঙ্গেরা। আন্দামানের আদিম ট্রাইবদের একটা। এরা কালো কালো পিগমি। সাড়ে চার ফিটের মতো হাইট। সংখ্যায় কত জানো? মাত্র চারশো একান্ন। ক্রমশ এরা কমে আসছে। ভয় ছিল, হয়তো একদিন ট্রাইবটা আর থাকবে না। একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু হঠাৎ খবর পেলাম, ওদের দুটো বাচ্চা হয়েছে। শুনে ভীষণ আনন্দ হল,

banglabooks.in

জেলেদের ট্রলারে চেপে চলে গেলাম। তাছাড়া যাবার আরও একটা কারণও ছিল।'

বিনয় উৎসুক চোখে তাকিয়েই থাকে।

শেখরনাথ বলতে লাগলেন, 'হাজার হাজার ছোট কচ্ছপ সমুদ্র সাঁতরে এই সময়টা লিটল আন্দামানে আর নিকোবরে বালির চড়ায় ডিম পাড়তে আসে। সে একটা আশ্চর্য দৃশ্য। একসঙ্গে এত কচ্ছপ, কল্পনাও করতে পারবে না। চোখ ফেরানো যায় না।'

'কচ্ছপের ঝাঁক দেখলেন?'

'দেখলাম তো।'

এমন এক বিপ্লবী, যিনি বন্দুক পিস্তল হাতে ইংরেজ পুলিশের সঙ্গে মরণপণ লড়াই করেছেন, তিনিই কিনা ওঙ্গেদের বাচ্চা আর কচ্ছপদের ডিম পাড়া দেখার জন্য জেলেদের ট্রলারে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সেই কতদূরে চলে গিয়েছিলেন! বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা থাকে না বিনয়ের। হঠাৎ কিছু মনে পড়ায় সে চকিত হয়ে ওঠে, 'আপনি যে ওঙ্গেদের ওখানে চলে গেলেন বিপদ হতে পারত তো?'

একটু অবাক হয়েই শেখরনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'কীসের বিপদ?'

'এখানকার ট্রাইবরা তো ভীষণ হিংস্র। তারা— বিনয়কে হাত তুলে থামিয়ে দিলেন শেখরনাথ। জানালেন ওঙ্গেরা খুবই নিরীহ। শান্ত। মাত্র কিছুদিন হল আগুন ব্যবহার করতে শিখেছে। তির দিয়ে সমুদ্র থেকে মাছ শিকার করে আগুনে ঝলসে খায়। শেখরনাথ অনেকবার লিটল আন্দামানে গেছেন। তাঁকে দেখলে ওরা খুশি হয়।

হঠাৎ কয়েকদিন আগের সেই রাতের ভয়ংকর দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে আসে। বিনয় বলে, 'কিন্তু—'

'কী?'

'এখানকার জঙ্গলে যে ট্রাইবটা আছে তারা কিন্তু ভীষণ হিংস্র।'

'তুমি জারোয়াদের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ।'

সেদিন রাতে আচমকা এই সেটেলমেন্টে হানা দিয়ে জারোয়ারা আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছিল সেটা সংক্ষেপে জানিয়ে বিনয় বলল, 'রিফিউজিরা তো ওই ঘটনার পর জেফ্রি পয়েন্টে এক মুহূর্তও থাকতে চাইছিল না। পারলে সেই রাত্তিরেই সবাই কলকাতায় ফিরে যায়। বিশ্বজিৎবাবু বিভাসবাবু নিরঞ্জনবাবুরা অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে তাদের ঠান্ডা করেন।'

একটু চুপ করে থাকেন শেখরনাথ। তারপর বলেন, 'জারোয়ারা ওঙ্গেদের মতো শান্তশিষ্ট নয়। ওরা খুবই উগ্র ধরনের। তার কারণও আছে।'

বিনয় উৎসুক হল।— 'কী কারণ?'

শেখরনাথ বললেন, 'তুমি তো উদ্বাস্তুদের সঙ্গে এই খেপে কলকাতা থেকে এসেছ। প্রথমে 'রস' আইল্যান্ডে নেমেছিলে। তারপর এসেছিল পোর্টব্লেয়ারের এবারডিন মার্কেটের সামনে। তাই তো?' জারোয়াদের প্রসঙ্গে এসব কথা আসছে কেন! বুঝতে পারল না বিনয়। শুধু বলল, 'হ্যাঁ।'

'সেলুলার জেল তৈরি হবার আগে ইংরেজ পুলিশ প্রায় চল্লিশজন জারোয়াকে ধরে এনে গুলি করে মারে। সেই থেকে প্রচণ্ড হিংস্র হয়ে উঠেছে ওরা। তারা চায় না, বাইরের থেকে সো-কলড সভ্য জগতের কেউ এসে তাদের জঙ্গল পাহাড় দখল করে বসুক। অনেকদিনের সেই ঘটনা। কিন্তু জেনারেশনের পর জেনারেশন তারা ক্রোধটা পুষে রেখেছে।'

'ইংরেজ পুলিশ জারোয়াদের খুন করেছিল কেন?'

'সেসব পরে শুনো। চল, সেটেলমেন্টের কাজ দেখি। সেই সঙ্গে তোমার কথাও শুনব। বিশু তোমার সম্পর্কে কিছু কিছু বলেছে, তবে আমি ডিটেলে সব শুনব।'

'কিন্তু তার আগে আপনার কথা শোনাতে হবে। সেই যে বাইশ-তেইশ বছর আগে সেলুলার জেলে আপনাকে পাঠানো হল তখন থেকে—'

বিনয়কে থামিয়ে দিলেন শেখরনাথ। —'তোমাকে নিয়ে সময় পেলেই একদিন সেলুলার জেলে যাব। তখন সব শুনো—'

সেলুলার জেল দেখতে যাবার কথা বিশ্বজিতের সঙ্গে আগেই হয়েছিল। চিফ রিপোর্টার প্রসাদদা, নিউজ এডিটর তারাপদ ভৌমিক তো বটেই 'নতুন ভারত'-এর মালিক এবং সম্পাদক জগদীশ গুহঠাকুরতা বার বার বিনয়কে বলে দিয়েছিলেন, সেলুলার জেলের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ভারতবর্ষের বাস্তিল এই কুখ্যাত কারাগারের ইতিহাস, কী নির্মমভাবে কয়েদিদের, বিশেষ করে সশস্ত্র বিপ্লবীদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালানো হত তা নিয়ে বিশদভাবে পাঁচ-সাতটা প্রতিবেদন যেন অবশ্যই পাঠায়।

সেলুলার জেলের ইতিহাস নিশ্চয়ই জানাতে পারবেন বিশ্বজিৎ, কিন্তু সেখানে নির্জন সেলে কাটানো এবং অকথ্য নিগ্রহ আর নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করার অভিজ্ঞতা তো তাঁর নেই। সেই কষ্টকর, দুর্বিষহ জীবনের অনুপুঙ্খ বিবরণ দিতে পারবেন শেখরনাথ। তাঁর সময়ে আর কোন কোন বিপ্লবী সেখানে ছিলেন, ছিল কী ধরনের দুর্ধর্ষ খুনি ডাকাতের দল, সব জানা যাবে।

কুখ্যাত এই জেলখানা অপার রহস্যে ঘেরা। মেনল্যান্ডের মানুষজনের মনে এই কারাগার সম্পর্কে শুধুই ত্রাস আর আতঙ্ক। কত করম ভীতিকর জনশ্রুতি যে ভেসে বেড়াত। একজন বিপ্লবী যিনি জীবনের মহা মূল্যবান সময় অশেষ নির্যাতন সইতে সইতে এখানে ক্ষয় করে দিয়েছেন, তিনি তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখাবেন, ভাবতেই স্নায়ুমণ্ডলীতে শিহরন খেলে যেতে থাকে বিনয়ের।

শেখরনাথ সামনের দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। দূরের জঙ্গলে গাছ কাটা চলছে। ডানপাশে চলছে জমি মাপামাপি এবং বরাদ্দ জমির সীমানা বরাবর বাঁশের খুঁটি পোঁতার কাজ। আর যেধারে এর মধ্যেই জমি দেওয়া হয়ে গেছে সেই সব জায়গাতেও কাজ চলছে পুর্ণোদ্যমে। প্রতিটি উদ্বাস্তু পরিবারের লোকজন, দুধের শিশুরা বাদে, বুড়ো ধুড়ো মেয়েপুরুষ সবাই দা কোদাল কুড়াল ইত্যাদি দিয়ে ঝোপঝাড়, ছোট-মাঝারি গাছ, জলডেঙ্গুয়ার উদ্দাম জপল কেটে, উপড়ে সাফ করে ফেলছে।

প্রতিটি জমিতে গিয়ে ছিন্নমূল মানুষগুলোর সঙ্গে আলাপ করছেন শেখরনাথ। নিজের নাম জানিয়ে বলছেন, 'আমি তোমাদের কলোনির কর্তা বিশ্বজিতের কাকা। তোমার নাম কী?'

যাকে জিগ্যেস করা হল, অচেনা প্রৌঢ়টি বিশ্বজিতের কাকা শুনে সসম্ভ্রমে বলে, 'আইজ্ঞা, বিন্দাবন সাহা—'

'দেশ ছিল কোথায়?'

'বরিশাল। গেরামের নাম হরিশ্চন্দপুর।'

'দেশে কী করতে?'

'দোকানদারি। চাউল ডাইল মশল্লাপাতি বেচতাম। আন্ধারমানে জমি চষতে অইবে। ব্যাবসাদার থিকা চাষি বইনা গ্যালাম।'

জমির পর জমি পেরিয়ে যান শেখরনাথ। তাঁর পাশাপাশি হেঁটে চলেছে বিনয়।

শেখরনাথের প্রশ্নের উত্তরে উদ্বাস্তুরা কেউ জানায় তার নাম গণেশ পাল, বাড়ি ফরিদপুর, দেশে মাটির হাঁড়ি পাতিল বানাত, পুজোর মরশুমে গড়ত দুর্গা কালী সরস্বতীর মূর্তি। তারও খানিকটা আক্ষেপ, চোদ্দোপুরুষের কুলকর্ম ছেড়ে তাকেও কৃষক হতে হচ্ছে। দমদমের রিলিফ ক্যাম্পে পচে গলে মরার চেয়ে এ একরকম ভালোই।

কেউ বলল তার নাম রাধেশ্যাম কুণ্ডু, দেশ ছিল ঢাকা, গ্রাম মেদিনীমণ্ডল, পাইকারদের কাছ থেকে ধান চাল কিনে নিয়ে গঞ্জে বেচত। খুবই নগণ্য কারবারি কেউ ক্ষৌরকার বা নাপিত, সাবেক দেশ নোয়াখালি। কেউ ধোপা তার দেশ ছিল বগুড়া। খুলনা যশোরের দু'জন রয়েছে, তারা দেশে বরজে পানের চাষ করে সংসার চালাত। এমনি নানা পেশার মানুষের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে। তবে বেশিরভাগই কৃষিকর্ম করে এসেছে পুরুষানুক্রমে। ফলাত—

banglabooks.in

ধান, পাট, নানা ধরনের রবিশস্য।

উদ্বাস্তুদের সঙ্গে আলাপ করার ফাঁকে ফাঁকে বিনয়ের সঙ্গেও কথা বলছেন শেখরনাথ। —'স্বাধীনতার চেহরাটা কেমন দেখছ বিনয়?' বলে ভুরুদুটো ওপর দিকে তুললেন।

তিনি কী ইঙ্গিত দিয়েছেন মোটামুটি তা আন্দাজ করতে পারছিল বিনয়। তবে উত্তর দিল না।

শেখরনাথ বলতে লাগলেন, 'এই যে মানুষগুলো চোদ্দো পুরুষের ভিটেমাটি খুইয়ে সমুদ্র পেরিয়ে এই সৃষ্টিছাড়া দ্বীপে টিকে থাকার চেষ্টা করছে, এমনটা কি ওরা কোনওদিন ভাবতে পেরেছিল? এ কেমন স্বাধীনতা যার জন্যে নিজের দেশ থেকে উৎখাত হতে হবে?' হঠাৎ কী খেয়াল হতে একটু চুপ করে থেকে এবার বললেন, 'আঁরে কাকে কী বলছি! বিশুর কাছে শুনেছি, তুমিও তো মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে পাকিস্তান থেকে চলে এসেছ। যন্ত্রণাটা কতখানি তা তুমি জানো।'

আস্তে মাথা নাড়ে বিনয়।

শেখরনাথ থামেননি, 'আন্দামানে যে কয়েকশো ফ্যামিলি এসেছে, আরও হাজারখানেক ফ্যামিলি আসবে— এরা হয়তো চাষ আবাদ করে বেঁচে যাবে। কিন্তু কলকাতায় আর পশ্চিমবাংলার নানা জায়গায় রিলিফ ক্যাম্পে, রাস্তায়, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যে লাখ লাখ মানুষ পোকামাকড়ের মতো পড়ে রয়েছে তাদের কী হবে? পশ্চিমবাংলা কতটুকু স্টেট? তেত্রিশ হাজার স্কোয়ার মাইলের মতো এরিয়া। সেখানে এত লোকের জায়গা হবে কোথায়? কী হবে এদের ভবিষ্যৎ?'

তিনি আরও যা বললেন তা এই রকম। ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, পূর্ব পাকিস্তানের ছিন্নমূল মানুষদের জন্য কিছু জমি দিতে চেয়েছে। কিন্তু কতটা জমি? কতজনের সেখানে পুনর্বাসন হবে? আসামে তো বহু উদ্বাস্তু চলে এসেছে। তাদের অনেককে খেদিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সব বিতাড়িত অসহায় মানুষ এসে ভিড় জমাচ্ছে কলকাতায়, নর্থবেঙ্গলে। বিহার ওড়িশায় যারা যাবে তাদেরও যদি কোনওদিন তাড়ানো হয়?

শেখরনাথ বললেন, 'লক্ষ লক্ষ বাঙালিকে উৎখাত করে এই স্বাধীনতা এসেছে। পাঞ্জাবের সমস্যাটার সমাধান হয়ে যাবে। ওখানে টোটাল এক্সচেঞ্জ অফ পপুলেশন হয়ে গেছে। এখানকার মুসলমানদের ফেলে যাওয়া জমিতে এসে বসেছে ওপারের শিখ আর জাঠেরা। ওপারের ফেলে আসা জমিতে গিয়ে বসেছে এপারের পাঞ্জাবি মুসলমানরা। জমির জন্যে, পুনর্বাসনের জন্যে ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়ায় কোনও সমস্যা নেই। তাছাড়া তাদের জন্য দরাজ হাতে টাকা ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। আর বাঙালিদের জন্যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের হাত বড়ই কৃপণ। মুঠি খুলতেই চায় না।' বলতে বলতে কণ্ঠস্বর তিক্ত হয়ে ওঠে, 'স্বাধীনতার স্বাদটা কেমন, বুঝতে পারছ? এই স্বাধীনতার জন্যেই কি হাজার হাজার সোনার ছেলে জেলের ঘানি ঘুরিয়েছে, ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দিয়েছে?'

একটু চুপচাপ।

তারপর শেখরনাথ বলেন, 'চুক্তিতে সই করে, দেশটাকে কেটেকুটে স্বাধীনতা এলে তার চেহারাটা কেমন হয় তা তো দেখতেই পাচ্ছ। মুক্তি সংগ্রামীদের এত আত্মত্যাগ সব বৃথাই গেল।' ক্ষোভে, বেদনায় তাঁর গলা বুঝে এল।

বিনয় অবাক হয়ে যাচ্ছিল। মেনল্যান্ড থেকে প্রায় হাজার মাইল দূরের এই দ্বীপপুঞ্জে থেকেও দেশের কত খবর রাখেন এই মানুষটি।

কথায় কথায় ওরা পশ্চিম দিকের শেষ জমিটায় এসে পড়ল। এরপর গভীর জঙ্গল। সেই জঙ্গল সাফ হলে আবার কিছু উদ্বাস্তুকে ভাগ করে দেওয়া হবে।

শেষ জমিটায় আসতেই চোখে পড়ল একটি যুবক, তিরিশের বেশি বয়স হবে না, ঢ্যাঙা, রোগাটে চেহারা, লম্বা ধরনের মুখ— ধারালো বার্মিজ দা দিয়ে ঝোপঝাড় কাটছিল। একটা যুবতী, কপালে সিঁথিতে সিঁদুর, মাথায় ঘোমটা নেই—সেও দা দিয়ে বুনো লতা কেটে একধারে জড়ো করছে। এছাড়া আর কেউ নেই। তাদের দু'জনকে নিয়েই খুব সম্ভব একটা ডি. পি (ডিসপ্লেসড) ফ্যামিলি।

বিনয়দের দেখে যুবকটি কাছে এগিয়ে আসে। বিনয়কে সে চেনে কিন্তু শেখরনাথ তার অপরিচিত। সে হাত জোড় করে বিনয়কে নমস্কার করে, শেখরনাথের দিকে তাকায়। —'আপনারে তো চিনতি ফারলাম না।'

বিনয় পরিচয় করিয়ে দিতে সে ঝুঁকে শেখরনাথের পা ছুঁয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'আপনে বড় সারের কাকা। আপনেরে দেখে বড় আনন্দ হতিচে। আমাগের নয়া কুলোনি দেখতি আসিছেন?'

মাথা নাড়িয়ে শেখরনাথ বললেন, 'হ্যাঁ।' তারপর জিগ্যেস করলেন, 'তোমার নাম কী?'

'ছিষ্টিধর বারুই।'

'দেশ ছিল কোথায়?'

'আইজ্ঞে, খুইলনে জিলা। গেরাম— নেহেরপুর।'

'পাকিস্তান থেকে কতদিন আগে ইন্ডিয়ায় এসেছ?'

'তা হবে নে, বছর দেড়-দুই।'

'ছিলে কোথায়?'

'কলকেতায় এইসে ছয়-আট মাস শিয়ালদার ইস্টিশানে। তার পরি (তারপর) কেম্পে। কেম্প থিকে বাবুরা আমাগেরে আন্ধারমান দ্বীপি আনিছে।'

শেখরনাথ কী বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল লতাটতা কাটা বন্ধ করে বউটি বসে বসে হাঁফাচ্ছে। সে গর্ভবতী। বাচ্চার জন্ম হতে বেশি দেরি নেই। সারা মুখে দানা দানা ঘাম। ঘামে ভিজে গেছে জামা। ক্লান্তিতে তার শরীর ভেঙে পড়ছে।

বিনয়ের মতো ওদের দু'জনের সম্পর্কটা আন্দাজ করে নিয়েছিলেন শেখরনাথও। ধমকের সুরে বললেন, 'বউয়ের এই অবস্থা। তাকে জমিতে খাটাতে নিয়ে এসেছ? মরে যাবে যে।'

অপরাধী অপরাধী মুখ করে ছিষ্টিধর অর্থাৎ সৃষ্টিধর বলে, 'কী করবা নে সার? সরকারি বাবুরা বড় বড় গাছ কাটি দেছেন। ছোট ছোট জঙ্গল সাফ না করতি পারলে জমিন বারোবে (বেরুবে) ক্যামনে? ক্যাশ ডোল তো একদিন বন্ধ হয়ি যাবে। চাষবাস করতি না পারলে না খেয়ি মরতি হবে নে।'

শেখরনাথ ভীষণ রেগে গেলেন। গলার স্বর কয়েক পর্দা চড়িয়ে বললেন, 'আর কক্ষনো বউকে জমির কাজে লাগাবে না। ওর এখন বিশ্রাম দরকার।'

ঢোক গিলে সৃষ্টিধর বলে, 'কিন্তুক সার, আমার ফেমিলিতে তো আর কেউ নাই। ক্যামন করি এত বড় জঙ্গল সাফা করব?'

'পরিতোষকে বলব একটা লোক দিতে। সে-ই তোমার সঙ্গে সাফসুফ করবে। যদি বাড়তি লোক পরিতোষের হাতে না থাকে, আমিই কাজে লেগে যাব।'

লম্বা জিভ কেটে সৃষ্টিধর বলল, 'অমন কথা কতি নাই। আমার পাপ হবা। যা পারি আমি একাই করতি চ্যাষ্টা করব।'

এ নিয়ে আর কিছু বললেন না শেখরনাথ। জিগ্যেস করলেন, 'বউকে ডাক্তারবদ্যি দেখিয়েছ?'

'এই জঙ্গুলি ডাক্তারবদ্যি কোয়ানে (কোথায়) পাবানে (পাব)?

একটু ভেবে শেখরনাথ বললেন, আজ আর কাজ করতে হবে না। বউকে নিয়ে চলে যাও —কোথায় থাকার ব্যবস্থা হয়েছে তোমাদের?'

দূরের ব্যারাকগুলো দেখিয়ে দিল সৃষ্টিধর। এক পলক দেখে শেখরনাথ বললেন, 'দেখি ডাক্তারের কী বন্দোবস্ত করা যায়।'

এতগুলো জমিতে ঘোরাঘুরি করতে করতে বেলা হেলে গেল। তিনদিকের পাহাড়ের ছায়া দীর্ঘ হচ্ছে। সূর্যটা পশ্চিম পাহাড়ের আড়ালে নেমে গেছে। সেটাকে তখন আর দেখা যাচ্ছে না।

নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন শেখরনাথ। তারপর স্বগতোক্তির মতো বললেন, 'রিফিউজি সেটেলমেন্টের জন্য জেফ্রি পয়েন্টটা বাছা হল তখন একবারই এখানে এসেছিলাম।

banglabooks.in

সেইসময় সবে ক্যাম্প অফিস বসেছে, ব্যারাকগুলো তৈরি হচ্ছে। পরিতোষ, লা ডিন, ধনপত— পুনর্বাসন আর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের এমন কিছু লোকজনকে পাঠানো হয়েছে। চারিদিকে চাপ চাপ জঙ্গল। এখন এসে দেখছি সেই জঙ্গলের অনেকটাই সাফ করে ফেলা হয়েছে। রিফিউজিরা এসে তাদের জমিজমা বুঝে নিচ্ছে।' বলে চুপ করে গেলেন।

জঙ্গল ধ্বংস হওয়াতে তিনি কি খুশি হননি, ঠিক বুঝতে পারল না বিনয়। কিন্তু বনভূমি নির্মূল না হলে উদ্বাস্তুদের জমি দেওয়া হবে কী করে? তাদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনাই তো বন্ধ করে দিতে হবে।

এখানে উত্তর দিকের জঙ্গলটাই সবচেয়ে ঘন, সবচেয়ে নিবিড়। সেটা অন্য দু'ধারের জঙ্গলের চেয়ে বেশি ঝাপসা হয়ে গেছে। তবু আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে ও দিকের বনভূমির মাথা ছাপিয়ে দু'শো হাত দূরে দূরে বাঁশের তৈরি টঙ খাড়া হয়ে আছে। টঙগুলোকে ছুঁয়ে চলে গেছে কাল্পনিক পেরিমিটার রোড।

ওইসব উঁচু, উঁচু মাচা বা টঙ যে বুশ পুলিশের ঘাঁটি বা ওয়াচ টাওয়ার, শেখরনাথ তা জানেন। ওখানে বসেই বুশ পুলিশের দল জারোয়াদের গতিবিধির ওপর নজর রাখে। পেরিমিটার রোডের অস্তিত্ব তাঁর অজানা নয়। সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে একসময় জিজ্ঞেস করলেন, 'যেভাবে উত্তর দিকের জঙ্গল কাটা হচ্ছে তাতে আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে।'

বিনয় উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই শেখরনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি জানো রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টের পরিকল্পনাটা কী? বিশু তোমাকে কিছু বলেছে?

বিনয় বলে, 'কীসের পরিকল্পনা?'

'ওরা কি বুশ পুলিশের ঘাঁটি আর পেরিমিটার রোডের ও ধারের জঙ্গলও রিফিউজি সেটেলমেন্টের জন্যে সাফ করে ফেলবে?'

'আমি জানি না। রাহা সাহেব এ নিয়ে আমাকে কিছু বলেননি।'

চিন্তাগ্রস্তের মতো শেখরনাথ বললেন, 'ও পাশের জঙ্গলে হাত দেওয়া ঠিক হবে না। ওটা যেমন আছে তেমনই থাক। কেন জানো?'

'কেন?' বিনয় উৎসুক হল।

শেখরনাথ জানালেন, দক্ষিণ আন্দামানের উত্তর দিকের ওই জঙ্গলটা জারোয়াদের নিজস্ব এলাকা। পূর্ব পাকিস্তানের ছিন্নমূল মানুষজনের পুনর্বাসনের জন্য আন্দামানের আদিম বাসিন্দা জারোয়াদের উৎখাত করা খুবই অন্যায়। জঙ্গল গেলে ওদের রিহ্যাবিলিটেশন হবে কোথায়?

শেখরনাথ বললেন, 'সৃষ্টিধরের জমি পর্যন্ত জঙ্গল কাটা হয়ে গেছে। এই পর্যন্তই থাক। বিশুকে বলব এধারের ফরেস্টে যেন আর হাত না পড়ে।' পরক্ষণে কী যেন খেয়াল হয় তাঁর।—'কিন্তু বিশুকে বলে কিছু হবে বলে মনে হয় না। যদি ওর ওপরের অথরিটি ঠিক করে থাকে উত্তরের বনবাদাড় শেষ করে ফেলবে, আমি কিন্তু ছাড়ব না। চিফ কমিশনার আন্দামান-নিকোবরের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেড। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব। তাতেও যদি কাজ না হয়, ওঁর অফিসের সামনে ধর্নায় 'বসে যাব।'

বিনয় লক্ষ করল, শেখরনাথের মুখটা কঠিন হয়ে উঠেছে। তাঁর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে অদম্য, জেদি সেই পুরনো বিপ্লবীটি। সে একটু ধন্দে পড়ে যায়। শেখরনাথ যা বললেন তাতে এই দ্বীপে পুনর্বাসনের পরিকল্পনা ধাক্কা খাবে। কুণ্ঠার সুরে সে বলে, 'কিন্তু'—

'কী?' উত্তর পাহাড়ের দিক থেকে চোখ সরিয়ে এনে শেখরনাথ জিজ্ঞেস করেন।

'বহু রিফিউজি এসে গেছে। তাদের সবাইকে এখনও জমি দেওয়া হয়নি। একমাসের ভেতর আরও অনেক রিফিউজি ফ্যামিলি এসে পড়বে। তাদেরও জমি দিতে হবে। জঙ্গল সাফ না করলে এত ল্যান্ড কোত্থেকে পাওয়া যাবে'?

চোখ কুঁচকে একটু ভাবলেন শেখরনাথ। 'হ্যাঁ, সেটা একটা বড় সমস্যা। তবে তারও সলিউশন আছে। উত্তর দিকটা বাদ দিয়ে পুব আর পশ্চিমের জঙ্গল সাফ করা যেতে পারে। ওই দুটো দিকে প্রচুর জমি বেরুবে। জারোয়ারাও নেই।'

শেখরনাথের মনোভাবটা এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে তাঁর অপার সহানুভূতি, ওদিকে জারোয়াদের ওপরেও অফুরান মমতা। এখানকার জনজাতি তাদের নিজেদের বাসস্থানে চিরকাল যেভাবে থেকে এসেছে তেমনি থাক। তাদের উচ্ছেদ করলে তার ফলাফল হবে মারাত্মক। জঙ্গলে হাত পড়ায় এমনিতেই জারোয়ারা খুশি নয়, যদি উৎখাত হতে হয় তাহলে আরও হিংস্র হয়ে উঠবে।

একদিকে উদ্বাস্তুরা থাক, অন্যদিকে জারোয়ারা। কোনওরকম বিশৃঙ্খলা, অশান্তি যেন না ঘটে। সহাবস্থানই তাঁর কাম্য।

আলো ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। কিছুক্ষণের মধ্যে ঝপ করে সন্ধে নেমে যাবে।

শেখরনাথ বললেন, 'চল, ফেরা যাক।'

দু'জনে দক্ষিণে ক্যাম্প অফিসের দিকে হাঁটতে লাগলেন।

এদিকে হাতিরা এ বেলার মতো গাছের গুঁড়ি ঠেলার পর ফিরে যাচ্ছে। সঙ্গে তাদের চালকেরা। উদ্বাস্তুরাও ঝোপ-জঙ্গল কেটে সার বেঁধে চলেছে। এদের মধ্যে অনেক বুড়োটুড়োও রয়েছে। বয়সের ভারে নুয়ে-পড়া, গায়ের কুঁচকানো চামড়া আলগা হয়ে ঝলঝল করছে, বেজায় দুর্বল। ধুঁকে ধুঁকে তারা হাঁটছে।

এই বয়স্ক, অশক্ত মানুষগুলোকে জমিতে কাজ করতে দেখেছেন শেখরনাথ। তখন সেভাবে লক্ষ করেননি। এখন তাদের ক্লান্ত বিধ্বস্ত চেহারা দেখে বড় মায়া হল।

সৃষ্টিধরকেও দেখা যাচ্ছে। সে তার গর্ভবতী বউকে ধরে ধরে নিয়ে চলেছে মেয়েটির হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছে। এলোমেলো পা ফেলছে। যদি কিছুতে টক্কর লেগে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়, মহা সর্বনাশ হয়ে যাবে।

শেখরনাথ বললেন, 'এক জায়গা থেকে তুলে এনে এই মানুষগুলোকে বহুদূরের অচেনা দুর্গম একটা এলাকায় এনে ফেলা হল, কিছু জমিজমা দেওয়া হল। ব্যস, দায়িত্ব শেষ। বৃদ্ধেরা, প্রেগনান্ট মেয়েরা জঙ্গল সাফ করার মতো পরিশ্রমের কাজ করবে—এ কেমন কথা? এদের জন্যে কিছু একটা করতেই হবে। পুনর্বাসন বললেই পুনর্বাসন হয় না। দেশে যেভাবে তারা ছিল সেই পরিবেশ, সেই স্বাচ্ছন্দ্যটি তাদের তৈরি করে দিতে হবে।'

banglabooks.in

॥ সাত ॥

ক্যাম্প অফিসের সামনের ফাঁকা মাঠটায় বিনয়রা যখন ফিরে এল, সন্ধে নামতে শুরু করেছে। অন্যদিনের মতোই উদ্বাস্তুরাও চলে এসেছিল। শ্রান্ত শরীর ছেড়ে দিয়ে তারা বসে পড়েছে। নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। এলোমেলো, অসংলগ্ন। চারদিক থেকে ভনভনানির মতো গুঞ্জন উঠছে। এর মধ্যে পুনর্বাসনের কর্মীরা বড় বড় লণ্ঠন আর হ্যাজাক জ্বালিয়ে দিয়েছে। আলোর ভরে গেছে চারদিক।

জমি সাফাইয়ের কাজ করে এসে এই সময়টা খানিকক্ষণ জিরিয়ে নেয় উদ্বাস্তুরা। তারপর সমুদ্র থেকে হাতমুখ ধুয়ে আসে। আজও তা-ই করল তারা।

দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরে এতক্ষণ একটানা খাটাখাটনির পর খিদেও পায় জবর। পেটে আগুন জ্বলতে থাকে। খাবারের ব্যবস্থাও অবশ্য রয়েছে—চিঁড়ে, গুড় আর চা। পুনর্বাসনের একদল কর্মী সেসব নিয়ে তৈরিই ছিল।

বিশ্বজিৎ পোর্ট ব্লেয়ারে চলে গেছেন। যে দুটো দিন ছিলেন, এখানকার কলোনাইজেশন অ্যাসিস্টান্ট একটা খাপের ভেতর যেন গুটিয়ে ছিল। এখন সে এই সেটেলমেন্টের হর্তাকর্তা। তার চেহারাটাই পালটে গেছে। হাঁকডাক করে উদ্বাস্তুদের চিঁড়েটিঁড়ে দেবার ব্যবস্থা করতে লাগল।

রাতে খাওয়ার সময় আরও ঘণ্টা দুই পর। তখন দেওয়া হয় রুটি, তরকারি আর দুধ।

উদ্বাস্তুরা খেতে খেতে গল্প করছিল। বিনয় আর শেখরনাথ এক গেলাস করে চা নিয়ে এসে অল্প অল্প চুমুক দিতে দিতে কথা বলছিলেন। তবে শেখরনাথের নজর ছিল পরিতোষের দিকে। খাবারটাবার বিলি হলে তিনি হাত নেড়ে তাকে ডাকলেন।

শেখরনাথ শুধু বিশ্বজিৎ রাহার কাকাই নন। কতটুকু সময়ই বা তাঁকে দেখেছে বিনয়। তবে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছুই শুনেছে। ব্রিটিশ আমলের দুর্ধর্ষ বিপ্লবী আন্দামান দ্বীপমালার একজন লিজেন্ড। রূপকথার নায়কই বলা যায়। তাঁকে এখানকার মানুষজন শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে।

পরিতোষ একরকম দৌড়েই চলে এল।—'আমারে কিছু কইবেন কাকা।' বিশ্বজিতের কাকা, সেই সম্পর্কের সুতো ধরে সে তাঁকে কাকাই বলে। খুব সম্ভব এখানকার সকলেই তা-ই। বিনয়ও ঠিক করে ফেলল সেও শেখরনাথকে কাকা বলবে। তাতে মানুষটিকে অনেক নিবিড়, অনেক আপন করে পাওয়া যাবে।

শেখরনাথ পরিতোষকে বললেন, 'তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। এক এক করে বলি।'

দু'চোখে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রইল পরিতোষ। সেই সঙ্গে একটু শঙ্কাও। শঙ্কার হেতুটা এইরকম। সে জানে, শেখরনাথ এই দ্বীপপুঞ্জের ক্ষমতাবান কোনও আমলা নন, নন হর্তাকর্তাবিধাতা। কিন্তু তার চেয়েও অনেক বড়। এখানকার আদিম জনজাতি ওঙ্গে, জারোয়া, সেন্টিনালিস বা গ্রেট আন্দামানিসদের এতটুকু ক্ষতি বা উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে সামান্য গাফিলতি হোক, তিনি তা রেয়াত করবেন না। প্রাক্তন বিপ্লবী এই দ্বীপপুঞ্জের চিফ কমিশনার, ডেপুটি কমিশনারদের গ্রাহ্য করেন না। তেমন কোনও ঘটনা ঘটলে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে ছাড়বেন।

শেখরনাথ বললেন, 'রিফিউজিদের এখন তো চিঁড়ে, গুড় আর চা দিলে। সকালে দুপুরে আর রাত্তিরে কী দাও?'

পরিতোষ জানায়, সকালের খাবার হল রুটি-তরকারি বা খিচুড়ি, দুপুরে ভাত ডাল তরকারি। রাত্তিরে আবার রুটি তরকারি এবং ইউরোপ আমেরিকা থেকে আসা পাউডার মিল্ক গুলে এক গেলাস করে দুধ।

শেখরনাথ বললেন, 'রিফিউজিগুলোর চেহারা দেখেছ? হাড্ডিসার, সারাক্ষণ ধুঁকছে। কলকাতার রিলিফ ক্যাম্প আর শিয়ালদা স্টেশনের চত্বর থেকে আধমরা হয়ে এসেছে। এখানে এসে জঙ্গল সাফ করার অত খাটুনি, তার ওপর এই রাজভোগ খাওয়াচ্ছ। জমি বার করে ধান ফলাতে ফলাতে এদের ভবসাগর পাড়ি দেওয়াবার চমৎকার ব্যবস্থা করেছ দেখছি।'

পরিতোষ ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়। শেখরনাথ যা বললেন, মোটামুটি তা বুঝতে পারছে। ঢোক গিলে জড়ানো, আবছা গলায় কিছু একটা বলতে চাইল। তার একটি বর্ণও বোঝা গেল না।

শেখরনাথ কণ্ঠস্বর উঁচুতে তুলে বললেন, 'নিউট্রিশন—নিউট্রিশন বোঝো? এদের পুষ্টিকর ভালো খাবারদাবার দরকার। নইলে একদিন দেখবে সেটেলমেন্টটা আছে, মানুষগুলো নেই।'

ভয়ে ভয়ে পরিতোষ বলে, 'রিফিউজিগো খাওয়ানের লেইগা যে টাকা স্যাংসন হইছে হেয়াতে (তাতে) এইর বেশি কিছু দেওন (দেওয়া) সম্ভব না।'

বিদ্রূপের সুরে শেখরনাথ বলেন, 'যাঁরা স্যাংশন করেছেন তাঁদের ঘাড় ধরে এখানে এনে দশ দিন এই নবাবি খানা খাওয়াও। বুঝুক রিফিউজিদের জন্যে কী ব্যবস্থা করেছে। ক্রুয়েলটির সীমা থাকা দরকার। কেন, সমুদ্রে মাছ নেই? দশবার জাল ফেললে এক মন মাছ উঠে আসবে। সেটা তো আর পয়সা দিয়ে কিনতে হচ্ছে না। সেই মাছ ওদের খাওয়াও। ম্যাল-নিউট্রিশনে আর ভুগবে না।'

'কিন্তুক—'

কপাল কুঁচকে গেল শেখরনাথের।—'কীসের কিন্তুক?'

'মাছ রন্ধনের কেও নাই। এহানে যারা রান্ধে হেরা (তারা) বিহার, ইউ পি'র লোক, দুই চাইরজন বার্মিজও আছে।'

'বাঙালি রাঁধুনি রিক্রুট কর।'

'আমি ছুটোখাটো এমপ্লয়ি! হেই খ্যামতা আমার নাই।'

ঠিকই বলেছে পরিতোষ। তার মতো একজন সামান্য কলোনাইজেশন অ্যাসিস্টান্ট কারও চাকরিবাকরি দিতে পারে না। একটু চুপ করে থেকে শেখরনাথ বললেন, 'এই ব্যাপারে বিশুর সঙ্গে আমি কথা বলব। এবার আমার দু'নম্বর কথাটা শোন। জমিগুলো ডিস্ট্রিবিউট করা হয়েছে, সেসব জায়গায় ঘুরে ঘুরে কী চোখে পড়ল জানো?'

পরিতোষ তাকিয়ে থাকে, কোনও প্রশ্ন করে না।

শেখরনাথ বলতে লাগলেন, 'প্রেগনান্ট বউ, বৃদ্ধের দল, ছোট ছোট বাচ্চা পর্যন্ত জঙ্গল সাফ করছে। এই পরিশ্রমের কাজ কি ওদের পক্ষে সম্ভব? জোয়ান ছেলেমেয়েরা করুক— ঠিক আছে। কিন্তু গর্ভবতী মেয়ে বা বুড়ো আর বাচ্চাদের দিয়ে এ কাজ করানো চলবে না। রিফিউজিদের মধ্যে যারা শক্তসমর্থ আছে তাদের সঙ্গে তোমাদের রিহ্যাবিলিটেশনের লোকজন দাও। তারাও হাত লাগাক।'

'হেইটা (সেটা) তো দিতে পারুম না কাকা।'

'কেন?' শেখরনাথের স্বর রুক্ষ হয়ে ওঠে।

'উপুর (ওপর) থিকা ঠিক কইরা দেওয়া আছে বড় বড় মোটা গাছগুলান হুদা (শুধু) আমরা কাইটা দিমু। বাকি হগল (সকল) সাফসুতরা করব রিফুজিরা। হেয়া (তা) ছাড়া এহানে ওয়ার্কার এত কম যে অন্য কাম সাইরা জমিনে পাঠান যাইব না।'

'হুঁ, তোমার সমস্যাটা বুঝতে পারছি। দেখা যাক, কী করা যায়। এবার আরেকটা কথা শোন— এখানে প্রেগনান্ট মেয়ে আমি একজনকেই দেখেছি। নিশ্চয়ই আরও কেউ কেউ আছে। শুনলাম এখানে কোনও ডাক্তার নেই।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে পরিতোষ। —'না'—

শেখরনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'এদের যখন ডেলিভারি হবে, কে দেখবে! তাছাড়া যে রিফিউজিরা এসেছে, এবং আরও আসছে, তারা কেউ অজর অমর নয়, লোহার শরীর নিয়েও কেউ আসেনি, আসবে না। তাদের অসুখ-বিসুখ হলে বিনা চিকিৎসায় পোকার মতো মরবে? তোমাদের রাহাসাহেব কি তার কর্তারা সেটেলমেন্টে ওষুধপত্র, ডাক্তার পাঠানোর কথা ভাবেনি?'

মুখ নিচু করে পরিতোষ বলল, 'আমি ঠিক জানি না।

ওদের ভাবা উচিত ছিল। এতগুলো মানুষের জীবন-মরণের

banglabooks.in

ব্যাপার। আমি কয়েকদিন পর পোর্ট ব্লেয়ারে যাচ্ছি। বিশুদের ছাড়ব না। রিফিউজি বলে ওদের জীবনের কোনও দাম নেই? এটা শিয়ার ক্যালাসনেস। সিরিয়াস কিছু ঘটে গেলে কী হবে?'

পরিতোষ চুপ করে থাকে।

শেখরনাথ বললেন, 'আরেকটা ইমপর্টান্ট কথা আছে। তোমরা উত্তর দিকে কতদূর পর্যন্ত জঙ্গল কাটার প্ল্যান করেছ?'

শেখরনাথ সেটেলমেন্টের নানা বিষয়ে যেভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করছেন তাতে মনে হয়, জঙ্গল কাটার ব্যাপারে তাঁর আপত্তি বা ক্ষোভ থাকতে পারে। ভয়ে ভয়ে পরিতোষ জানায়, আপাতত বুশ পুলিশের উঁচু টংগুলো পর্যন্ত বনভূমি সাফ করা হবে। তবে আরও উদ্বাস্তু মেনল্যান্ড থেকে এসে পড়লে টংগুলোর ওধারে আরও মাইলখানেক জঙ্গল কাটার পরিকল্পনা আছে।

পরিতোষ বলল, 'উই ব্যাপারটা আমিন আর চেনম্যানরা ভালো জানে।'

আমিন লা ডিন, হেড চেনম্যান ধনপত এবং পুনর্বাসন দপ্তরের বেশ কয়েকজন কর্মী বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিল। শেখরনাথ হাত নেড়ে তাদের ডাকলেন।

শশব্যস্ত লা ডিন'রা দৌড়ে এল। শেখরনাথ বললেন, 'এসব কী শুনছি—অ্যাঁ?'

তিনি কী শুনেছেন, লা ডিনরা কেমন করে জানবে? হতভম্বের মতো তারা তাকিয়ে থাকে।

পরিতোষ যা বলেছে, সব জানিয়ে শেখরনাথ জিগ্যেস করলেন, 'তার মানে তোমরা জারোয়াদের এলাকা দখল করতে চাও?' তাঁর চোখেমুখে অসীম বিরক্তি ফুটে বেরয়।

শেখরনাথের যে এ নিয়ে তীব্র আপত্তি রয়েছে সেটা আঁচ করতে পারছিল লা ডিন এবং তার সঙ্গীরা। লা ডিন ঢোক গিলে বলল, 'আমাদের ওপর অ্যায়সাই হুকুম হ্যায়। হামলোগ হুকুম কা নৌকর চাচাজি।' শেখরনাথ খুব সম্ভব এই দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দাদের সার্বজনীন চাচাজি অথবা কাকা। লা ডিনরা যে নিরুপায় তা বুঝতে পারছিলেন শেখরনাথ। স্বাধীনভাবে নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী কিছু করার উপায় নেই। সেদিক থেকে হাত-পা বাঁধা। মাথার ওপর যে অফিসাররা রয়েছেন তাঁরা যা বলবেন সেটাই তামিল করতে হবে।

শেখরনাথ বললেন, 'তা হলে পেরিমিটার রোড আর বুশ পুলিশের ক্যাম্পগুলোর কী হবে?'

ঘোর জঙ্গলের ভেতর পেরিমিটার রোড হল একটা কাল্পনিক বিভাজন রেখা। তার ওধারে থাকবে এখানকার আদিম জনজাতি, এধারে অন্য মানুষজন।

ভয়ে ভয়ে লা ডিন বলল, 'জঙ্গল কাটা হলে পেরিমিটার রোড আর বুশ পুলিশের ক্যাম্পগুলো পিছিয়ে দেওয়া হবে।'

'একটা কথা ভেবে দেখেছ?'

'জি?'

'এমনিতেই এদিকে বাইরের লোকজন আসায় জারোয়ারা খেপে রয়েছে। নইলে সেদিন সেটেলমেন্টে হামলা করত না। তার ওপর যদি এখানকার পেরিমিটার রোডের ওধারের জঙ্গল কাটা পড়ে ওদের এলাকা আরও কমে যাবে। এটা ঠিক নয়। এতে ওরা আরও খেপে যাবে।'

'লেকেন চাচাজি—'

'কী?'

'আমরা ছোটামোটা সরকারি নৌকর। আমরা কী করতে পারি?'

একটু চুপচাপ।

তারপর শেখরনাথ বললেন, 'আচ্ছা, পুব আর পশ্চিম দিকে তো এখনও অনেক জঙ্গল রয়েছে।'

'জি—'

'ওই দু'ধারের জঙ্গল কেটে কিছু জমি বার করে তো রিফিউজিদের বিলি করা হয়েছে। প্রচুর জমি বেরুবে ওই দুটো দিক থেকে। পুব-পশ্চিমের জঙ্গল সাফা কর। উত্তরটা বাদ দাও।'

'লেকিন চাচাজি, রাহাসাহেব উত্তর দিকের কাম খতম করে ফির পুব-পশ্চিম হাত লাগাতে বলেছেন। উনি আমার উপরবালা—' বলতে বলতে থেমে গেল লা ডিন।

ধনপতও সায় দিল, 'জি চাচাজি। লা ডিন ঠিকই বলছে।'

'আমি তোমাদের রাহাসাহেবের সঙ্গে কথা বলব। সে যদি রাজি না হয় তখন দেখা যাবে। ততদিন তোমরা পুব-পশ্চিমের জঙ্গল থেকে জমি বার কর।'

লা ডিন মুখ চুন করে বলল, 'লেকিন—'

তার মনোভাবটা আঁচ করে নিয়ে শেখরনাথ বললেন, 'তোমাদের রাহাসাহেব রেগে যাবে, তা-ই তো?'

লা ডিন চুপ করে রইল।

শেখরনাথ বললেন, 'ওর ব্যাপারটা আমি সামলাব। ভয় পেও না।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হতে হল লা ডিন এবং তার সঙ্গীদের।

'জি—'

বিশ্বজিতের ঘরে তিন দিন একা কাটিয়েছে। শেখরনাথকে এই ঘরেই থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। যে খাটে বিশ্বজিৎ শুতেন, তিনিও সেখানেই শোবেন। সঙ্গেকরে শেখরনাথ বিশেষ কিছুই আনেননি, একটা ঝোলায় পুরে খান তিনেক মোটা সুতোর ধুতি আর সাদামাঠা টুইলের ফুলশার্ট এবং দাড়ি কামানোর ক্ষুর, সাবান, ছোট আয়না আর সস্তা চিরুনি।

রাত্তিরে রিফিউজিদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া সেরে শেখরনাথ বিশ্বজিতের ঘরে চলে এলেন। সঙ্গে বিনয়।

পুনর্বাসন দপ্তরের কর্মীরা সন্ধে নামতে না নামতেই দুটো লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। মশা এবং পোকা-মারা ধূপও জ্বলছে ঘরের কোনায় কোনায়। উগ্র ঝাঁঝালো গন্ধে ভরে গেছে ঘরের বাতাস।

শেখরনাথ তাঁর পোশাক পালটে লুঙ্গি আর হাফহাতা ফতুয়া ধরনের একটা জামা পরে নিলেন। বিশ্বজিতের খাটটায় বসে বললেন, 'বিশুর কাছে শুনেছি, রাত্তিরে তুমি তোমাদের পেপারের জন্যে রিপোর্ট লেখ। শুরু করে দাও। আমি কথা বলে ডিসটার্ব করব না।'

বিনয় উত্তর দিতে যাচ্ছিল, সেই সময় বাইরে থেকে গান ভেসে এল। তার সঙ্গে সারিন্দা আর দোতারার সুর। অন্য দিনের মতোই ব্যারাক দুটোর সামনের ফাঁকা মাঠে যে বাঁশের মঞ্চ বাঁধা হয়েছিল সেখানে গানবাজনার আসর বসেছে। হ্যাজাকের তেজি আলোয় ভরে গেছে ওদিকটা। উদ্বাস্তুরা তাদের ঘিরে বসেছে।

হরিপদই শুধু নয়, ছিন্নমূল যে মানুষগুলো বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে চলে এসেছে তাদের মধ্যে আরও কয়েকজন চমৎকার গাইতে পারে। আজ গাইছে মাঝবয়সি হারাধন বিশ্বাস। রোজ শুনতে শুনতে কণ্ঠস্বরগুলো চেনা হয়ে গেছে বিনয়ের।

হারাধন গাইছিল—

'জল ভরে সুন্দরী গো কইন্যা জলে দিয়া ঢেউ
হাসি মুখে কও না কথা হায় রে,
সঙ্গে নাই মোর কেউ রে—
পরান আমার যায় যায় রে—
কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন তোমার হিয়া
এমন যৈবনকালে হায় রে
না করাইছে বিয়া রে
পরান আমার যায় যায় রে—
লজ্জা নাই রে নিলাজ ঠাকুর
লজ্জা নাই রে তর
গলায় কলস বাইন্ধ্যা হায় রে
জলে ডুইবা মর রে
পরান আমার যায় যায় রে—
কইবা পাইবাম কলস গো কইন্যা

banglabooks.in

কইবা পাইবাম দড়ি
তুমি হও গহিন গাঙ হায় রে—
আমি ডুইব্যা মরি
পরান আমার যায় যায় রে—

জানালার বাইরে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন শেখরনাথ। বললেন, 'কত কাল পর পূর্ববাংলার গান শুনছি। প্রাণমন ভরে যাচ্ছে। কী দরদ দিয়ে যে গাইছে লোকটা! আহা—'

রাজদিয়ায় থাকতে এই ধরনের গান যুগলই প্রথম শুনিয়েছিল বিনয়কে। তারপর আরও কতজনের মুখেই না শুনেছে সে। মাঝি-মাল্লা বৈরাগী যাত্রাদলের গায়ক—এমনি অনেক। কলকাতায় আসার পর জীবনের ওপর দিয়ে কত ঝড়ঝাপটা গেছে। ঝিনুক যখন নিরুদ্দেশ হল, মনে হয়েছিল আকাশ যেন খানখান হয়ে ভেঙে পড়েছে। হৃদয় জুড়ে তখন শুধুই ক্ষত। চূর্ণবিচূর্ণ বিনয় উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঝিনুককে খুঁজে বেড়াচ্ছে কলকাতার অলিগলিতে, জনারণ্যে, চারদিকের রিফিউজি কলোনিগুলোতে। জীবন থেকে পূর্ববাংলার সেইসব মায়াবী স্বপ্নের গান বিলীন হয়ে গিয়েছিল।

বহুকাল পর এই সেদিন, বিশ্বজিৎ তখন এখানে, জেফ্রি পয়েন্টের এই উদ্বাস্তু কলোনিতে আসার পর হরিপদর গান শুনে মনে হয়েছিল পূর্বজন্মের স্মৃতি আবার ফিরে এসেছে। তারপর থেকে রোজ গানবাজনার আসর বসে। হরিপদ হারাধন মোহনবাঁশি—এরা সবাই পাহাড় অরণ্য সমুদ্রে ঘেরা এই দ্বীপে কিছুক্ষণের জন্য হলেওজাদুকরের মতো পূর্ববাংলার সজল কোমল মায়াময় ভূখণ্ডটিকে নামিয়ে আনে।

শেখরনাথ আপ্লুত। বললেন, 'লোকগুলোর কী এনার্জি, কী প্রাণশক্তি, দেখেছ। সারাদিন জঙ্গল কেটেছে, তারপর কোথায় খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়বে, তা নয়। গানের আসর বসিয়ে দিয়েছে।'

এসব তো আগেই দেখেছে বিনয়। কিছু বলল না। শুধু একটু হাসল।

শেখরনাথ বলতে লাগলেন, 'দূর থেকে শুনে জুত হচ্ছে না। যাই, আসরে গিয়ে ওদের পাশে বসি।' তিনি চলে গেলেন।

বিনয় অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ বসে থাকে। শেখরনাথ উদ্বাস্তুদের এনার্জির কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁর নিজের? সেই পোর্ট ব্লেয়ার থেকে পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে, দুর্গম বনজঙ্গল ভেদ করে সেটেলমেন্টে এসেছেন। এসেই ছুটেছেন জমি বিলি দেখতে। ঠায় এক জায়গায় কি দাঁড়িয়ে থেকেছেন? হেঁটে হেঁটে একরের পর একর জমি ঘুরে ঘুরে দেখেছেন। উদ্বাস্তুদের ডেকে ডেকে আলাপ করেছেন, তাদের সুবিধা অসুবিধার খোঁজখবর নিয়েছেন। তারপর এই রাত্রিবেলা ছুটলেন কাছাকাছি বসে গান শুনতে। এই বয়সেও প্রাক্তন এই স্বাধীনতা-সংগ্রামীর কী অফুরান প্রাণশক্তি! একসময় টেবলের দেরাজ খুলে কাগজ কলম বার করে লিখতে শুরু করল বিনয়।

বঙ্গোপসাগরের এই সৃষ্টিছাড়া দ্বীপে অবিরল হারাধনের সুরের ইন্দ্রজাল ছড়িয়ে পড়ছে।

॥ আট ॥

দিন পাঁচেক হল জেফ্রি পয়েন্টে এসেছেন শেখরনাথ। সারাদিন সারা রাত বিনয় তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। সকালে উঠে চা রুটি-টুটি খেয়ে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে তারা জমিতে ছোটে। লা ডিন, ধনপতদের কাজকর্ম দেখে। রিফিউজিদের জঙ্গল সাফাই দেখে। শেখরনাথের কথায় কাজ হয়েছে। সৃষ্টিধর বারুইয়ের জমির ঝোপঝাড় কাটার জন্য একজন লোক দিয়েছে পরিতোষ। আজকাল আর তার গর্ভবতী বউটিকে জমিতে দেখা যায় না।

অদ্ভুত মানুষ এই প্রাক্তন বিপ্লবীটি। বড়ই মায়াময়, উদ্বাস্তুদের জন্য তাঁর কী যে অপার সহানুভূতি! কোনও জমিতে হয়তো গিয়ে দেখলেন অশক্ত চেহারার বুড়ো-ধুড়ো কেউ বুনো উদ্দাম গাছপালার গায়ে দা চালাতে চালাতে হাঁপিয়ে পড়েছে। তিনি তক্ষুনি দা-টি কেড়ে নিয়ে কাজে লেগে যান। চারপাশ থেকে সবাই হাঁ হাঁ করে ওঠে, তিনি কারও বারণ শোনেন না।

দুপুরে ফিরে এসে চান, খাওয়া, সামান্য বিশ্রাম। তারপর আবার জমিতে জমিতে ঘোরা। সন্ধের আগে আগে ক্যাম্পে এসে চা-টা খেয়ে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেওয়া। তারপর রাতের খাওয়া চুকিয়ে শেখরনাথ চলে যান গানের আসরে, আর বিনয় লিখতে বসে।

রাতের এক প্রহর পেরুলে আসর ভাঙে। শেখরনাথ ঘরে এসে বিনয়ের পাশের খাটে শুয়ে পড়েন। ততক্ষণে বিনয়ের লেখাও শেষ। সেও শুয়ে পড়ে। এই হল দু'জনের এখনকার দৈনন্দিন রুটিন।

এসবের ফাঁকে ফাঁকে নানা কথা হয়। তার বেশির ভাগটাই জুড়ে থাকে দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা। আর এই স্বাধীনতার জন্য বাঙালিরা, বিশেষ করে পূর্ববাংলার হিন্দুরা, কতভাবে যে বঞ্চনার শিকার হয়েছে, বার বার এই প্রসঙ্গগুলো চলে আসে। এগুলো নিয়ে তাঁর কত যে ক্ষোভ, কত রোষ এবং উত্তেজনা।

কোনও দিন শেখরনাথ বলেন, 'পার্টিশনের ঠিক আগে জওহরলাল নেহরু লর্ড মাউন্টব্যাটেনরে যে একটা চিঠি লিখেছিলেন সেটা জানো?'

বিনয় বুঝতে পারে না। কোন চিঠির কথা বলছেন শেখরনাথ। সে তাকিয়ে থাকে।

শেখরনাথ বলেন, 'দেশ জুড়ে শুধুই ভয়াবহ আতঙ্ক আর আতঙ্ক। সরকার তা থামাতে পারছে না। শুধু চরম বিপর্যয় আর বিপর্যয়। বিশেষ করে লাহোরে যে নারকীয় ঘটনা ঘটছে তা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। অমৃতসর গুরুগাঁও তো কার্যত যুদ্ধক্ষেত্র। অথচ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে কোনও বিশৃঙ্খলা সর্বশক্তি দিয়ে দমন করা হবে। একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ বিনয়?'

বিনয় জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

'ডাইরেক্ট অ্যাকশনের কল দেওয়ায় কলকাতায় যা ঘটেছে, নোয়াখালিতে যে গণহত্যা হয়েছে, সেসব নিয়ে নেহরু কতখানি বিচলিত তা জানা যায় না। আমি অন্তত জানি না।'

একটু চুপ করে থেকে ফের শুরু করেন, 'বেঙ্গলে কী ঘটেছে তা নিয়ে ইন্ডিয়ার অন্য প্রভিন্সের নেতাদের চোখ থেকে রাতের ঘুম ছুটে গিয়েছিল কি না, আমার জানা নেই। গান্ধীজি অবশ্য নোয়াখালি রায়টের—রায়ট কী বলছি, একতরফা মার্ডার, অ্যাবডাকশন, রেপ, কনভারশন— এসবের পর সেখানে গিয়েছিলেন। তখন তো মহাসর্বনাশ ঘটেই গেছে।' হ্যাঁ, এটাও বলতে হবে বিহারেও হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে ঠান্ডা মাথায় খুন করে বিরাট বিরাট গর্ত খুঁড়ে রাতারাতি পুঁতে দেওয়া হয়েছে।'

কোনও দিন শেখরনাথ বলেন, 'দাঙ্গা যখন বাধে ভারতবর্ষের নানা প্রভিন্সে হাজার হাজার ব্রিটিশ সোলজার ছিল। খোদ ইংল্যান্ড থেকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কড়া হুকুম পাঠিয়েছিল দাঙ্গা থামাতে সেই ফৌজকে যেন কাজে লাগানো না হয়। এতদূরের ইন্ডিয়ান কলোনির শাসনকর্তাদের এমন বুকের পাটা ছিল না যাতে সেই হুকুম অমান্য করে। কলকাতায় ছেচল্লিশের ডাইরেক্ট অ্যাকশনের সময় ফোর্ট উইলিয়ামে কম সৈন্য ছিল না। এই এলাকার ব্রিগেডিয়ার ম্যাকিনলে তাদের ব্যারাক থেকে বেরুতে দেননি। ভাবখানা এই— স্বাধীনতা তো চাইছিস, তার মজাটা বোঝ।'

বিমর্ষ সুরে শেখরনাথ কোনও দিন বলেন, 'ভারতীয় নেতারা পাঞ্জাবে মিলিটারি রুল জারি করার জন্যে যথেষ্ট কাকুতিমিনতি করেছেন। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। ইংরেজ সরকার তখন পুরোপুরি অন্ধ আর বধির। সব শুনেও তারা কিছুই শোনেনি, সব দেখেও কিছুই দেখেনি। আবেদন নিবেদনে ফল না হওয়ায় তারা মুখে কুলুপ এঁটেছিল। অথচ সেদিন কংগ্রেস আর লিগের নেতারা রাস্তায় নেমে তুমুল আন্দোলন করতে পারতেন। দেশের সবাই হত্যাকারী বা নারীধর্ষক নয়। কোটি কোটি শান্তিকামী মানুষ রয়েছে, তাদের ডেকে বলতে পারতেন সমস্ত কিছু স্তব্ধ করে দাও, ব্রিটিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে বলতে পারতেন, এত রক্তস্রোতের

banglabooks.in

বিনিময়ে আমাদের স্বাধীনতার প্রয়োজন নেই। কিছুই তাঁরা করেননি। দেশের অনন্ত দুর্গতি আর চরম বিপর্যয়ের জন্যে ইংরেজ যতটা তার চেয়ে কম দায়ী নয় এইসব ক্ষমতালোভী নেতা। দেশ স্বাধীন হলে রাজপাট তাঁদের দখলে আসবে, এই প্রলোভন ত্যাগ করার মতো মহত্ত্ব এঁদের ছিল না।'

কখনও বা বলেন, 'আমরা যারা সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাস করতাম, ইংরেজের চোখে তারা টেরোরিস্ট সন্ত্রাসবাদী। ভারতীয় নেতারাও তা-ই মনে করতেন। আমরা যে মুক্তি সংগ্রামী, দেশের জন্যে শত সহস্র বিপ্লবী যে প্রাণ দিয়েছে, জেলখানায় পচে পচে মরেছে তাদের আত্মত্যাগের কোনও মূল্য নেই। আমরা দেশের জন্যে কতটুকুই বা করেছি, নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজ যখন ইম্ফল পর্যন্ত এসে নানা কারণে বিপর্যস্ত হল,' হাজার হাজার সেনাকে বন্দি করে দিল্লিতে নিয়ে আসা হল, তখন কংগ্রেসের একজন সর্বভারতীয় নেতা বলেছিল, 'এরা গুন্ডাবাহিনী, কোনও বিচার নয়, এদের ধরে ধরে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দাও।' যারা হাঁটু গেড়ে চুক্তিপত্রে সই করে হাত পেতে স্বাধীনতা নিল তারাই দেশপ্রেমী। আর যে বিপ্লবীরা জীবনদান করল বা মেনল্যান্ডের জেলখানায় জেলখানায় আর সেলুলার জেলে পচে গলে শেষ হল তারা টেরোরিস্ট। নেতাজির আই এন এ হল গুন্ডাবাহিনী! ভাবতে পারো?' ক্রোধে-উত্তেজনায় তাঁর চোখমুখ গনগন করতে থাকে।

এই মানুষটির মধ্যে কতখানি দাহ, কতটা ক্ষোভ জমা হয়ে আছে আন্দাজ করতে পারে বিনয়।

একদিন শেখরনাথ বললেন, 'ইন্ডিয়াকে স্বাধীনতা দেবার সিদ্ধান্ত কীভাবে হয়েছিল, তুমি নিশ্চয়ই জানো। সেই সময়কার বড়লাটের বড়ই তাড়া। তাঁকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইংল্যান্ডে ফিরতে হবে। কেননা যিনি ভবিষ্যতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজ-রাজেশ্বরী হবেন তাঁর সঙ্গে মাউন্টব্যাটেনের ভাইপোর বিয়ে। সেই ছাদনাতলার পাশে উপস্থিত না থাকলে চলে! তাছাড়া ব্রিটিশ নেভির প্রধানের পদটি শীঘ্রই খালি হতে চলেছে। মাউন্টব্যাটেনের নজর সেই মসনদের দিকে। পদটি কম লোভনীয় নয়। কাজেই ইন্ডিয়ার ব্যাপারে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাত ধুয়ে লন্ডনের প্লেনে উঠে বসো।'

বিনয় জানে, মোটামুটি ঠিক হয়েছিল উনিশশো আটচল্লিশের মাঝামাঝি ভারতীয় উপমহাদেশের যাবতীয় দায়িত্ব এ দেশের নেতাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু মাউন্টব্যাটেনের ভীষণ তাড়া। তাঁর আর তর সইছিল না। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে তিনি বোঝালেন, এত দেরি করার প্রয়োজন নেই। সরকারও সেটা মেনে নিল। হঠাৎই ঘোষণা করা হল, সাতচল্লিশের পনেরোই আগস্ট দেশটা কেটেকুটে দুটো ডোমিনিয়ন তৈরি করা হবে— ইন্ডিয়া আর পাকিস্তান। একই দিনে স্বাধীনতা এবং দেশ ভাগ। সেদিনই এ দেশের নেতাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। আশ্চর্যের ব্যাপারটা কী জানো বিনয়?'

বিনয় নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছিল। জিগ্যেস করেছে, 'কী?'

শেখরনাথ বলেন, 'দেশটাকে ভাগ করার জন্যে র‍্যাডক্লিফের হাতে যে ছুরি তুলে দেওয়া হয়েছিল, মাটিতে সেই ছুরি চালিয়ে কোন কোন অংশ কোন কোন ডোমিনিয়ন পাবে তখনও তিনি স্থির করে উঠতে পারেননি। তার আগে ডোমিনিয়ন বানানো হয়ে গেল।'

কখনও শেখরনাথ বলেন, 'এসবের নিট রেজাল্ট কী হল, আমরা যা পেলাম তা ছেঁড়াখোঁড়া পোকায়-কাটা এক স্বাধীনতা।'

কখনও বা তিনি বলেন, 'একটা কথা ভেবে দেখ, দু'শো বছর রাজত্বের পর মাত্র সাত সপ্তাহের মধ্যে এত বিশাল একটা দেশের ট্রান্সফার অফ পাওয়ার হয়ে গেল। এত বড় হঠকারী, অবিবেচক, দায়িত্বজ্ঞানহীন সিদ্ধান্ত আর কোথাও কবে হয়েছে, আমার জানা নেই। কলোনিয়াল মাস্টাররা অন্য কোনও দেশকে এভাবে হেলাফেলা করে ফেলে চলে গেছে, এমন নজির আর একটা তুমি দেখাতে পারো?'

দাঙ্গা, দেশ বিভাজন, স্বাধীনতা— টুকরো টুকরোভাবে এইসব নিয়ে তিনি যা বলেন তার মধ্যে এই মুক্তি সংগ্রামী মানুষটির কত যে ক্ষোভ, আক্ষেপ, যন্ত্রণা, ধিক্কার, নৈরাশ্য আর তীব্র ক্রোধ মিশে থাকে!

অন্য দিনগুলোর মতো আজও সকালে চা, চিঁড়ে-টিড়ে খেয়ে জমিতে এসেছেন। তাঁর কথামতো উত্তর দিকের জঙ্গল কাটা আপাতত স্থগিত রয়েছে। পুবে পশ্চিমে সাফাইয়ের কাজ চলছে। যেমন যেমন জমি বার করা হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সেসব উদ্বাস্তুদের ভাগ করে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

ওপর থেকে নির্দেশ ছিল, দশ পনেরো দিনের ভেতর জমির বিলিব্যবস্থা চুকিয়ে ফেলতে হবে। কিন্তু দেড়শো উদ্বাস্তু পরিবারকে অরণ্য নির্মূল করে জমি ভাগ করে দেওয়া কি মুখের কথা! একাশি বিরাশিটা পরিবার এখন অবধি জমি পেয়েছে। এখনও সত্তরটার মতো বাকি।

আগের ক'দিন উত্তর আর পুব দিকে ঘুরেছেন শেখরনাথরা। আজ গেলেন পশ্চিম দিকে। প্রথম চারটে জমিতে যে উদ্বাস্তুরা কাজ করছিল তাদের সঙ্গে আগেই আলাপ হয়েছে শেখরনাথের। ওদের সঙ্গে দু-একটা কথা বললেন, কোনওরকম অসুবিধা হচ্ছে কি না জিগ্যেস করলেন। হচ্ছে না— জেনে পরের জমিটায় এলেন। এখানে ভারী সুন্দর চেহারার একটি যুবতী— বয়স কুড়ি-একুশ, কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা, সিঁথিতে সিঁদুরের চওড়া রেখা, পাতলা নাকের পাটায় নাকছাবি, কানের লতিতে মাকড়ি, হাতে রুপোর চুড়ি, গলায় রুপোর গোট-হার, গাছকোমর করে পরা লাল-পাড় শাড়ি— ধারালো বর্মি দা দিয়ে জলডেঙ্গুয়া অর্থাৎ বনতুলসীর ঝাড় কাটছিল। তার সঙ্গী বছর তিরিশেকের একটি পুরুষ, যুবকই তাকে বলা যায়, লম্বা হিলহিলে চেহারা, তামাটে রং, মাথায় ঝাঁকড়া চুল— সেও একটা দা দিয়ে কাঁটাঝোপ সাফ করছিল। দেখেই আন্দাজ করা যায় স্বামী-স্ত্রী। পরিশ্রমে দু'জনেই ঘেমে নেয়ে যাচ্ছে।

আগে এদের লক্ষ করেনি বিনয়, শেখরনাথও। এত এত উদ্বাস্তু এসেছে। কয়েকজনের সঙ্গে ভালোই আলাপ হয়েছে তাদের, কিন্তু এত অল্প সময়ে সবাইকে আলাদা আলাদা করে চিনে, তাদের পরিচয় জেনে মনে করে রাখা সম্ভব নয়।

শেখরনাথ যুবকটিকে জিগ্যেস করলেন, 'কী নাম তোমার?'

যুবকটি হাতের দা ফেলে কাছে এগিয়ে এল। শেখরনাথ তাকে না চিনলেও সে তাকে চেনে। হাতের চেটো দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বিনয়ের সুরে বলল, 'আইজ্ঞা, বিন্দাবন বসাক—'

'দেশ ছিল কোথায়?'

'ঢাকা জিলা। গেরামের নাম বেতকা'— মুন্সিগঞ্জের নাম নি হুনছেন (শুনেছেন)?'

'শুনেছি। বিক্রমপুরে।'

'আমাগো বেতকা অইল মুন্সিগঞ্জের কাছে।'

'দেশ থেকে কবে এসেছ?'

'বছর দ্যাড়েক।'

কথায় কথায় জানা যায়, বিন্দাবন অর্থাৎ বৃন্দাবন আর বউ মাইল পনেরো দূরে সিরাজদিঘায় এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল। বন্ধুরা শিগগিরই দেশ ছেড়ে চলে যাবে, এই খবর পেয়ে। সারা পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থাগতিক একেবারেই ভালো না, সর্বক্ষণ আতঙ্ক, সর্বক্ষণ দুর্ভাবনা। কখন কী ঘটে যাবে, কেউ জানে না। বন্ধুদের কাছে জানতে চেয়েছে কবে তারা দেশ ছাড়বে, ইন্ডিয়ার কোথায় গিয়ে উঠবে, ইত্যাদি। ঠিক হয়েছিল একসঙ্গেই তারা পাকিস্তান ছেড়ে ত্রিপুরায় যাবে। কেননা সিরাজদিঘা অঞ্চলের অনেকেই ত্রিপুরায় যাচ্ছে। বহু মানুষ সঙ্গে থাকলে মনের জোর বাড়ে। বৃন্দাবন বন্ধুকে বলেছিল, বেতকায় ফিরে দু-একদিনের মধ্যে মা-বাবা-ভাইবোনদের নিয়ে চলে আসবে। তারপর এখান থেকেই ত্রিপুরায় রওনা হবে।

banglabooks.in

নেই। একটু অবাকই হল বিনয়। এই ধরনের গ্রামের মেয়েরা লাজুকই হয়। কিন্তু শেখরনাথ ঝানু উকিলদের মতো জেরা করেননি, সাধারণ কৌতূহলে তার মা-বাবা সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন, এতে এমন ভয় পাওয়ার কারণ কী থাকতে পারে? মেয়েটার আচরণ বেশ অস্বাভাবিকই মনে হল।

অথচ তার স্বামী বৃন্দাবনের কথায় কোনওরকম অস্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। খুব স্বাভাবিকভাবেই কোন পরিস্থিতিতে তাদের দেশ ছাড়তে হয়েছে তা বলেছিল।

শেখরনাথ মায়াকে খুব সম্ভব সেভাবে লক্ষ করেননি। সস্নেহে বললেন, 'যাও, তোমরা কাজ কর।'

পরের জমিটা হরিপদর। সে তার বাবা, মা এবং একটি ছোট ভাই—ফ্যামিলির সবাই মিলে জমি সাফ করছে।

হরিপদ এবং তার মা-বাবার সঙ্গে আগেই আলাপ হয়েছে বিনয়ের। শেখরনাথেরও। হরিপদর মা হল দুর্গা, বাপ রসময়, ছোট ভাইয়ের নাম গোপাল। হরিপদর এখনও বিয়ে হয়নি। ওরা খুলনা জেলার লোক।

হরিপদ একজন গুণী যুবক। শিল্পী। তার গানে বিশ্বজিৎ, শেখরনাথ, বিনয় থেকে শুরু করে সেটেলমেন্টের সবাই মুগ্ধ।

রসময় আর দুর্গা জমির এধারে আগাছা পরিষ্কার করছিল। খানিকটা দূরে একটা মাঝারি গাছের চারপাশে বুনো ঘাসের ঘন জঙ্গল। ধারালো বর্মি দা দিয়ে সেগুলো কাটছে গোপাল আর হরিপদ।

রসময় আর দুর্গা শেখরনাথ এবং বিনয়কে দেখে সসম্ভ্রমে এগিয়ে এসেছিল। কিছু বলতে যাবে, আচমকা গোপালের আর্ত তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এল।

সবাই সচকিত হয়ে সেদিকে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কে তাদের বুকের ভেতরটা হিম হয়ে যায়।

বিনয় এমন দৃশ্য আগে আর কখনও দেখেনি। যে গাছটার চারপাশের ঘাস কাটছিল দুই ভাই সেখানে একটা কালো কুচকুচে সাপ, প্রায় পাঁচ ফুটের মতো লম্বা, ল্যাজের ওপর ভর দিয়ে হরিপদর মুখোমুখি খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। বিশাল ফণায় সাদা চক্রের মতো দাগ, তার হিংস্র চোখ দুটো জ্বলছে। হরিপদ আর সাপটার মাঝখানে দূরত্ব মাত্র ফুট তিনেক। বিনয় সাপ চেনে না, তবে তার মনে হল, ওটা সাংঘাতিক বিষাক্ত। বুকের ভেতরটা কনকনে ঠান্ডা, কিন্তু সারা শরীর লহমায় ঘামে ভিজে গেছে।

ওদিকে গোপাল চিৎকার করেই ঘাড়মুখ গুঁজে লুটিয়ে পড়েছে, এখন আর তার গলা থেকে এতটুকু আওয়াজ বেরুচ্ছে না। ঘাড় ফিরিয়ে শেখরনাথ, দুর্গা এবং রসময়ের দিকে যে তাকাবে, সেই বিনয়ের শক্তিটুকুও কেউ যেন হরণ করে নিয়েছে। জিভটা ভয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

প্রাক্তন বিপ্লবীটি, মৃত্যু যাঁর কাছে কোনও ঘটনাই নয়, পাশ থেকে তাঁর ত্রস্ত, কাঁপা কাঁপা, শুষ্ক কণ্ঠস্বর বিনয়ের কানে এল, 'সর্বনাশ।' ওটা কাল কেউটে। কপালে ছোবল মারলে কয়েক সেকেন্ডে শেষ।'

কিন্তু বেতকায় ফেরার পথে খবর পাওয়া গেল, বেতকায় একতরফা খুনখারাপি, আগুন, জোর করে নারীহরণ চলছে। তাদের পরিবারের সবাই শেষ হয়ে গেছে। সিরাজদিঘায় যে ফিরবে তারও উপায় নেই, বেড়া আগুনের মতো দাঙ্গা সেখানেও ছড়িয়ে পড়েছে। বন্ধু এবং তার বাড়ির লোকজন বেঁচে আছে কি না, জানা যায়নি।

বৃন্দাবন আর বউ একটা বিরাট খালে পুরো একটা দিন ঠাসা কচুরিপানার ভেতর লুকিয়ে ছিল। তারপর রাত্তিরে খালের জল আর কচুরিপানা ঠেলে ঠেলে কীভাবে যে মুন্সিগঞ্জ স্টিমারঘাটায় চলে গিয়েছিল, তারাই জানে। না, ত্রিপুরা যাওয়া হয়নি। মুন্সিগঞ্জ থেকে রিফিউজিদের জন্য নির্দিষ্ট স্টিমারে চেপে দমবন্ধ ভিড়ে চলে এসেছিল গোয়ালন্দে। সেখান থেকে ট্রেনে শিয়ালদায়। ক'দিন সেখানকার নরককুণ্ডে কাটিয়ে দমদমের রিলিফ ক্যাম্পে। এক বছরেরও বেশি সেখানে কাটিয়ে আন্দামানে এসেছে।

প্রায় সব ছিন্নমূল মানুষের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আতঙ্কের ইতিহাস। বৃন্দাবনের বেলায় আলাদা আর কী হবে?

সেই বউটি জলডেঙ্গুয়া কাটা বন্ধ রেখে কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শাড়ির আঁচল দিয়ে গালগলা কপাল পুঁছে নিল। তারপর বড় বড় লাজুক চোখে শেখরনাথকে দেখতে লাগল। প্রাক্তন এই বিপ্লবী সম্পর্কে সে খুব সম্ভব কিছু কিছু শুনেছে।

শেখরনাথ বউটিকে কাছে ডেকে জিগ্যেস করলেন, 'তোমার দেশ কোথায়, নাম কী?'

চেহারার মতো মেয়েটির কণ্ঠস্বর ভারী মিষ্টি। সে জানায়, তাদের বাড়িও ঢাকা জেলায়, মানিকগঞ্জের সোনাদিঘি গ্রামে। তার নাম মায়া।

'কে কে আছে তোমার? বাবা মা ভাই বোন?'

বিনয় লক্ষ করল, মেয়েটার চোখেমুখে কেমন যেন ভয়ের ছায়া পড়েছে। মুখ নামিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল সে। তার কেউ

banglabooks.in

রসময় আর দুর্গার সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। তারা হয়তো বুঝতে পেরেছে, তাদের গুণী ছেলেটির আয়ু আর কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র।

সূর্য এর মধ্যে পুব দিকের পাহাড়ের মাথা ছাপিয়ে অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে। হলকার মতো রোদের তাপ ছড়িয়ে পড়েছে দুর্গম এই উপত্যকায়। রোদে সাপটার কালো পিছল শরীরটা ঝকঝক করছে। মাঝে মাঝে সেটার মুখ থেকে সরু লিকলিকে জিভটা বেরিয়ে আসছে।

বিনয়ের মনে হচ্ছিল সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। শরীরের সব হাড় যেন আলগা হয়ে গেছে। সে এবার হুড়মুড় করে আছড়ে পড়বে। তারই মধ্যে ঝাপসাভাবে যেন দেখতে পেল হরিপদ সাপটার চোখে চোখ রেখে অনড় দাঁড়িয়ে রয়েছে। পলকহীন একটা মানুষ এবং একটা বিষধর ভয়ংকর প্রাণীর মধ্যে চলছে প্রবল স্নায়ুযুদ্ধ।

একেকটা মুহূর্ত যেন একশো বছরের মতো দীর্ঘ, তা যেন ফুরোবে না। আচমকা, বিদ্যুৎ গতিতে আন্দামানের তীব্র, শানিত রোদ চিরে একটা ঝিলিক খেলে গেল।

হৃৎপিণ্ডে তীব্র ঝাঁকুনি খেল যেন বিনয়। শিথিল স্নায়ুমণ্ডলীতে আবার পুরানো জোর ফিরে এসেছে। সে দেখতে পেল সেই সাপটার মুণ্ডু গলার কাছ থেকে সাত আট হাত দূরে ছিটকে পড়েছে, ধড়টা মাটির ওপর মোচড় দিতে দিতে পাক খেয়ে চলেছে। আর হরিপদ ফের ঘাসবনে দা চালিয়ে যাচ্ছে।

শেখরনাথের খুব সম্ভব শ্বাস আটকে গিয়েছিল। জোরে জোরে ফুসফুসে বারকয়েক বাতাস টেনে ব্যগ্র স্বরে বললেন, 'চল, হরিপদর কাছে যাই।' বলে একরকম দৌড়াতে শুরু করলেন। বিনয়ও তাঁর পাশাপাশি ছুটছে।

এদিকে দুর্গা আছাড়ি-পিছাড়ি খেতে খেতে ছেলের কাছে চলেছে। তার সঙ্গে রসময়। দুর্গা সমানে কাঁদছে আর জড়ানো জড়ানো বিকৃত স্বরে বলে চলেছে, 'হে ভগবান, হে মা মনসা তুমি আমার ছেইলেটারে বাঁচায়ি দেছ। তোমাদের দয়া, তোমাদের দয়া—'

বিনয়রা কাছে চলে আসতে ঘাস কাটা বন্ধ করে সোজা হয়ে দাঁড়াল হরিপদ। ঝকঝকে দাঁত মেলে ভারী সরল, নিষ্পাপ মুখে একটু হাসল। বলল, 'আপনিরা বড় ডরায়ি গেছিলেন—না?' সে হয়তো সাপটাকে মারার পর দূর থেকে বিনয়দের ভয়ার্ত মুখগুলো লক্ষ করেছিল।

ওধারে গোপালও উঠে এসে বিহ্বলের মতো বড় ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

দুর্গা ছেলেকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে তার বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলে যাচ্ছে, 'ও আমার সোনা রে, যমের মুখ থিকি ফিরি আসছিস রে। আমি পরের পুন্নিমায় হরির লুট দেব।'

অনেক কষ্টে মাকে শান্ত করে তার পাশে দাঁড় করাল হরিপদ। হইচই কান্নাকাটি শুনে পাশের জমিগুলো থেকে অনেকে ছুটে এসেছে। এবং ঘটনাটা জেনে ফেলেছে।

শেখরনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'সাপটা কোথায় ছিল— ঘাসের জঙ্গলে?'

'না।' পাশের গাছটা দেখিয়ে হরিপদ বলল, 'ওই গাছের মাথাতি। হঠাৎ ঝপ করি একটা আওয়াজ হল। দেখি যম আমার সামনে খাড়োয়ি (দাঁড়িয়ে) আছে। হয় আমি মরব, না হলি ও। আমার এই বয়সে মরার সাদ (সাধ) লেই। দেলাম হাতের দা-খান চালায়ে। শালো নিপাতি হয়ে গেল।'

সাপটার মুণ্ডু এক জায়গায়, ধড় আরেক জায়গায়। ধড়ের ধড়ফড়ানি এখন থেমে গেছে। বনবিভাগের একজন কর্মী দৌড়ে গিয়ে কেরোসিনের টিন নিয়ে এল। সাপটার গায়ে-মাথায় কেরোসিন ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল সে। যারা ভিড় জমিয়েছে, তারা সাপের শেষকৃত্য দেখতে লাগল।

নিচু গলায় শেখরনাথ বিনয়কে বললেন, 'ছেলেটার কী দুরন্ত সাহস। কী শক্ত নার্ভ। আমি এখন বিপদের মুখে হয়তো মরিয়া হয়ে দা চালিয়ে দিতাম, তারপরেই ফেন্ট হয়ে পড়ে যেতাম। আর হরিপদকে দেখলে, কেমন নির্বিকার হয়ে ঘাস কাটতে শুরু করেছিল। আমার ধারণা, কালাপানি পাড়ি দিয়ে যারা এই দ্বীপে এসেছে, সবাই ওরই মতো। দে আর ইনভিনসিবল। এখানেই নতুন দেশ ওরা গড়ে তুলবে।'

বিনয় প্রায় এই কথাগুলোই একটু অন্যভাবে ভাবছিল। হরিপদ নামে যুবকটিকে এ কদিন দেখছে সে লাজুক, নম্র, বিনয়ী এবং একজন চমৎকার গাইয়ে। গানে গানে সবাইকে মোহিত করে দিয়েছে। কে ভাবতে পেরেছিল সে এভাবে দা চালাতে পারে। মানুষ সত্যিই অপরাজেয়।

॥ নয় ॥

দু'দিন পর সন্ধের আগে আগে চাল, ডাল, আটা, আলু, তেল, মশলা, গুঁড়ো দুধ ইত্যাদি নিয়ে একটা লরি সরাসরি ক্যাম্প অফিসের সামনে এসে থামল। কলোনাইজেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট পরিতোষ বণিক খুবই চিন্তায় ছিল। কী কী জিনিস এখানে দরকার তার তালিকা নিয়ে বিশ্বজিৎ সেই যে পোর্ট ব্লেয়ার চলে গিয়েছিলেন তারপর তিনি একেবারে চুপচাপ। পরিতোষের দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, বিশ্বজিৎ যেরকম ব্যস্ত মানুষ, অনেকগুলো দপ্তরের দায়িত্ব তাঁকে সামলাতে হয়—হয়তো সেটেলমেন্টের ব্যাপারটা তাঁর মাথা থেকে বেরিয়ে গিয়ে থাকবে। এদিকে দু-তিন দিনের ভেতর জেফ্রি পয়েন্টে রসদ এসে না পৌঁছুলে মহা সমস্যা হয়ে যাবে। কিন্তু না, বিশ্বজিৎ ভুলে যাননি। লরি বোঝাই করে ঠিক পাঠিয়ে দিয়েছেন।

অন্যদিনের মতো উদ্বাস্তুদের সঙ্গে জমি থেকে বিনয় আর শেখরনাথ ফিরে এসেছিলেন। সমুদ্র থেকে হাতমুখ ধুয়ে এসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে সবাই চা'টা খাচ্ছিল। লরি দেখে উদ্বাস্তুরা সেখানে চলে গেল। পায়ে পায়ে বিনয়রাও গেল।

পরিতোষ, লা ডিন, ধনপত এবং পুনর্বাসন আর বনদপ্তরের কর্মীরা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। লরিতে অগুনতি চটের বস্তা, সারি সারি টিনের আর কার্ডবোর্ডের বাক্স। তক্ষুনি মাল নামানোর ব্যবস্থা হয়।

কর্মীরা কাঁধে পিঠে বস্তাটস্তা চাপিয়ে ক্যাম্প অফিসের পেছন দিকের গুদাম ঘরে নিয়ে রাখতে থাকে।

লরির ড্রাইভার শেখরনাথ আর পরিতোষের জন্য দুটো সাদা খামের চিঠি নিয়ে এসেছিল, বিনয়ের জন্য একটা বড় প্যাকেট বিশ্বজিৎ পাঠিয়েছেন। ড্রাইভার তিনজনকে সেগুলো বুঝিয়ে দিল।

পরিতোষ তক্ষুনি তার খামটা খুলে চিঠি বার করল। দ্রুত পড়ে নিয়ে বিনয়দের বলল, 'সারের সব দিকে খেয়াল আছে। এদিকে আমি চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠছিলাম। সার লেখছেন এইবার কইলকাতা থিকা যে মাল আইছে, পোর্ট ব্লেয়ারের বিজনেসম্যানরা হেগুলান (সেগুলো) খালাস করতে তিন দিনের জাগায় (জায়গায়) নয় দিন লাগাইছে। হের পর সার চাউল ডাইলের অর্ডার দিছেন। মাল আইতে হেই লেইগা (সেজন্য) এত দেরি অইছে। যাউক, আমার ট্যানশান কমল।'

শেখরনাথও তাঁর চিঠিটি পড়ে ফেলেছেন। বিনয়কে বললেন, 'তোমার সম্বন্ধে বিশু অনেক কথা লিখেছে। রিফিউজি সেটেলমেন্ট কীভাবে গড়ে উঠছে তা তো তুমি নিজের চোখেই দেখছ। বিশুকে তুমি বলেছ, পেনাল কলোনি দেখাবে। সে সম্বন্ধে কাগজে লিখবে। বিশু লিখেছে আমি যেন তোমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাই। কাছেই, দুটো পাহাড়ের পর একটা বড় পেনাল কলোনি আছে। খুব শিগগিরই তোমাকে নিয়ে ওখানে যাব। লেখার প্রচুর মেটিরিয়াল পেয়ে যাবে।'

এতবড় একটা সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। উৎসুক সুরে বিনয় বলল, 'নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে যাব।' বলল বটে, কিন্তু পরক্ষণে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। হাতের প্যাকেটটা

banglabooks.in

বেশ ভারী। বোঝাই যাচ্ছে, প্রচুর কাগজপত্র রয়েছে ওটার ভেতর। প্যাকেটে বিশ্বজিতের চিঠি নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু সে চিঠি আর কত বড় হতে পারে? তার মনে হল, ক'দিন আগে এখান থেকে বিশ্বজিৎ যখন পোর্ট ব্লেয়ারে যান, তাঁর হাতে কলকাতা পাঠাবার জন্য শুধু রিপোর্টই নয়, ক'টা চিঠিও পাঠিয়েছিল। খুব সম্ভব সেগুলোর জবাব এসেছে। বিনয় উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল।

এদিকে সন্ধে নেমে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে পুনর্বাসন বিভাগের কর্মীরা আলো জ্বালিয়ে দিয়েছেন। বিনয় বলল, 'কাকা, মনে হচ্ছে আমার অনেকগুলো চিঠি এসেছে। মনে হচ্ছে কলকাতা থেকে। ঘরে গিয়ে দেখি—'

শেখরনাথ বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাও। আমি এখানে এদের সঙ্গে একটু গল্প করি।'

বিনয় তাদের ঘরে চলে এল। ঘরে জোরালো লণ্ঠন জ্বলছিল। যে কমিটির ওপর আলো জ্বালাবার দায়িত্ব তাদের কোনওদিনই ভুল হয় না; সন্ধে নামতে না-নামতেই জ্বেলে দিয়ে যায়।

হাতের প্যাকেটটার মুখ খুলে টেবলের ওপর রেখে চেয়ারে বসল বিনয়; তারপর প্যাকেটটার ভেতর থেকে পাঁচখানা খাম বার করল। পাঁচটা খামের ওপরেই তার নাম, পোর্ট ব্লেয়ারে বিশ্বজিৎ রাহার বাংলোর ঠিকনা এবং নিচে কোণের দিকে প্রেরকের নাম লেখা আছে। শুধু একটা খামে গোটা গোটা পরিচ্ছন্ন হরফে তার আন্দামানের নাম-ঠিকানাই শুধু রয়েছে। কে চিঠিটা লিখেছে তার নাম নেই।

প্রথম চিঠি বিশ্বজিতের। তিনি লিখেছেন, 'প্রিয়বরেষু, কাকা জেফ্রি পয়েন্টে গেছেন। তাঁর কাছ থেকে ব্রিটিশ আমলের আন্দামান সম্পর্কে যতটা পারেন জেনে নেবেন। এই দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে ওঁর মতো বিশেষজ্ঞ আর জীবিতদের মধ্যে কেউ নেই। আশা করি আপনার কাজকর্ম ভালো চলছে। কলকাতায় পাঠানোর জন্য চিঠি এবং প্রতিবেদন, যা-যা এর মধ্যে লিখেছেন, যে ড্রাইভারটি লরিতে মালপত্র নিয়ে গেছে তার হাতে দেবেন। পাওয়ামাত্র সেগুলো পাঠানোর ব্যবস্থা করব। আপাতত এখানেই শেষ করছি।—বিশ্বজিৎ।'

দ্বিতীয় চিঠিটি 'নতুন ভারত'-এর চিফ রিপোর্টার প্রসাদ লাহিড়ির। তিনি লিখেছেন—

'প্রিয় বিনয়, আন্দামান থেকে তোমার পাঠানো তিনটি প্রতিবেদন পেয়েছি। আমাদের কাগজে ছাপাও হয়ে গেছে। পাঠকদের রেসপন্স দুর্দান্ত। এডিটর জগদীশ গুহঠাকুরতা খুব খুশি। আমাকে এবং নিউজ এডিটর তারাপদদাকে তাঁর চেম্বারে ডেকে নিয়ে তোমার লেখাগুলোর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। অবিলম্বে আরও লেখা পাঠাও। তোমাকে যেমন বলে দিয়েছিলাম, নিশ্চয়ই সেসব মনে আছে। শুরু রিফিউজি সেটেলমেন্ট নয়, পেনাল কলোনি, ওখানকার ট্রাইবালদের লাইফ, সেলুলার জেলের বর্তমান অবস্থা, তার ইতিহাস, প্রাকৃতিক পরিবেশ—কোনও কিছুই বাদ দেবে না।

'তোমার লেখাগুলোর সঙ্গে ছবি থাকলে গুরুত্ব আরও বাড়ত। রিপোর্টিংয়ের সঙ্গে ফোটোটা খুব জরুরি। আমাদের একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে। তোমাকে একটা ক্যামেরা দেওয়া উচিত ছিল। জগদীশবাবু বলেছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। যতদিন না ওটা পৌঁছাচ্ছে, ওখানকার কারওকে দিয়ে যদি ফোটো পাঠাতে পার, সেই চেষ্টা করো।

'এবার কলকাতার কথা জানাই। তুমি আন্দামানে যাবার আগেই রিফিউজিদের নিয়ে নানারকম মুভমেন্টে শহরটা অস্থির হয়ে উঠেছিল। এখন একেবারে উত্তাল। তুমি দেখে গেছ, লেফট পার্টিগুলোর অর্গানাইজেশন 'ইউনাইটেড সেন্ট্রাল রিফিউজি কাউন্সিল' (আর.এস.পি বাদে), সংক্ষেপে ইউসিআরসি, 'রিফিউজি সেন্ট্রাল রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল,' সংক্ষেপে আর সি আর সি, 'দক্ষিণ কলিকাতা শহরতলি বাস্তুহারা সংহতি'—এইসব সংগঠন রোজ সারা শহর জুড়ে কত যে মিছিল বার করছে তার লেখাজোখা নেই। শুধু রিফিউজিদের নিয়ে মিছিল, মিটিং আর স্লোগান।

কলকাতার চারপাশে জলাজমি পতিত জমি আর হোগলাবনে উদ্বাস্তুরা অগুনতি জবরদখল কলোনি বসিয়েছে, সেসব কলোনির নানা বিবরণ 'নতুন ভারত'-এ দিনের পর দিন তুমি লিখে গেছ। গুন্ডাবাহিনী দিয়ে জমির মালিকরা তাদের উৎখাত করতে চেয়েছে। উদ্বাস্তুরা তাদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে তাদের দখল কায়েম রেখে চলেছে। কিন্তু মালিকপক্ষ এবার অন্য পথ ধরেছে। সরকারের ওপর চাপ দিয়ে বাস্তুহারাদের কলোনিগুলো থেকে উচ্ছেদ করবে, এমন একটা বিল আনতে চলেছে। ইউ সি আর সি, আর সি আর সি এবং উদ্বাস্তুদের অন্য সংগঠনগুলো এই উচ্ছেদ বিলের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামের ডাক দিয়েছে। কলকাতা খুব শিগগিরই বিশাল রণক্ষেত্র হয়ে উঠতে চলেছে। কত যে রক্তক্ষয় হবে, কে জানে। সুষ্ঠু পুনর্বাসনের পরিকল্পনা নেই, পোড়ো জমি, জলা উদ্ধার করে পূর্ব পাকিস্তানের ছিন্নমূল মানুষগুলো কোনওরকমে মাথা গোঁজার একটু জায়গা করে নিতে চাইছে সেটাও তাদের দেওয়া হবে না। তাহলে লক্ষ লক্ষ এই মানুষের কী ভবিষ্যৎ?

'যা-ই হোক, কলকাতার এই রিফিউজি মুভমেন্টের অ্যাসাইনমেন্টটা পাওয়ার জন্য রমেন বিশ্বাস আমাকে আর তারাপদদাকে খুব ধরাধরি করেছিল। লোকটা ভালো নয়, তোমাকে ভীষণ ঈর্ষা করে, তুমি যে ভালো কাজ করছ সেটা ওর দু'চোখের বিষ। আমরা ওকে অ্যাসাইনমেন্টটা দিইনি, দিয়েছি সুধেন্দুকে। জগদীশবাবু চান, তুমি ফিরে এলে তোমাকেই এটা দেওয়া হবে।

'আশা করি ভালো আছ। তোমার চিঠি এবং প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষা করে থাকব।—ইতি প্রসাদদা।'

চিঠিটা পড়ে মন ভালো হয়ে গেল। তার লেখার সমাদর হয়েছে, পাঠকরা তার কাছ থেকে আন্দামান দ্বীপমালা সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানার জন্য আগ্রহী, এটা তার উদ্দীপনাকে যেন উসকে দিতে লাগল।

সবচেয়ে বড় কথা, রমেন বিশ্বাসকে কলকাতার উদ্বাস্তু আন্দোলন কভার করার দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। এই কুচুটে, হিংসুটে ঈর্ষাকাতর লোকটাকে বিনয় যে আদৌ পছন্দ করে না প্রসাদদারা তা জানেন। ওঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল বিনয়ের।

তৃতীয় চিঠিটা আনন্দর। খুবই সংক্ষিপ্ত চিঠি। সে লিখেছে, বিনয়ের জন্য তাদের দুশ্চিন্তা ছিল। সমুদ্র পাড়ি দিয়ে অতটা পথ গেছে! চিন্তাটা স্বাভাবিক। তার পৌঁছানো সংবাদ পেয়ে আনন্দদারা খুশি। বিনয়ের লেখা তারা কাগজে পড়ছে। খুব আন্তরিক লেখা, মনকে নাড়া দিয়ে যায়। তাদের বাড়ির সবাই ভালো আছে। সুধাদের সঙ্গে এর মধ্যে দেখা হয়নি। খুব শিগগিরই একদিন সুনীতিকে নিয়ে তাদের বাড়ি যাবে। বিনয় যেন নিয়মিত চিঠি লেখে ইত্যাদি ইত্যাদি।

চতুর্থ চিঠিটা সুধার। সে লিখেছে:

'স্নেহের বিনু, তোর চিঠি আসতে বেশ কয়েকদিন লাগল। তুই বলে গিয়েছিলি, আন্দামান থেকে কলকাতায় চিঠিপত্র পৌঁছাতে অনেক সময় লাগে। তবু ভাবনা হয় বইকি। যাক, তোর চিঠি পেয়ে চিন্তা কাটল। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে আছিস। লিখেছিস চারদিকে জঙ্গল, পাহাড়, সাপখোপ, বড় বড় চেলা বিছে, জোঁক, সমুদ্রে হাঙর। এসব জেনে ভীষণ ভয় হয়। খুব সাবধানে থাকবি। সময়মতো খাওয়াদাওয়া করবি। অবশ্য ওই ঘোর জঙ্গলে খাবারদাবার কী জোটে, সে সম্বন্ধে কিছু লিখিসনি। মনে হচ্ছে, খাওয়া দাওয়ার খুব অসুবিধা হচ্ছে। কলকাতায় ভালো চাকরি নিয়ে কত আরামে থাকতে পারতিস কিন্তু ঘাড়ে ভূত চাপল, খবরের কাগজে কাজ করবি। এখন বোঝা কষ্ট কাকে বলে। নিজেই এমন একটা কাজ বেছে নিয়েছিস। কে আর কী করতে পারে?

banglabooks.in

'এবার এখানকার খবর জানাচ্ছি। আমার দাদাশ্বশুর, তোদের দ্বারিকদাদুকে নিয়ে ক'দিন যমে-মানুষে টানাটানি গেল। ধুম জ্বর, সেই জ্বর আর রেমিশন হয় না। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট। মনে হচ্ছিল বাঁচানো যাবে না। শেষ পর্যন্ত মা কালী, মা দুর্গা, মা লক্ষ্মীদের করুণায় ধাক্কাটা সামলে উঠতে পেরেছেন। এ-যাত্রা বেঁচেই গেলেন। তবে ভীষণ কাহিল হয়ে পড়েছেন। কাল ডাক্তার অন্নপথ্য দিতে বলেছেন। এই বয়সে শরীর পুরোপুরি সেরে উঠতে কতদিন লেগে যাবে, ভগবানই জানেন। আমার জেঠশাশুড়িকে যেমন দেখে গিয়েছিলি তেমনই আছেন। ওই ধুঁকতে ধুঁকতে টিকে থাকা। তোর হিরণদার অফিসে কাজের চাপ ভীষণ বেড়েছে। তার ওপর দাদাশ্বশুরের জন্য রাত জাগা। বেচারি একেবারে হিমশিম খেয়ে গেছে। আমার এবং উমারও একই হাল।

'সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার ব্যাপার, রাজদিয়া থেকে হেমদাদুর কোনও চিঠিপত্র পাচ্ছি না। দেশের কী হাল, ওঁরা কী অবস্থায় আছেন, কিছুই বুঝতে পারছি না। নিত্য দাসের মারফত দাদুর চিঠিটিঠি পাই। তুই আন্দামানে চলে যাবার পর থেকে সে একবারও আমাদের বাড়ি আসেনি। কসবায় ওদের ঠিকানা জানি। ভাবছি, তোর হিরণদাকে সামনের রবিবার নিত্য দাসের বাড়ি পাঠাব। দেখা যাক, রাজদিয়ার কোনও খবর পাওয়া যায় কিনা।

'যুগল অবশ্য ফি সপ্তাহে একবার দেখা করে যায়। ওদের কলোনি নিয়ে খুব হুজ্জুত চলছে। সরকার নাকি বিল আনতে চলেছে জবরদখল কলোনি থেকে উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদ করবে। এই নিয়ে রাজনৈতিক ক'টা দল তুমুল আন্দোলন শুরু করেছে। যুগলরাও সেই আন্দোলনে রয়েছে। তবে একটা সুখবর মুকুন্দপুরে আশু মাস্টারমশাইয়ের স্কুল খুব জমে উঠেছে। যুগলরা সবাই চায় তাদের জীবন তো নিরক্ষর হয়েই কেটে গেল। তাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হোক। পেটে বিদ্যা না থাকলে এদেশে এসে টিকে থাকা যাবে না।

'আজ এখানেই শেষ করছি। তুই আমাদের বুকভরা স্নেহ-ভালোবাসা নিস। চিঠি পাওয়া মাত্র উত্তর দিবি। —ইতি ছোটদি'।

চিঠিটা ভাঁজ করে খামের ভেতর পুরে রাখল বিনয়।

বাকি রইল শেষ চিঠিটা। খামের ওপর সুন্দর গোটা গোটা অক্ষরে তার নাম লেখা রয়েছে: শ্রীবিনয়কুমার বসু। অন্য খামগুলোর তলায় বাঁ দিকে প্রেরকের নাম রয়েছে। কিন্তু এটার তলায় সেরকম কিছু নেই। হাতের লেখাটাও চেনা চেনা মনে হচ্ছে না। কে হতে পারে? কার চিঠি?

রীতিমতো কৌতূহলই হল বিনয়ের। হাত বাড়িয়ে খামটা তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে খুলে ফেলল সে। খুব বড় চিঠি নয়। পুরোটা পড়ার আগে একেবারে তলার দিকটা দেখে নিল। সেখানে ঝুমার নাম লেখা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে তীব্র ঝংকারের মতো শিহরন খেলে গেল।

সুধা আনন্দ প্রসাদ লাহিড়িকে চিঠি লিখেছিল বিনয়। ঝুমা বাদ। কিন্তু সে যে তাকে চিঠি লিখবে, কে ভাবতে পেরেছিল। রুদ্ধশ্বাসে বিনয় পড়তে লাগল।

'প্রিয়তম, তুমি আন্দামানে যাবার সময় কথা দিয়ে গিয়েছিলে, দু-তিনদিন পর পর তুমি আমাকে চিঠি লিখবে। তারই জন্য আশায় আশায় প্রতি মুহূর্ত কাটিয়ে গেছি। রোজ পোস্টম্যান আসে, বাড়ির অন্য সবার চিঠি দিয়ে যায়। যার চিঠির জন্য চোখ মেলে বসে থাকি সেটাই শুধু আসে না। ব্যর্থ আমার প্রতীক্ষা।

'হঠাৎ একদিন শুনলাম, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবাইকে তুমি চিঠি লিখেছ, শুধু আমিই বাদ। শুনে আমার যে কী কষ্ট, কী যাতনা, মনে হচ্ছিল বুকের ভেতর জ্বলন্ত শেল বিঁধে যাচ্ছে। ক'টা দিন ভালো করে ঘুমোতে পারিনি, খেতে পারিনি। উদ্‌ভ্রান্তের মতো কাটিয়ে দিয়েছি।

'জানো না, তুমি রয়েছ আমার জীবনজুড়ে? তুমি যে আমার কতখানি, কী করে বোঝাই? চোখ মেললেও তোমাকে দেখতে পাই, চোখ খুললেও তুমি! আমার ছোট্ট ভুবনে শুধু তুমি, তুমি আর তুমি!

'আন্দামান তো কলকাতা থেকে মাত্র আটশো পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূরে। অন্য কোনও গ্রহে নয়। এতটুকু দূরত্বে গিয়ে, মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে তুমি আমাকে ভুলে গেলে? অন্যদের চিঠি লেখার আগে আমাকেই তো তোমার লেখার কথা। কী আমার অপরাধ, কোথায় আমার ত্রুটি, তার তলকূল পাচ্ছি না।

'শেষ পর্যন্ত কতরকম চাতুরি করে আনন্দমামার কাছ থেকে তোমার ঠিকানা জোগাড় করেছি তা আমিই জানি। ঠিকানাটা পেয়েই চিঠি লিখতে বসে গেলাম।

'অন্যের চিঠিতে জানতে পেরেছি তুমি যেখানে আছ সেই জায়গাটায় গভীর জঙ্গল, পাশেই সমুদ্র। নিশ্চয়ই খুব অস্বাস্থ্যকর এলাকা। খুব সাবধানে থাকবে। নিজের শরীরের ওপর যত্ন নিও।

'একটাই মিনতি, আমাকে ভুলো না, ভুলো না, ভুলো না। তোমাকে ঘিরে, তোমাকে নিয়েই আমার একমাত্র স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন যদি পূরণ না হয়, আমি ভেঙে চুরমার হয়ে যাব।

'তুমি চলে যাবার পর থেকে সারাক্ষণ আমি অস্থির হয়ে থাকি। আমাকে আর কষ্ট দিও না। এই চিঠি পেয়েই উত্তর দেবে। ইতি তোমার ঝুমা।'

চিঠিটা পড়ার পর স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে বিনয়। সারা শরীরে কেমন একটা অসাড় অসাড় ভাব। জানালার বাইরে, একটু দূরে হ্যাজাক আর জোরালো লণ্ঠনের আলোয় শেখরনাথ উদ্বাস্তুদের সঙ্গে গল্প করছেন। এত আলো তবু তাঁদের যেন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। সব যেন সারি সারি ছায়ামূর্তি। আরও দূরে পশ্চিম আর দক্ষিণ দিকের পাহাড়গুলোকে ঝাপসা দৈত্যের মতো মনে হচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ অনুভূতিশূন্যের মতো কেটে গেল বিনয়ের। তারপর, আচমকা সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলজুড়ে তুমুল আলোড়ন শুরু হয়ে গেল।

পূর্ব বাংলার সুদূর স্বপ্নের মতো এক ভূখণ্ডে সেই কোন অল্প বয়স থেকে দুই কিশোরীকে নিয়ে আরম্ভ হয়েছিল দ্বিধাদ্বন্দ্ব আর টানাপোড়েন। সেই কিশোরীরা এখন ভরপুর যুবতী, বিনয় নিজেও পূর্ণ যুবক। মনে হয় শত আলোকবর্ষ ধরে এই দুই নারীকে নিয়ে নিজের সঙ্গেই তার অবিরল যুদ্ধ চলেছে। কখনও চিরদুঃখী ঝিনুক নাড়ি ধরে টান দেয়, কখনও তীব্র আকর্ষণে তাকে যেন শিকড়সুদ্ধ উপড়ে তার কাছে নিয়ে যায় ঝুমা। এটাই বুঝিবা তার ভবিতব্য।

'রস' আইল্যান্ডে চকিতের জন্য 'চলুঙ্গা' জাহাজে ঝিনুককে দেখার পর থেকে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একদিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল সে। ভুলে গিয়েছিল ঝিনুক যখন নিরুদ্দেশ, জীবনের অপার শূন্যতাকে ধীরে ধীরে ভরিয়ে দিয়েছিল ঝুমা। অসীম আগ্রহে তারই জন্য প্রতীক্ষা করে আছে মেয়েটা। কোনওদিনই রূঢ়ভাবে তাকে সরিয়ে দিতে পারেনি, বলতে পারেনি ঝিনুক ছাড়া অন্য কোনও নারীর কথা সে ভাববে না, ভাবতে পারে না। বরং কলকাতা থেকে আসার সময় ঝুমার হাতে স্বপ্নের একটি ভূমণ্ডল তুলে দিয়ে এসেছিল। শুধু ঝুমাই নয়, তার বাবা-মা-ঠাকুরদা-ঠাকুমা, মামাবাড়ির সবাই তার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

কিন্তু বহুদিন বাদে ঝিনুককে দেখার পর পৃথিবী ওলপালট হয়ে গেছে। যে মেয়েটা কোন ছেলেবেলা থেকে তার শ্বাসবায়ুতে মিশে আছে, তাকে ছাড়া বাঁচতে পারবে না বিনয়। সে ভীরু, সে কাপুরুষ, একনিষ্ঠ হতে কোনও দিনই পারেনি। এজন্য নিজেকে আগেও ধিক্কার দিয়েছে, আজও দিতে লাগল। আর তারই মধ্যে একটা যুক্তি খাড়া করে নিজেকে শক্ত করে নিল।

ঝুমা রূপসী, শিক্ষিতা, বনেদি বংশের মেয়ে। তার বাবার অঢেল অর্থ, বিপুল প্রতিষ্ঠা। তাঁরা চোখের পলকে ঝুমার ঝলমলে, চোখধাঁধানো ভবিষ্যৎ তৈরি করে দিতে পারবেন। একটা আঙুল তুলে ইশারা করলে কলকাতার সেরা সেরা বিত্তবান বংশের উচ্চশিক্ষিত, ঝকঝকে, রূপবান ছেলেরা তাঁদের বাড়ির

banglabooks.in

সামনে ভিড় জমিয়ে দিত। নেহাত ঝুমা বিনয়ের জন্য জেদ ধরে বসেছিল সেজন্য হয়তো অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিশির রামকেশব হেমনলিনীরা রাজি হয়েছিলেন।

কিন্তু ঝিনুক? সে ধর্ষিত। অপমানে, অসম্মানে, অন্তহীন গ্লানিবোধে সে কুঁকড়ে থাকত। একদিন তো ক্ষোভে অভিমানে নিখোঁজই হয়ে গেল। যাদের সঙ্গে সে মিডল আন্দামানে গেছে, তাদের সন্ধান কীভাবে পেল, কে জানে। তারা যে উদ্বাস্তু তা নিয়ে অবশ্য সংশয় নেই। তা না হলে আন্দামানে তাদের আসাই হত না। কিন্তু তারা কেমন মানুষ, তাদের মধ্যে কতটা মর্যাদা নিয়ে সে আছে, তার আশ্রয়দাতারা কি তার বেদনাদায়ক ইতিহাসটা জানে? সেসব তার সঙ্গে দেখা না হলে জানার উপায় নেই।

ঝিনুক পা রাখার একটু জায়গা পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু অন্যের আশ্রয়ে বাকি লম্বা জীবনটা কাটানো কি সম্ভব? যাদের কাছে সে আছে, একদিন তারা বোঝা মনে করে ছুঁড়েও তো ফেলে দিতে পারে। মানুষের পক্ষে কতটা মহানুভব, কত হৃদয়বান হওয়া সম্ভব? তখন?

না, আর ভাবতে পারে না বিনয়। কবে যে ঝিনুকের সঙ্গে দেখা হবে। তার চারপাশ ঘিরে এখন শুধু ঝিনুক, ঝিনুক আর ঝিনুক।

ঝিনুককে নিয়ে কলকাতায় ফিরে গেলে খুবই দুঃখ পাবে ঝুমা, কষ্টে তার বুক চৌচির হয়ে যাবে। কিছুদিন মুহ্যমানের মতো কেটে যাবে তার। খাবে না, ঘুমোবে না। সবার সামনে না হলেও গোপনে অঝোরে কাঁদবে। তারপর? তারপর আহ্নিক গতি বার্ষিক গতির মতো সব কিছু সহজ, স্বাভাবিক হয়ে যাবে। তার জীবন থেকে একদিন দূর নীহারিকায় বিলীন হয়ে যাবে বিনয়।

কতক্ষণ আচ্ছন্নের মতো বসে ছিল, খেয়াল নেই। হঠাৎ শেখরনাথের ডাকে চমকে ওঠে বিনয়।

'বেশ রাত হয়েছে। খাবার দেওয়া শুরু হয়েছে। চল—'

খাওয়ার ইচ্ছা একেবারেই ছিল না বিনয়ের। জীবনের দুই প্রান্তের দুই নারী তাকে ভেতরে ভেতরে এতটাই ব্যাকুল, এতটাই বিচলিত করে রেখেছিল যে খিদে-তেষ্টার বোধটাই নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু 'খেতে ইচ্ছে নেই' বললে শেখরনাথ ছাড়বেন না, তাঁকে হাজারটা কৈফিয়ত দিতে হবে। নিঃশব্দে চিঠিগুলো টেবিলের দেরাজে রেখে ধীরে ধীরে উঠে পড়ল বিনয়।

॥ দশ ॥

তখনও ভালো করে ভোর হয়নি, হঠাৎ বহু মানুষের চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল বিনয় আর শেখরনাথের। বন্ধ দরজার বাইরে থেকে জোরে জোরে ধাক্কাও দিচ্ছে কেউ কেউ।

তারই মধ্যে পরিতোষের গলা শোনা গেল, 'কাকা, কাকা, তরাতরি দুয়ার খোলেন।'

বিনয় এবং শেখরনাথ বিছানা থেকে নেমে পড়েছিলেন। বিনয় লম্বা পায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। শেখরনাথও তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। বাইরে সারি সারি উদ্বিগ্ন মুখ। পরিতোষ এবং পুনর্বাসন দপ্তরের কয়েকজন কর্মচারীর সঙ্গে বেশ কিছু উদ্বাস্তুও রয়েছে। তারা সবাই বয়স্ক পুরুষ এবং মেয়েমানুষ। তাদের মধ্যে খুলনা জেলার সৃষ্টিধর বারুইকেও দেখা গেল। তার উৎকণ্ঠাই সবচেয়ে বেশি। ভেতরকার চাপা ত্রাসে ঘন ঘন ঢোক গিলছে।

বিনয়রা রীতিমতো অবাক তো হয়েছেই। এই ভোরবেলায় এতগুলো লোক আচমকা চলে এসেছে। তাদের মুখচোখের চেহারা দেখে দু'জনের দুশ্চিন্তা হচ্ছিল।

শেখরনাথ ব্যগ্র স্বরে জিগ্যেস করলেন, 'কী ব্যাপার, কী হয়েছে?'

একটি মাঝবয়সি সধবা মেয়েমানুষ, কপালের আধাআধি অবধি ঘোমটা টানা— শেখরনাথকে বলল, 'ছিষ্টিধরের বউয়ের ব্যথা উঠছে। যন্তরনায় কাতরাইতে আছে। একজন ডাক্তর কি দাই না পাইলে মহা বিপদ অইয়া যাইব। আপনে এট্টা কিছু ব্যাবোস্তা করেন।'

সেই পূর্ণগর্ভা বউটির কথা মনে পড়ে গেল বিনয়ের। সেদিন সৃষ্টিধরের সঙ্গে কত কষ্ট করেই না তাদের জমির আগাছা সাফ করছিল। মনে আছে, শেখরনাথ এই সেটেলমেন্টে একজন ডাক্তার পাঠানোর জন্য বিশ্বজিৎকে খবর পাঠিয়েছিলেন। সেই ডাক্তার এখনও এসে পৌঁছায়নি। সরকারি ব্যাপার, অনেকরকম নিয়মকানুন আছে। মুখের কথা খসালেই ব্যবস্থা করা যায় না। এদিকে সৃষ্টিধরের বউটি প্রসব যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। এই মুহূর্তে কীভাবে নির্বিঘ্নে তার সন্তানটির জন্ম হবে ভেবে পেল না বিনয়। হতবুদ্ধির মতো সে তাকিয়ে রইল।

ওধারে শেখরনাথ চকিতে কিছু ভেবে নিলেন। তারপর পুবদিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, 'ওই দিকের তিনটে পাহাড়ের ওধারে যে নতুন রিফিউজি সেটেলমেন্ট বসেছে, শুনেছি সেখানে একজন দাই আছে। চাল ডাল আর অন্য সব মালপত্র নিয়ে সেই যে ট্রাকটা এসেছিল সেটা কি ফিরে গেছে?'

পরিতোষ বলল, 'না কাকা—'

'তাকে রেডি হতে বল, আমাকে নিয়ে ওই সেটেলমেন্টে যাবে। আমি মুখটুখু ধুয়ে বাসি কাপড়চোপড় পালটে নিই।'

পরিতোষ নিজেই দৌড়ে চলে গেল।

বিনয় আগেই ওধারের উদ্বাস্তু কলোনি আর ব্রিটিশ আমলের পেনাল সেটেলমেন্টের খবর পেয়েছে। সেখানে যাবার এই সুযোগটা ছাড়তে চাইল না। আগ্রহের সুরে বলল, 'কাকা, আপনার সঙ্গে যেতে চাই।'

শেখরনাথ একটু হাসলেন।—'বুঝেছি। জার্নালিস্ট তো। ওই দিকের সেটেলমেন্ট টেটেলমেন্ট দেখে কাগজে লিখতে চাও। কিন্তু এবার তো তোমার পক্ষে ওখানে থাকা যাবে না। আমি গিয়েই দাইকে নিয়ে ফিরে আসব।' খানিক ভেবে বললেন, 'এত যখন ইচ্ছে, চল। ওখানকার মাতব্বরদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। পরে গিয়ে বেশ কিছুদিন থেকে ভালো করে ইনফরমেশন জোগাড় করে লিখো। নাও, এখন চটপট তৈরি হয়ে নাও।' পুনর্বাসন দপ্তরের কর্মীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা মেয়েরা যে ব্যারাকে থাকে তার একধারে বাঁশের বেড়াটেড়া দিয়ে আঁতুড়ঘর করে রাখ। আমরা দুপুরের মধ্যে ফিরে আসব। প্রার্থনা কর, তার ভেতর বাচ্চা যেন না হয়ে যায়।'

এমনই উৎকণ্ঠা যে বিনয়দের চা'টা খাওয়া হল না। ট্রাকে ড্রাইভারের পাশে বসে বেরিয়ে পড়লেন।

পাহাড়ের পর পাহাড়। সেগুলোর কোমর বুক পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কালো মসৃণ পিচের রাস্তা। এই রাস্তা বিনয়ের চেনা। ক'দিন আগেই এই পথে ব্যাম্বু ফ্ল্যাট থেকে বিশ্বজিৎদের সঙ্গে সে জেফ্রি পয়েন্টে এসেছিল। ট্রাক কখনও চড়াইতে উঠছে, কখনও উতরাইতে নামছে। রাস্তার একধারে গভীর জঙ্গলে ভরা পাহাড়, অন্য দিকে খাদ। খাদের ওধারে আবার পাহাড়।

ঘণ্টাখানেক চলার পর রাস্তাটা দু'ভাগ হয়ে একটা চলে গেছে সোজা, অন্যটা ডান দিকে। ট্রাকটা ডান পাশের রাস্তাটা ধরল। এদিকটা বিনয়ের পুরোপুরি অচেনা।

খানিকটা যাবার পর দুই পাহাড়ের মাঝখানে অনেকখানি জায়গা মোটামুটি সমতল। তার একধারে টিন কি টালির চাল-দেওয়া কাঠের একতলা কি দোতলা। সব মিলিয়ে প্রায় ষাট-সত্তরটা। এই ধরনের বাড়ি বর্মায় দেখা যায়। বিনয় ছবিতে দেখেছে।

বাড়িগুলো পুরানো, কম করে তিরিশ চল্লিশ বছর আগের তৈরি।

শেখরনাথ বললেন, 'এটা হল পেনাল কলোনি। ব্রিটিশ আমলে গড়ে উঠেছিল। নাম কী জানো?'

বিনয় ঘাড় নাড়ল। —'না।'

'ওয়াণ্ডুর। বর্মায় ওই নামে একটা ছোট শহর আছে। আন্দামানের কলোনিতে এইরকম নাম দেওয়া হল কেন, ভেবে

banglabooks.in

নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছ।'

'তা হচ্ছি।'

'নাইনটিন থার্টি ফাইভের আগে বর্মা ছিল ইন্ডিয়ার একটা অংশ বা প্রভিন্স। সেখান থেকে মার্কামারা ডাকাত, খুনিরা আন্দামানে জেল খাটতে আসত। এদের মধ্যে পুরুষও ছিল, মেয়েও ছিল। তারা আর দেশে ফিরে যায়নি। বিয়েটিয়ে করে এখানেই কলোনি বসিয়েছে। কিন্তু জন্মভূমির কথা ভুলতে পারেনি। তাই নিজেদের কলোনির নাম রেখেছে বর্মার কোনও গ্রাম কি শহরের নামে। সাউথ আন্দামানে এরকম আরও সাত-আটটা কলোনি রয়েছে— মেমিও, মৌলমিন, পোগো এমনি নানা নাম। অবশ্য এই ওয়ান্ডুর বর্মিতে বর্মিতেই শুধু বিয়ে হয়নি। অনেক বর্মি মেয়ে ইন্ডিয়ার অন্য প্রভিন্সের লোকজন, যেমন বাঙালি, শিখ, তামিল, মোপলাদের বিয়ে করেছে। বেশকিছু বর্মি পুরুষও তা-ই। তাদের স্ত্রীরা কেউ পাঠান, কেউ মারাঠি, কেউ বিহারি।'

যেন আশ্চর্য এক রূপকথা শুনছিল বিনয়। অপার কৌতূহলে জিগ্যেস করে, 'এদের বিয়ে কী করে হত?'

'আমি আর কতটুকু বলতে পারব? পরে এসে যখন তুমি কিছুদিন পেনাল কলোনিতে থাকবে, সেই সময় ব্রিটিশ আমলের যে কয়েদিরা বিয়ে করেছে তাদের মুখে ডিটেলে শুনতে পাবে।'

বিনয় আর প্রশ্ন করল না। উইন্ড স্ক্রিনের ভেতর দিয়ে বাইরে তাকাল। পেনাল কলোনি থেকে বেশ খানিকটা দূরে সারি সারি অগুনতি টিন এবং টালির চালের ঘর চোখে পড়ল। অনেকটা পুববাংলার ঘরবাড়ির মতো। সেগুলোর গা ঘেঁষে মাইলখানেক, কি তারও বেশি জায়গা জুড়ে হাল-লাঙল চলছে। বোঝা যায় একসময় ওখানে ঘোর জঙ্গল ছিল; সেসব সাফ করে জমি বার করা হয়েছে। তার ডান পাশে সমুদ্র।

ঘরগুলোর দিকে আঙুল বাড়িয়ে বিনয় জিজ্ঞেস করল, 'মনে হচ্ছে, ওখানে নতুন একটা সেটেলমেন্ট হয়েছে।'

'হ্যাঁ ওটা রিফিউজি সেটেলমেন্ট। জেফ্রি পয়েন্টের সেটেলমেন্টের মাস ছয়েক আগে ওটা বসানো হয়েছে। দেখ এর মধ্যে চাষবাসও শুরু হয়ে গেছে। যে দাইয়ের জন্যে এসেছি, সে ওখানে থাকে।'

কিন্তু উদ্বাস্তু সেটেলমেন্টে যাওয়া হল না। ট্রাক যখন ওয়ান্ডুরের কাছাকাছি এসে পড়েছে হঠাৎ পাশের একটা কাঠের বাড়ি থেকে লুঙ্গি কুর্তা পরা একটা মাঝারি হাইটের লোক— পেটানো মজবুত চেহারা, তামাটে রং, চুলের বেশির ভাগটাই ধবধবে, বয়স ষাট-পঁয়ষট্টি— হইহই করতে করতে রাস্তার মাঝখানে এসে দু'দিকে দু'হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।—'রুখো, রুখো। রুখ যাও—'

অগত্যা ট্রাকটাকে থামতে হল। রাস্তার লোকটা আরও কাছে এসে হিন্দি-উর্দু মেশানো হিন্দুস্থানিতে শেখরনাথকে বলল, 'চাচাজি আপ!'

বিনয় আগেই জেনেছে শেখরনাথ আন্দামানের সার্বজনীন কাকা বা চাচা। তিনি বললেন, 'একটা জরুরি কাজে এখানকার রিফিউজি সেটেলমেন্টে যেতে হচ্ছে। তোরা কেমন আছিস, রঘুবীর সিং? মা ফুন ভালো আছে?'

লোকটি অর্থাৎ রঘুবীর তড়বড় করে বলে, 'আপনার মেহেরবানিতে ঠিক আছি। কিয়া খুশনসিব ম্যাঁয় নে। কত রোজ বাদে আপনাকে দেখতে পেলাম। আইয়ে— আইয়ে— উতারকে আইয়ে—'

'না রঘুবীর, আজ সময় হবে না। রিফিউজি সেটেলমেন্ট থেকে একজনকে নিয়ে আমাকে দুপুরের মধ্যে জেফ্রি পয়েন্টে ফিরে যেতে হবে। তুই রাস্তা থেকে সর। গাড়ি যেতে পারছে না।'

রঘুবীর সরল তো না-ই, সামনের বাড়িটার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে হাঁক পাড়তে লাগল, 'মা ফুন, এ মা ফুন। জলদি নিকালকে আ—'

প্রায় দৌড়েই একটি বর্মি মেয়েমানুষ বেরিয়ে এল। তারও যথেষ্ট বয়স হয়েছে, ষাটের কাছাকাছি তো বটেই। চুল কাঁচাপাকা। মঙ্গোলিয়ানদের মতো চেরা চোখ। এই বয়সেও শরীরের বাঁধুনি অটুট। কিন্তু তার মুখের দিকে তাকালে আঁতকে উঠতে হয়। লম্বা লম্বা কালো দাগ। এলোপাতাড়ি ছুরি চালাবার পর ক্ষত শুকোলে যেমন দেখায় সেইরকম। দেখলে চমকে উঠতে হয়। তার পরনে লুঙ্গি এবং কুর্তা। বর্মি মেয়েদের পোশাক।

রঘুবীর তাকে বলল, 'এই দ্যাখ, চাচাজি এখানে না নেমে সিধা রিফিউজিদের কলোনিতে চলে যাচ্ছে।'

মা ফুন হুলুস্থুল বাধিয়ে দিল।—'কভি নেহি, কভি নেহি। এতকাল পর এসেছেন। আমাদের কোঠিতে না গেলে রাস্তা ছাড়ব না।'

শেখরনাথ বোঝান, দ্রুত জেফ্রি পয়েন্টে না ফিরলে একজনের মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে।

রঘুবীররা এবার একটু থমকে যায়। মা ফুন জিগ্যেস করে, 'কী হয়েছে?'

এখানে আসার উদ্দেশ্যটা জানিয়ে দেন শেখরনাথ।

রঘুবীর বলে, 'ঠিক হ্যায়। রিফিউজি কলোনির ওই দাইকে আমরা চিনি। বাচ্চা পয়দা করায়। নাম মনসা। আপনারা আমাদের কোঠিতে বসুন। চায়-পানি খান। আপনার নাম করে লোক পাঠিয়ে তাকে ডাকিয়ে আনছি। উতারিয়ে— উতারিয়ে—'

মা ফুনও তার সঙ্গে সুর মেলাল। শেখরনাথকে কিছুতেই ছাড়া হবে না। এতদিন বাদে এই এলাকায় এসে তিনি বাড়ির পাশ দিয়ে চলে যাবেন, তা-ই কখনও হয় নাকি? ট্রাকের সামনে তারা দাঁড়িয়ে থাকবে। শেখরনাথদের যেতে হলে তাদের চাপা দিয়ে যেতে হবে।

শেখরনাথ বিপন্ন মুখে একবার বিনয়ের দিকে তাকালেন। তারপর হেসে ফেললেন। 'এদের হাত থেকে নিস্তার নেই। চল, নেমে পড়া যাক। অবশ্য যে জন্যে এখানে আসা, সেটা হয়ে যাবে। মনসা দাই এলেই তাকে নিয়ে জেফ্রি পয়েন্টে ফিরে যাব।'

বিনয় কিছু বলল না। শেখরনাথকে আন্দামানের মানুষজন কতটা ভালোবাসে, কতখানি শ্রদ্ধা করে, তা আরও একবার নিজের চোখেই দেখতে পেল।

রঘুবীররা শেখরনাথ আর বিনয়কে তাদের বাড়ির ভেতর একটা সাজানো গোছানো ঘরে এনে বসাল। সব আসবাব কাঠের আর বেতের। আলমারি, তক্তপোশ, গদিওলা মোড়া, চেয়ার কী নেই নেই! এক দেওয়ালে রেঙ্গুনের সোয়েডামিন প্যাগোডার ফ্রেমে বাঁধানো বিরাট ফটো অন্যদিকে তেমনি ফ্রেমে বাঁধানো শিউশঙ্করজির ছবি। বিনয় আন্দাজ করে নিল মা ফুন বৌদ্ধ এবং রঘুবীর হিন্দু।

মা ফুন অনর্গল, পরিষ্কার হিন্দুস্থানিতে শেখরনাথকে বলতে লাগল, 'আপনাকে দেখে কী খুশি যে হয়েছি! এখানে আরাম করে বসুন। চায়-পানি করে আনি।'

এদিকে শেখরনাথের নাম করে মনসাকে ধরে আনার জন্য পেনাল কলোনির একটি বর্মি ছেলেকে রিফিউজি সেটেলমেন্টে পাঠিয়ে রঘুবীর বিনয়রা যে ঘরে বসে ছিল সেখানে ফিরে এল। কিন্তু চেয়ার বা মোড়ায় বসল না, নিচে কাঠের মেঝেতে থেবড়ে বসে পড়ল।

শেখরনাথ বললেন, 'এটা কী হচ্ছে, উঠে একটা মোড়ায় বোস্।'

জিভ কেটে রঘুবীর যা বলল তা এইরকম। শেখরনাথের মতো একজন সম্মানিত মানুষ, যিনি দেশের আজাদির জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন, তাঁর সামনে উঁচু জায়গায় তার পক্ষে বসা সম্ভব নয়। তার উপযুক্ত জায়গা শেখরনাথের পায়ের তলায়।

শেখরনাথ হাসলেন। —'এদের নিয়ে পারা যায় না।'

রঘুবীর জিগ্যেস করল, 'আপনার তবিয়ত আচ্ছা হ্যায় তো?'

'হ্যাঁ। তোরা কেমন আছিস?'

'আপনার মেহেরবানিতে ঠিক হ্যায়।' কথা বলতে বলতে গভীর আগ্রহে রঘুবীর বারবার বিনয়ের দিকে তাকাচ্ছিল।

শেখরনাথ বললেন, 'তোর ছেলেকে তো মাদ্রাজে

banglabooks.in

পাঠিয়েছিলি। সেখানে ঠিকমতো পড়াশোনা করছে?'

'হ্যাঁ।' রঘুবীর প্রাণ খুলে হাসল। —'ছেলেটা তার মা-বাপের মতো বজ্জাত হয়নি। বিলকুল জেন্টলম্যান। পড়াশোনা ছাড়া আউর কুছু বোঝে না। জজ-ম্যাজিস্টর হবে।' তারপরেই বিনয়কে দেখিয়ে জিগ্যেস করল, 'এই বাবুজিকে তো চিনতে পারলাম না চাচাজি।'

শেখরনাথ বললেন, 'ওই দ্যাখ, তোদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে ভুল হয়ে গেছে। ওর নাম বিনয় বসু। কলকাতার এক আখবরের পত্রকার।' বিনয়কেও রঘুবীরদের সম্বন্ধে জানাল, ওরা একসময় কয়েদি হয়ে আন্দামানে এসেছিল। রঘুবীর ইন্ডিয়ার সেন্ট্রাল প্রভিন্স থেকে, আর মা ফুন এসেছিল বর্মার ওয়ান্ডুর থেকে। তারপর ওদের বিয়ে হয়। একটাই ছেলে। মাদ্রাজে হোস্টেলে থেকে বি.এসসি পড়ছে। খুব ভালো ছাত্র।

বিনয় জানত কালাপানি পাড়ি দিয়ে জাহাজ বোঝাই করে শুধু পুরুষ কয়েদিদেরই সেলুলার জেলে নিয়ে আসা হত। মেয়ে কয়েদিদেরও যে একসময় এই দ্বীপে আনা হয়েছে, এটা তার জানা ছিল না। বর্মি মা ফুনের সঙ্গে কী করে সেন্ট্রাল প্রভিন্সের রঘুবীরের বিয়ে হল, তা নিয়ে ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল কিন্তু সেটা প্রকাশ করা অভদ্রতা। সে চুপ করে থাকে।

এদিকে শেখরনাথের সঙ্গে একজন পত্রকার তাদের কোঠিতে এসেছে সেজন্য রঘুবীর খুবই উত্তেজিত। ভেতরের একটা দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'মা ফুন, চাচাজির সঙ্গে একজন আখবরের লোক এসেছে। জলদি ইধর আ—'

মা ফুনের গলা ভেসে এল। 'পন্দ্র মিনট পর যাচ্ছি। চায় হয়ে এসেছে।'

রঘুবীর এবার বিনয়ের দিকে তাকায়।—'জানেন বাবুজি, আমরা গন্ধী আদমি। হত্যারা। রাগের মাথায় তিনটে খুন করে 'কালাপানি, এসেছিলাম। আমার বিবি হামসে কমতি নেহি। মা ফুন দোঠো খুন করে এসেছে। আমি যখন সেলুলার জেলে আসি তখন এই চাচাজি আজাদির জন্যে আংরেজদের সঙ্গে লড়াই করে কয়েদ খাটছেন। জেলখানার ছোট এক সেলে চাচাজিকে আটকে বাইরে থেকে তালা দিয়ে রাখা হত। নাহানার (চান) জন্যে একবার আর খাওয়ার জন্যে দু'বার বাইরে আনা হত। সেই সময় চাচাজির সঙ্গে আমার জানপয়চান। দেওতা য্যায়সা আদমি (দেবতার মতো মানুষ)।'

হাত তুলে রঘুবীরকে থামিয়ে দিলেন শেখরনাথ।—'আমার কথা অত বলতে হবে না।'

এর মধ্যে শেখরনাথের আসার খবরটা পেনাল কলোনিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এখানকার বাসিন্দারা একে একে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যেতে লাগল। এদের বেশিরভাগই বর্মি। দু-চারজন ভারতের নানা প্রভিন্সের লোক। সেলুলার জেলে শেখরনাথের সঙ্গে একসময় এরাও কয়েদ খেটেছে। রঘুবীরের মতোই শেখরনাথের ওপর এদের অফুরান শ্রদ্ধা।

একজন সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামী ভারত এবং বর্মার কত মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছেন, নিজের চোখে না দেখলে ভাবতে পারত না বিনয়। সে ভেতরে ভেতরে অভিভূত হয়ে যাচ্ছিল।

শেখরনাথ সবাইকে নামে নামে চেনেন। তাদের ছেলেমেয়ে স্ত্রীর খবর রাখেন। যেই আসছে, কে কেমন আছে, কারও কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিচ্ছেন।

এর মধ্যে মা ফুন ভেতর দিক থেকে চলে এল। শুধু চা-ই না পরোটা এবং সবজিও বানিয়ে এনেছে। চিনামাটির ক'টা কাপ-প্লেট একটা নিচু টেবলের ওপর রেখে, একটা প্লেট এবং চায়ের কাপ ট্রাকের ড্রাইভারকে দিয়ে ফিরে এসে সে-ও মেঝেতে রঘুবীরের পাশাপাশি বসে পড়ে।

শেখরনাথ বললেন, 'এত সব করতে গেলি কেন? শুধু চা হলেই তো হত।'

মা ফুন হাসল, 'স্রিফ চা দিলে কী চলে! কত মাহিনা বাদ আপনি এলেন বলুন তো?'

শেখরনাথ হেসে বিনয়ের দিকে তাকালেন।—'না, এরা কোনও কথা শুনবে। নাও, খেতে শুরু কর।' তারপর মা ফুনের সঙ্গে বিনয়ের পরিচয় করিয়ে দিতে দিতে হঠাৎ সেই কথাটা মনে পড়ে গেল।

শেখরনাথ এবার বললেন, 'শোন, বিনয় তোদের এই পেনাল কলোনি নিয়ে তাদের আখবরে কিছু লিখতে চায়। তোদের কাছে যদি কিছুদিন এসে থাকে, অসুবিধে হবে না তো?'

'কীসের অসুবিধে।' মা ফুন এবং রঘুবীর হইচই বাধিয়ে দিল, 'বাবুজি এলে আমরা মাথায় করে রাখব।'

'আসলে কলোনিতে যারা থাকে, তাদের সবার সঙ্গে বিনয় কথা বলবে। তারা কবে কোন অপরাধে ইন্ডিয়া আর বর্মা থেকে 'কালাপানি'তে সাজা খাটতে এসেছিল, সেলুলার জেলে কীভাবে, কত নির্যাতন সহ্য করে তাদের দিন কেটেছে, মুক্তি পাওয়ার পর কীভাবে এখানে কলোনি বানিয়ে জীবনের শেষ দিনগুলো কাটাচ্ছে— সব সে জানতে চায়। তারপর ওদের আখবরে সেই লেখা ছাপবে।'

রঘুবীর এবং মা ফুন, দু'জনেই প্রচণ্ড উত্তেজিত। রঘুবীর জিগ্যেস করল, 'বাবুজি কবে আসবে?'

'কিছুদিন পর। আমিই ওকে দিয়ে যাব।'

ওঁদের কথাবার্তার মধ্যেই দূর থেকে চেঁচামেচি ভেসে এল। অনেকে একসঙ্গে কথা বললে যেমন শোনায় অনেকটা সেইরকম।

বাইরের দিকের খোলা দরজা দিয়ে দেখা গেল পঞ্চাশ-ষাটজনের একটা দঙ্গল রিফিউজি সেটেলমেন্টের দিক থেকে প্রায় ছুটতে ছুটতেই এগিয়ে আসছে। পাঁচ সাত মিনিটের ভেতর রঘুবীরদের বাড়ির সামনে পৌঁছে গেল। তাদের মধ্যে রয়েছে মাঝবয়সি, ভদ্র চেহারার একটি লোক, মাঝবয়সি, মাঝারি হাইটের মজবুত একটি মেয়েমানুষ। তার হাতে চটের একটা ব্যাগ জিনিসপত্রে বোঝাই। এছাড়া নানা বয়সের ক্ষয়াটে চেহারার মানুষজন। দেখামাত্রই টের পাওয়া যায়— উদ্বাস্তু। ছিন্নমূল সর্বস্ব খোয়ানো মানুষগুলোর চোখেমুখে ক্লেশের, উৎকণ্ঠার একটা ছাপ থাকে। সেটাই তাদের নির্ভুল চিনিয়ে দেয়। যে বর্মি যুবকটি দাইয়ের খোঁজে গিয়েছিল, ভিড়ের মধ্যে তাকেও দেখা গেল।

দ্রুত খাওয়া চুকিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন শেখরনাথ। তার পেছন পেছন বিনয়, মা ফুন এবং রঘুবীর।

জনতার ভেতর থেকে সেই মাঝবয়সি লোকটি ক্ষোভের সুরে বলল, 'কাকা, এত দূর তরি (পর্যন্ত) আইলেন, কিন্তুক আমাগো সেটেলমেন্টে গ্যালেন না? মনসারে ডাকতে লোক পাঠাইলেন। মনে বড় দুঃখু পাইলাম।'

এগিয়ে এসে লোকটির কাঁধে হাত রেখে কাঁচুমাচু মুখে বললেন, 'রাগ করো না বিনোদ। মা ফুনরা কিছুতেই ছাড়ল না। শিগগিরই আবার আসছি। তখন আগে তোমাদের ওখানে যাব।'

'আইজ একবার পায়ের ধুলা দিবেন না?'

'উপায় নেই। একটি মেয়ের প্রসব বেদনা উঠেছে। জেফি পয়েন্টে ডাক্তারটাক্তার নেই। তাই দাই নিতে এসেছি। দাই কি এসেছে?'

এখানকার রিফিউজি সেটেলমেন্টের সবাই শেখরনাথের মুখচেনা; তবে অনেকের নাম জানেন না।

বিনোদ নামের লোকটি বলল, 'এসেছে। এই তো—' সেই মধ্যবয়সিনিকে দেখিয়ে দিল সে।—'এরই নাম মনসা। আপনি খবর পাঠাইছেন। মনসা এক্কেরে (একেবারে) তৈয়ার অইয়া আইছে।'

শেখরনাথ মনসাকে জিগ্যেস করলেন, 'তোমার কে কে আছে?'

মনসা জানায় সে অল্প বয়সেই বিধবা হয়েছে। ছোট ভাই গোপাল আর তার বউ কমলার কাছে থাকে। তাদের সঙ্গেই

banglabooks.in

আন্দামানে এসেছে। যুবতী বয়স থেকে দাইগিরি করছে।

শেখরনাথ বললেন, 'আমাদের সঙ্গে গেলে তোমার ভাই আপত্তি করবে না তো?'

একটি বছর চল্লিশের ভালোমানুষ ধরনের লোক বলে উঠল, 'আমি গুপাল। আপনে দিদিরে লইয়া যাইবেন আমি আপত্ত করুম! আমার ঘেটিতে (ঘাড়ে) কয়ডা মাথা?'

শেখরনাথ বিনোদের সঙ্গে বিনয়ের আলাপ করিয়ে দিল। বিনোদ বি.এ পাশ। ঢাকায় থাকত। ইচ্ছা করলে পার্টিশনের পর ইন্ডিয়ায় এসে চাকরি-বাকরি জুটিয়ে নিতে পারত। নেয়নি। ওর খুব দুঃখের জীবন; বড় আঘাত পেয়েছে। কলকাতায় ভালো লাগছিল না। অন্য উদ্বাস্তুদের সঙ্গে আন্দামানে চলে এসেছে।

পরিচয় করানো হলে শেখরনাথ বিনোদকে বললেন, 'কিছুদিন পর যখন আসব, বিনয়কেও সঙ্গে আনব। ও রঘুবীরদের বাড়িতে থাকবে, তোমাদের ওখানেও যাবে। খবরের কাগজে তোমাদের সেটেলমেন্টের কথা লিখবে। বিনয়কে একটু সাহায্য করো।'

বিনয় সাংবাদিক শুনে রঘুবীরদের মতো বিনোদও রীতিমতো উত্তেজিত। বলল, 'নিচ্চয় করুম। উনি আমাগো লইয়া লেখবেন এয়াতো (এ তো) ভাইগ্যের কথা।'

শেখরনাথ আর দেরি করলেন না। 'আজ আমরা চলি—' বলে বিনয় এবং মনসাকে নিয়ে ট্রাকে উঠলেন।

ড্রাইভার স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

বেলা যখন সামান্য হেলতে শুরু করেছে সেই সময় জেফ্রি পয়েন্টে পৌঁছে গেলেন শেখরনাথরা।

॥ এগারো ॥

মেয়েদের ব্যারাকের সামনে বিরাট ভিড়। নানা বয়সের মেয়েরা রয়েছে সামনের দিকে। পুরুষেরা একটু দূরে। তাদের মধ্যে পরিতোষ, লা ডিন এবং পুনর্বাসন দপ্তরের কর্মীরা এসে জড়ো হয়েছে। সারি সারি উদ্বিগ্ন মুখ।

নিজেদের মধ্যে সবাই বলাবলি করছিল, 'সৃষ্টিধরের বউরে আর বুঝিন বাচান গেল না। হেই সকাল থিকা যন্তরনায় কাতরাইতে আছে। অহনও কাকায় দাই লইয়া ফিরল না। খালাস না অইলে মায় (মা) আর প্যাটের বাচ্চা—দুইটারই মরণ।'

'কী যে অইব, ভগমানই জানে।'

এই সময় ট্রাকের আওয়াজে সবাই ঘুরে তাকায়। উতরাইয়ের ঢাল বেয়ে বিশাল গাড়িটা নেমে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে উদ্বাস্তুদের মধ্যে।

'আইয়া গ্যাছে, আইয়া গ্যাছে—'

'আর চিন্তা নাই।'

'মা কালী বউডারে রক্ষা কর।'

শেখরনাথদের ট্রাক মেয়েদের ব্যারাকটার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। মনসা আর বিনয়কে নিয়ে শেখরনাথ নেমে পড়লেন। জনতার দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কী হয়েছে, তোমরা সবাই এখানে?' তাঁর কণ্ঠস্বরে রীতিমতো উৎকণ্ঠা। সকালে সৃষ্টিধরের বউয়ের যে হাল দেখে গিয়েছিলেন তাতে খারাপ কিছু হয়ে গেল নাকি, এটাই তাঁর ভয়।

মেয়েরা ভিড় করার কারণটা জানিয়ে দিল। পরিতোষ জানাল, শেখরনাথরা চলে যাবার পর পুরুষরা জমি সাফ করতে গিয়েছিল। সূর্য মাথার ওপর উঠে এলে চান-খাওয়া সারতে ক্যাম্পে এসে সব শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

শেখরনাথ জানতে চাইলেন, 'সৃষ্টিধরের বউ এখন কোথায়?'

পরিতোষ বলল, 'ভিতরে। আশুচ (আঁতুড়) ঘরে।'

শেখরনাথ দাই আনতে যাবার সময় ব্যারাকের এক কোণে চেরা বাঁশ দিয়ে এক ফালি জায়গা ঘিরে সন্তান জন্মের ব্যবস্থা করে রাখতে বলেছিলেন। পরিতোষের কথায় জানা গেল সেটি এর মধ্যেই করে ফেলা হয়েছে। এবং সৃষ্টিধরের বউকে সেখানে রাখা হয়েছে। কয়েকজন বয়স্কা উদ্বাস্তু মেয়েমানুষ তার কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করছে।

যে শঙ্কাটা হঠাৎ পাষাণভারের মতো শেখরনাথের মাথায় চেপে বসেছিল সেটা আপাতত নেমে গেছে। না, মেয়েটা বেঁচেই আছে। তিনি ব্যস্তভাবে মনসাকে দেখিয়ে জমায়েতটাকে বললেন, 'এই যে দাইকে নিয়ে এসেছি। আর চিন্তা নেই। তোমরা সরে সরে পথ করে দাও। ও আঁতুড়ঘরে যাক।'

মনসা ব্যারাকের ভেতর ঢুকে গেল।

কিন্তু বাইরের ভিড়টা অনড় দাঁড়িয়ে থাকে। এতগুলো মানুষ খিদে-তেষ্টার কথা বোধহয় ভুলেই গেছে। এমনকী শেখরনাথ বিনয়কে নিয়ে একধারে অপেক্ষা করতে থাকেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ভেতর থেকে অনেকগুলো মেয়ে-গলার কলকলানি ভেসে আসে। —'খালাস অইয়া গ্যাছে, খালাস অইয়া গ্যাছে। মা কালী গো, তুমার দয়া—'

তারপরেই পরিষ্কার ন্যাকড়া জড়ানো একটি মানবশিশুকে কোলে করে মনসা ব্যারাকের সামনে এসে দাঁড়ায়। মাখনের দলার মতো বাচ্চাটা কুঁই কুঁই, ক্ষীণ আওয়াজ করছিল। পৃথিবীর প্রথম আলো এসে পড়েছে তার চোখে। পিট পিট করে তাকাচ্ছিল সে।

বাইরে তুমুল শোরগোল শুরু হয়ে গেল। এতক্ষণের উৎকণ্ঠা কেটে গেছে সবার। হুড়মুড় করে তারা মনসার কাছে ছুটে আসে।

'কী অইচে, কী অইচে? পোলা, না মাইয়া?' প্রতিটি উদ্বাস্তু জানার জন্য উদ্‌গ্রীব।

মনসা হেসে হেসে বলল, 'একহান সোনার চান্দ (চাঁদ) অইচে। পোলা—পোলা—'

মেয়েদের ভেতর থেকে কে যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'তরা খাড়ইয়া রইছস ক্যান? জোকার (উলু) দে। শাখ বাজা—'

মুহূর্তে উলুধ্বনি এবং শাঁখের আওয়াজে জেফ্রি পয়েন্টের ছিন্নমূল মানুষের উপনিবেশ সরগরম হয়ে ওঠে।

দক্ষিণ আন্দামানের এই সৃষ্টিছাড়া জঙ্গল-ঘেরা এই ভূখণ্ডে এই প্রথম একটি মানুষের জন্ম হল। আজকের দিনটা নিয়ে সবাই যেন অফুরান উৎসবে মেতে ওঠে।

মনসা বলে, 'বাইরে রইদের (রোদের) জবর ত্যাজ (তেজ)। বাচ্চাটার কষ্ট অইতে আছে। ভিতরে যাই।' সে ব্যারাকে ঢুকে গেল।

এদিকে উদ্বাস্তুরা ঘিরে ধরে সৃষ্টিধরকে। —'মিঠাই খাওয়াইতে অইব তুমারে—'

সৃষ্টিধরের চোখেমুখে লাজুক হাসি। সেটা সুখের এবং গর্বের। কাঁচুমাচু মুখে বলে, 'আমার কি ট্যাকাপয়সা আছে যে খাওয়াতি পারি। খুলনে জিলায় আমাগের গেরামি থাকলি প্যাট ভইরে মোন্ডা মেঠাই খাওয়ায়ে দেতাম।' শেখরনাথ হাসিমুখে সব শুনছিলেন। বললেন, 'সৃষ্টিধর কোত্থেকে খাওয়াবে? ওকে তোমরা ছেড়ে দাও।' বলে পরিতোষের দিকে তাকালেন। —'তুমিই তো এই সেটেলমেন্টের কর্তা। তোমার হাতে টাকাপয়সা থাকে। সকলকে মিষ্টিমুখ করিয়ে দাও—'

পরিতোষ বলল, 'এইটা কি কইলকাতার শহর! সন্দেশ রসগুল্লা পামু কই?'

একটু ভেবে শেখরনাথ বললেন, 'সেটা অবশ্য ঠিক। এবার মালপত্রের সঙ্গে কয়েক টিন আমেরিকার মিষ্টি বিস্কুট এসেছে না?'

'হ, কাকা।'

'সবাইকে দুটো করে তা-ই খাইয়ে দে।'

বিস্কুট বিলি করা হল। তারপর সমুদ্রে চান করে এসে ভাত খেতে খেতে বিকেল পেরিয়ে গেল। আজ আর কেউ এ বেলা জমিতে গেল না।

মাঝরাত অবধি হইহই করে গানটান গেয়ে কেটে গেল।

॥ বারো ॥

আনন্দটা কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। দু'দিন কাটতে না কাটতেই জারোয়ারা মারাত্মক কাণ্ড ঘটিয়ে দিল।

আজ সকালে অন্য দিনের মতোই জমিতে গিয়েছিল উদ্বাস্তুরা। উত্তর-পুব দিকে মোহনবাঁশি কর্মকার তার বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে

pathagar.net

banglabooks.in

তার জমির জলডেঙ্গুয়ার ঝাড় সাফ করছিল। আচমকা ওধারের জঙ্গল ফুঁড়ে, বুশ পুলিশের নজর এড়িয়ে এক দঙ্গল কালো কালো জারোয়া তির-ধনুক নিয়ে হানা দিল। বেশ কয়েকদিন আগে, বিশ্বজিৎ তখন জেফ্রি পয়েন্টে ছিলেন, জারোয়ারা মাঝরাতে হামলা চালিয়েছিল। আজ একেবারে প্রকাশ্য দিবালোকে।

অদ্ভুত আওয়াজ করে, দুর্বোধ্য ভাষায় গজরাতে গজরাতে তারা এলোপাতাড়ি তির ছুঁড়তে থাকে। চোখেমুখে তাদের প্রচণ্ড আক্রোশ।

তিরগুলো এধারে ওধারে উড়ে যাচ্ছিল। তবে একটা এসে লাগল মোহনবাঁশির বুকের ডান পাশে। চারপাশের জমিতে যারা কাজ করছিল তারা তুমুল হুলস্থুল বাধিয়ে দিল। সবাই আতঙ্কগ্রস্ত। কেউ কেউ উদ্‌ভ্রান্তের মতো ক্যাম্পের দিকে দৌড়াতে থাকে। ওদিকে বুশ পুলিশও পেরিমিটার রোডের উঁচু উঁচু টঙ থেকে জারোয়াদের দেখতে পেয়েছিল। তারা টিন বাজাতে বাজাতে তুমুল হইচই বাধিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে আকাশের দিকে বন্দুক তুলে ফায়ার করতে থাকে।

লহমায় জারোয়ারা গভীর জঙ্গলে উধাও হয়ে যায়। বিনয় আর শেখরনাথ উত্তর দিকের একটা জমিতে ছিলেন। বহু মানুষের চিৎকার শুনে দৌড়ে মোহনবাঁশিদের কাছে চলে আসেন। ওদিকে জমি মাপামাপি বন্ধ করে লা ডিনরা দৌড়ে এসেছে।

মোহনবাঁশির বুকে তিরটা অনেকখানি ঢুকে গেছে। সে বেহুঁশ মাটিতে পড়ে আছে। তিরের ফলার পাশ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে আসছে। তাকে ঘিরে তার বউ ছেলেমেয়েরা উন্মাদের মতো কাঁদছে। আর জড়ানো জড়ানো গলায় তার বউ বলে যাচ্ছে, 'ক্যান যে আন্ধারমান দ্বীপি আইছিলাম। মানুষটার পরানডা গেল! এই আছিল আমাগো কপালে!'

ছেলেমেয়ে দু'জনেই রুদ্ধশ্বাসে একটানা বলে যাচ্ছিল, 'বাবা, চৌখ মেইলা তাকাও। চৌখ মেল—'

শেখরনাথ পলকহীন মোহনবাঁশিকে লক্ষ করছিলেন। বুঝতে পারছেন, তিরটা টানাটানি করে খুলতে গেলে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসবে। জেফ্রি পয়েন্টের তো প্রশ্নই নেই, আশপাশে কোথাও ডাক্তার নেই। দ্রুত মোহনবাঁশির নাকের তলায় হাত রাখলেন তিনি। তির তির করে নিঃশ্বাস পড়ছে। তার মানে লোকটা বেঁচে আছে।

ওদিকে হইচই শুনে ক্যাম্পের দিক থেকে পরিতোষ এবং পুনর্বাসনের কর্মীরা দৌড়ে এসেছিল।

শেখরনাথ সংক্ষেপে ঘটনাটা জানিয়ে দিয়ে ব্যস্তভাবে বললেন, 'মোহনবাঁশিকে বাঁচাতে হলে এক্ষুনি পোর্ট ব্লেয়ারের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। মালপত্র নিয়ে যে লরিটা এসেছিল সেটা কি ফিরে গেছে?'

পরিতোষ বলল, 'হে তো আপনেরা যেইদিন উইধারের সেটেলমেন্টে গ্যাছিলেন হেইদিনই বিকালে চইলা গ্যাছে।'

'সর্বনাশ। এখন উপায়?' বলতে বলতে হঠাৎ কিছু খেয়াল হল শেখরনাথের।

—'আরে, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ট্রাক দুটো তো রয়েছে। তার একটায় তুলে মোহনবাঁশিকে নিয়ে যাব।'

'কিন্তুক—'

শেখরনাথ বিরক্ত হলেন।—'কীসের কিন্তু?'

পরিতোষ ভয়ে ভয়ে জানায়, একটা লরি গাছের গুঁড়ি দিয়ে বোঝাই করা হয়েছে। আরেকটায় হাতি দিয়ে তোলা হচ্ছে। সেটা ভর্তি হতে হতে বিকেল হয়ে যাবে। তারপর ট্রাক দুটো রওনা হবে ব্যাম্বু ফ্ল্যাটের দিকে। মাল খালাস করে ফিরে আসতে আসতে পরশু।

শেখরনাথ ধমকে উঠলেন, 'পরশু অবধি মোহনবাঁশি তির বেঁধা অবস্থায় পড়ে থাকবে? ওকে বাঁচানো যাবে? এক্ষুনি গিয়ে আমার নাম করে বল, যেটা এখনও ভর্তি হয়নি সেটায় গুঁড়ি তোলা বন্ধ রাখুক। যা তোলা হয়েছে নামিয়ে ফেলুক। ওই ট্রাকটায় আমরা মোহনবাঁশিকে নিয়ে যাব।'

পরিতোষ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে একটা লম্বা পুরু চট দু'ভাঁজ করে তার ওপর মোহনবাঁশিকে খুব সাবধানে শুইয়ে ট্রাক দৌড় শুরু করল। শেখরনাথ তো গেলেনই, তাঁর সঙ্গে বিনয়ও গেল। মোহনবাঁশির ছেলেমেয়ে বউ ট্রাকে উঠে পড়েছে। তারা মোহনবাঁশিকে ঘিরে বসেছে; তাকে অন্যের হাতে ছেড়ে দিতে ওদের খুব সম্ভব ভরসা নেই। কেঁদে কেঁদে সবার গলা ভেঙে গেছে। মোহনবাঁশিকে ট্রাক থেকে ওঠানোনামানোর জন্য পুনর্বাসনের কর্মীকেও সঙ্গে নেওয়া হয়েছে।

ড্রাইভারের পাশে ফ্রন্ট সিটে বসেছেন শেখরনাথ। জানালার ধারে বিনয়।

শেখরনাথ ড্রাইভারকে তাড়া দিচ্ছিলেন।—'জোরে চালিয়ে যত তাড়াতাড়ি পার আমাদের ব্যাম্বু ফ্ল্যাটে পৌঁছে দাও।' পেছন ফিরে পুনর্বাসনের কর্মীদের বারবার সতর্ক করে দিচ্ছিলেন, তারা যেন শক্ত করে মোহনবাঁশিকে দু'দিক থেকে ধরে রাখে। গাড়ির ঝাঁকুনিতে তির যদি তার বুকের আরও গভীরে ঢুকে যায়, মোহনবাঁশিকে হয়তো বাঁচানো যাবে না।

বেলা যখন অনেকখানি হেলে পড়েছে সেই সময় ট্রাক ব্যাম্বু ফ্ল্যাটে এসে গেল। জেটিতে একটা লঞ্চ দাঁড়িয়ে ঘন ঘন ভোঁ দিচ্ছিল। খুব শিগগিরই ছেড়ে দেবে।

লঞ্চটা বিনয়ের খুবই চেনা—'সিগাল'। এই জলযানেই কয়েকদিন আগে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে দেড়শো উদ্বাস্তু ফ্যামিলি এবং বিশ্বজিতের সঙ্গে সে জেফ্রি পয়েন্টে গিয়েছিল।

শেখরনাথরা নেমে পড়লেন। পুনর্বাসনের কর্মীরা শক্ত করে

banglabooks.in

চটের চার কোনা ধরে মোহনবাঁশিকে নামিয়ে আনল। তাদের পেছন পেছন নামল মোহনবাঁশির বউ ছেলেমেয়েরা।

শেখরনাথ ট্রাকের ড্রাইভারকে জেফ্রি পয়েন্টে ফিরে যেতে বলে একরকম দৌড়ে গিয়েই টিকেট কেটে ফেললেন। তারপর সবাই লঞ্চে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে 'সিগাল' লম্বা ভোঁ দিয়ে চলতে শুরু করল।

লঞ্চে বেশ ভিড় ছিল। বিশ্বজিতের সঙ্গে উদ্বাস্তুদের নতুন সেটেলমেন্টে যাবার সময় যেমন বর্মি কারেন শিখ এমনি ইন্ডিয়ার নানা প্রভিন্সের প্যাসেঞ্জার দেখা গিয়েছিল, এখনও ঠিক তেমনটাই চোখে পড়ল। বিনয় আন্দাজ করে নিল এদের বেশিরভাগই ব্রিটিশ আমলের কয়েদি। 'কালাপানি'র সাজা খাটতে আন্দামানে এসেছিল। মুক্তি পাওয়ার পর স্বাধীন ভারতের নাগরিক। শেখরনাথকে দেখে তারা অনেকে এগিয়ে এসে সসম্ভ্রমে মাথা ঝুঁকিয়ে বলে, 'আদাব চাচাজি', কেউ বলে, 'নমস্তে'—মোহনবাঁশিকে ডেকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। তার দিকে তাকিয়ে প্রাক্তন কয়েদিরা খুব একটা অবাক হল না।

একজন মোহনবাঁশিকে দেখিয়ে শেখরনাথকে জিগ্যেস করল, 'জরুর পাকিস্তানকা রিফিউজি—হ্যায় না চাচাজি?' উদ্বাস্তুদের চেহারায় মার্কামারা একটা ছাপ থাকে, এতদিনে এখানকার পেনাল সেটেলমেন্টের পুরানো বাসিন্দারা তা চিনে ফেলেছে।

শেখরনাথ আস্তে মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ।'

গভীর জঙ্গলের খাঁজে কোথায় কোথায় উদ্বাস্তুদের উপনিবেশ গড়ে উঠছে, কোথায় জারোয়ারা তাদের পড়োশি, এবং এই আদিম জনজাতিটি কতটা হিংস্র, সব তাদের জানা। লোকটি বলল, 'জরুর জারোয়ারা তির মেরেছে!'

এবারও শেখরনাথ আস্তে মাথা নাড়েন।—'হ্যাঁ।'

'ওহি জংলি লোগ বহুৎ খতারনাক। রিফিউজিদের হোঁশিয়ারি থাকা দরকার।' বলে লোকটা জানতে চাইল, তার এবং তার সঙ্গীদের কোনওরকম সাহায্যের প্রয়োজন আছে কি না?

শেখরনাথ জানালেন, প্রয়োজন নেই। তাঁর সঙ্গে লোক আছে। বেশিক্ষণ লাগল না; মিনিট পনেরোর ভেতর 'সিগাল' উপসাগর পেরিয়ে ও পারে পোর্ট ব্লেয়ারের চ্যাথাম জেটিতে গিয়ে ভিড়ল।

তড়বড় করে অন্য প্যাসেঞ্জাররা নেমে যাবার পর শেখরনাথদের সঙ্গে পুনর্বাসনের যে কর্মীরা এসেছিল, ধরাধরি করে তারা মোহনবাঁশিকে নামিয়ে জেটিতে শুইয়ে দিল। জানতে চাইল, এবার কী করতে হবে।

শেখরনাথ বললেন, 'এখান থেকে হাসপাতালে যেতে হলে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে। তোমরা একটু বসো। দেখি কোথায় পাওয়া যায়—'

জেটির বাইরের রাস্তায় ছোট ছোট প্রাইভেট শিপিং কোম্পানির দু-তিনটে অফিস। শেখরনাথ বিনয়কে সঙ্গে করে সেখানে চলে এলেন।

শেখরনাথকে এইসব কোম্পানির লোকেরা ভালোই চেনে। শ্রদ্ধাও করে। একটা অফিস থেকে জানানো হল, তাদের একটা জিপ এবং একটা ভ্যান কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছে। বিব্রতভাবে ম্যানেজার বলল, 'কাকা, এখন কিছুই দিতে পারছি না। দু ঘণ্টা পর গাড়ি দুটো ফিরলে নিশ্চয়ই দেব।'

শেখরনাথ জানালেন, যে মারাত্মকভাবে জখম লোকটিকে জেফ্রি পয়েন্ট থেকে নিয়ে আসা হয়েছে তাকে অতটা সময় ফেলে রাখা যাবে না।

দ্বিতীয় শিপিং অফিস থেকে একটা লম্বা ভ্যান পাওয়া গেল। তবে ঘণ্টা দেড়েকের ভেতর সেটা ফিরিয়ে দিতে হবে।

শেখরনাথ বললেন, 'অতটা সময় লাগবে না। তার আগেই ফিরিয়ে দেব।'

ভ্যানটা লম্বা তো বটেই, ভেতরে অনেকটা জায়গা রয়েছে। মোহনবাঁশিকে তুলে পেছন দিকের পাটাতনে শুইয়ে তার চারপাশে একটু ঘেঁষাঘেঁষি করে বাকি সবাই বসল। বিনয়কে নিয়ে ড্রাইভারের পাশে বসেছেন শেখরনাথ। শিপিং কোম্পানিটা থেকে ড্রাইভারও দেওয়া হয়েছিল।

গাড়ি ছুটল উঁচুনিচু সড়ক ধরে। এই এলাকাগুলো বিনয়ের চেনা। এই রাস্তা দিয়েই কিছুদিন আগে বিশ্বজিতের সঙ্গে চ্যাথামে এসেছিল সে। তবে হাসপাতাল কোথায় সে জানে না। পোর্টের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে হ্যাডো, ডিলানিপুর, ফুদ্দি চাউঙ, মিডল পয়েন্ট, এবারডিন মার্কেট পেছনে ফেলে বাঁ দিকের মোড় ঘুরে অন্য একটা রাস্তায় এসে পড়ল ভ্যানটা। রাস্তাটা খাড়াই বেয়ে উঁচু টিলার দিকে চলেছে। আর টিলার মাথায় বিশাল দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে সেলুলার জেল।

বিনয় বুঝতে পারছে না, ভ্যানটা কেন জেলখানার দিকে চলেছে। শেখরনাথকে তা জিগ্যেসও করে ফেলল।

চড়াই ভাঙছে, তাই ভ্যানের গতি অনেক কমে গেছে। শেখরনাথ বুঝিয়ে দিলেন। সেলুলার জেলের মাঝখানে রয়েছে একটা বিরাট উঁচু টাওয়ার। একসময় সাতটা মস্ত মস্ত তেতলা বিল্ডিং সেটার সাতদিকে চলে গেছে। এই সাতটা বিল্ডিংয়ে ছিল সবসুদ্ধ হাজারখানেক সেল বা কয়েদিদের আটকে রাখার কুঠুরি। দু'টো টাওয়ার ভূমিকম্পে ভেঙে যায়, একটা জাপানি বোমায় ধ্বংস হয়েছে। বাকি চারটে এখনও অটুট। এই ব্লকের একটায় এখন লোকাল জেল, একটায় হাসপাতাল। অন্য দুটোয় মিউজিয়াম। ব্রিটিশ আমলে বিপ্লবীরা কে কোন কুঠুরিতে ছিলেন, কীভাবে তাঁদের এবং সাধারণ অন্য সব কয়েদির ওপর নির্মম নির্যাতন চালানো হত তার কিছু কিছু স্মারক ওই ব্লক দু'টোয় সংরক্ষণ করা আছে। ভ্যান সেলুলার জেলের সামনে চলে এসেছিল। ঢোকার মুখ প্রথমেই গম্ভীর, থমথমে, ভয়ংকর গোলাকার চেহারার একজোড়া টাওয়ার। দুটোর দূরত্ব তিরিশ চল্লিশ ফিটের মতো। জোড়া টাওয়ারের মাঝামাঝি জায়গায় খানিকটা উঁচুতে দোতলা সমান হাইটে লম্বা করিডর। সেটা টাওয়ার দুটো জুড়ে রেখেছে। তার তলায় লোহার মজবুত ফটক। এটা দিয়েই যাতায়াত করতে হয়।

ফটকের দু'টো পাল্লা খোলা রয়েছে। বিনয় কার একটা লেখায় পড়েছে ব্রিটিশ আমলে চব্বিশ ঘণ্টা রাইফেল হাতে খাস ইংরেজ পুলিশের একটা বাহিনী চব্বিশ ঘণ্টা ফটকের সামনে টহল দিতে দিতে নজরদারি চালাত। তাদের চোখে ধুলো ছিটিয়ে একটা মাছিও গলতে পারত না।

স্বাধীনতার পর দিনকাল বদলে গেছে। ফটক এখন হাট করে খোলাই থাকে। বন্দুকওয়ালা পুলিশবাহিনী তো দূরের কথা, একজন গার্ডও চোখে পড়ল না।

এখান থেকে অনেকটা নিচে ঘোড়ার খুরের আকারে সিসোস্ট্রেস বে-টাকে দেখা যাচ্ছে। তার ওধারে 'রস' আইল্যান্ড। কিছুদিন আগে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে 'এস এস মহারাজা' জাহাজে নেমেছিল বিনয়। সেখান থেকে ছোট মোটর বোটে এসেছিল পোর্ট ব্লেয়ারে।

ফটক দিয়ে ভ্যানটা ঢুকতে যাবে, কেউ ডেকে উঠল, 'আদাব চাচাজি—'

লোকটাকে দেখতে পেয়েছিলেন শেখরনাথ। একটু অবাক হলেন। ব্যস্তভাবে ড্রাইভারকে ভ্যান থামাতে বলে লোকটার দিকে তাকালেন।—'নসিমুল, তুমি এখানে?'

'মায়াবন্দর থেকে তোমাদের কোম্পানির জাহাজ নিয়ে এসেছ নাকি?'

'জি।' একটু কাত হয়ে তেরছাভাবে ডান হাতের তর্জনীটা বাড়িয়ে দিল।

সেলুলার জেল যে টিলাটার মাথায় ঠিক তার পেছন দিয়ে সিসোস্ট্রেস বে বা উপসাগর 'ঘোড়ার খুরের আকারে পশ্চিম থেকে পুবে চলে গেছে। সেটার পাড়ে পোর্ট ব্লেয়ারের গা ঘেঁষে একটা জেটি। সেখানে একটা ছোট জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। 'এস এস সাগর'। নসিমুলের আঙুল সেটার দিকে। তার ঠিক উলটো দিকে উপসাগরের ওপারে 'রস' আইল্যান্ড। বিনয়ের খুবই পরিচিত

pathagar.net

banglabooks.in

এলাকা। এই তো সেদিন 'মহারাজা' জাহাজে চেপে কয়েক শো রিফিউজি ফ্যামিলির সঙ্গে এসে নেমেছিল।

নসিমুলের বয়স পঞ্চাশ-বাহান্ন। তামাটে রং। মাঝারি হাইটের মজবুত চেহারা। লম্বাটে মুখে বসন্তের দাগ, মাথায় কাঁচাপাকা চুল। পরনে ঢোলা নীলচে ফুলপ্যান্ট আর সাদা শার্ট। লোকটা এবার জানাল, কয়েকদিন আগে তারা এখানে এসেছে। আজই মায়াবন্দর ফিরে যাবে। তবে রাহাসাহেব অর্থাৎ বিশ্বজিৎ তাঁদের অনুরোধ করেছেন সপ্তাহখানেক আগে মধ্য আন্দামানের একজন বৃদ্ধ রিফিউজি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পোর্ট ব্লেয়ারের হাসপাতালে এসে ভর্তি হয়েছিল। তার সঙ্গে পরিবারের দুজন এসেছে। বৃদ্ধ এখন রোগমুক্ত। তাকে আজ 'রিলিজ' করে দেওয়া হবে। নসিমুলরা উত্তর আন্দামানের মায়াবন্দর যাবার পথে যেন এই উদ্বাস্তু পরিবারটিকে মিডল্ আন্দামানে নামিয়ে দিয়ে যায়। সেজন্য 'এস এস সাগর'-এর বয়লারে যে কয়লা দেয় সেই স্টোকার রহমানকে হাসপাতালে পাঠিয়ে এখানে অপেক্ষা করছে নসিমুল। রহমানরা চলে এলে সে বৃদ্ধদের নিয়ে গিয়ে সে জাহাজ ছেড়ে দেবে।

'ঠিক আছে, আবার দেখা হবে। আমার সঙ্গে একজন জখম লোক রয়েছে। তাকে এক্ষুনি হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। আচ্ছা চলি—'

'আদাব—'

শেখরনাথ হাত তুলে প্রতিনমস্কার জানালেন। ভ্যানওলাকে বললেন, 'চল—' কথা বলতে বলতে তিনি লক্ষ করেছিলেন বিনয় পলকহীন নসিমুলের দিকে তাকিয়ে আছে। নিশ্চয়ই নসিমুল সম্পর্কে তার খুবই কৌতূহল হচ্ছে। তাকে বললেন, 'পোর্টব্লেয়ার' থেকে একশো মাইল দূরে উত্তর আন্দামানের মায়াবন্দরে দত্তদের স-মিল এবং সামুদ্রিক 'শেল' অর্থাৎ শঙ্খ, কড়ি, টার্বো, ট্রোকার্সের ফলাও কারবার। বাঙালি কোম্পানি সারা পৃথিবীতে তারা শেল চালান দেয়। তাদের দু দুটো জাহাজও রয়েছে। 'এস এস সাগর' তো এই মুহূর্তে জেটিতে বাঁধা রয়েছে। অন্যটার নাম 'এস এস বরুণ'।

ভ্যান ফটক পেরিয়ে বিরাট এক চত্বরে এসে পড়েছিল। কোনাকুনি খানিকটা গিয়ে একটা লম্বা ব্লকের সামনে এসে থেমে গেল। সেখানে দোতলার হাইটে মস্ত বোর্ডে লেখা: 'আন্দামান অ্যান্ড নিকোবর হসপিটাল'।

শেখরনাথের শেষ কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিল না বিনয়। সেলুলার জেলের চৌহদ্দিতে ঢোকার পর থেকে সারা শরীর ছমছম করছে। ছেলেবেলায় রাজাজিয়ায় থাকার সময় ভারতের বাস্তিল এই জেলখানা সম্পর্কে কত বিভীষিকা, কত আতঙ্কের কাহিনিই না শুনেছে সে। শত শত বিপ্লবী থেকে সাধারণ কয়েদিকে অকথ্য অত্যাচারে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে। অনেকে নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে উন্মাদ হয়ে গেছে। ব্রিটিশ পুলিশ কতজনকে যে এই কয়েদখানায় ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দিয়েছে তার লেখাজোখা নেই। আচ্ছন্নের মতো তিনদিকের উঁচু উঁচু দালানে অগুনতি সেলগুলো দেখতে থাকে বিনয়।

এদিকে ভ্যানটা থামতেই শেখরনাথ নেমে পড়েছিলেন। ব্যস্তভাবে বিনয়কে তাড়া দিলেন, 'চল—চল আমার সঙ্গে।' অন্যদের গাড়িতেই অপেক্ষা করতে বললেন।

হাসপাতালের তেতলা বিল্ডিংটার মাঝামাঝি জায়গা থেকে ওপরে ওঠার সিঁড়ি। এপাশে ওপাশে সারি সারি যে কুঠুরিগুলোতে ইংরেজ আমলে কয়েদিদের আটকে রাখা হত, এখন সেগুলোতে রোগীদের জন্য বেড পাতা। এখন ভিজিটিং আওয়ার্স চলছে। পেশেন্টদের ঘিরে বসে আছে তাদের বাড়ির লোকজন।

বিনয়কে সঙ্গে করে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় চলে এলেন শেখরনাথ। নিচের তলার মতো এখানেও কুঠুরিতে কুঠুরিতে রোগীদের পাশে তাদের আত্মীয়স্বজন।

সেলগুলোর সামনে দিয়ে পনেরো ফিটের মতো চওড়া করিডর বহুদূরে শেষ প্রান্ত অব্দি চলে গেছে। দু' চারজন নার্স, অ্যাপ্রন-পরা জুনিয়র ডাক্তার এবং হাসপাতালের কর্মীদের দেখা যাচ্ছে।

সিঁড়ির ডানপাশে একটু এগতেই দেখা গেল দেওয়ালের গায়ে পেতলের ঝকঝকে প্লেটে লেখা আছে: ডাঃ পি. চট্টরাজ। চিফ মেডিক্যাল অফিসার।

দরজার সামনে দামি পরদা ঝুলছে। বাইরে থেকে শেখরনাথ গলার স্বর সামান্য উঁচুতে তুলে ডাকলেন, প্রণবেশ—প্রণবেশ আমি শেখরকাকা—ভেতরে আসতে পারি?'

ডাঃ চট্টরাজ নিজেই উসে এঠে পরদা সরিয়ে বললেন, 'আপনি! আসুন, আসুন, ভেতরে—'

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে শেখরনাথ বললেন, 'এখন বসার সময় নেই।' কী কারণে হাসপাতালে আসা, সংক্ষেপে তা জানিয়ে দিলেন। —'সেই জেফ্রি পয়েন্ট থেকে নিয়ে আসতে হয়েছে। লোকটা খুব সম্ভব বেঁচে আছে। শিগগির ভর্তির ব্যবস্থা কর।'

তক্ষুনি তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। ডাঃ চট্টরাজ একে ওকে ডেকে স্ট্রেচার, একজন জুনিয়র ডাক্তার এবং একজন নার্সকে নিচে পাঠিয়ে দেন। পাঁচ মিনিটের ভেতর মোহনবাঁশিকে দোতলাতেই 'এমার্জেন্সি' ডিপার্টমেন্টে ভর্তি করে নেওয়া হয়। বাইরের করিডরে অপেক্ষা করতে থাকেন শেখরনাথ এবং বিনয়। তাঁদের সঙ্গে উৎকণ্ঠিত মোহনবাঁশির ছেলেমেয়ে বউ আর পুনর্বাসনের কর্মীরা।

ডাঃ চট্টরাজ 'এমার্জেন্সি'তে মোহনবাঁশিকে দেখতে গিয়েছিলেন। মিনিট দশেক পর বেরিয়ে এসে বললেন, 'কেসটা ক্রিটিক্যাল। প্রথমে তিরটা বার করতে হবে। তারপর বড় একটা অপারেশন। অন্তত পনেরো-কুড়ি দিন হাসপাতালে থাকতে হবে। আশা করি, বাঁচাতে পারব।'

ডাঃ চট্টরাজের দুই হাত ধরে গভীর স্বরে শেখরনাথ বললেন, 'যেভাবে হোক বাঁচাতে চেষ্টা কর।'

'আমাদের চেষ্টার কোনও ত্রুটি হবে না কাকা।' আন্দামানের আরও অজস্রজনের মতো ডাঃ চট্টরাজও শেখরনাথকে কাকা বলেন।

শেখরনাথ তাঁর সঙ্গীদের দেখিয়ে বললেন, 'এঁরা মোহনবাঁশির বউ ছেলেমেয়ে আর রিহ্যাবিলিটেশনের এমপ্লয়ি।' তারপর বিনয়কে কাছে টেনে এনে জিজ্ঞেস করলেন, 'এঁকে কি তুমি চেন?'

ডাঃ চট্টরাজ কয়েক পলক বিনয়কে লক্ষ করলেন। তারপর বললেন, 'মুখটা চেনা চেনা লাগছে। ঠিক—'

'ও কলকাতার একজন সাংবাদিক। বিনয়। রিফিউজিদের সঙ্গে এখানকার সেটেলমেন্ট দেখতে এসেছে।'

এইবার মনে পড়ে গেল। ডাঃ চট্টরাজ বিনয়ের কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, 'রস আইল্যান্ডে রাহা সাহেব আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। অ্যাম আই রাইট?'

বিনয় হেসে হেসে বলল, 'ওয়ান হানড্রেড পারসেন্ট।'

উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন ডাঃ চট্টরাজ। তার আগেই শেখরনাথ বলে উঠলেন, 'সেই সকালে আমরা বেরিয়েছি। আটটা নাগাদ চা আর রুটি ছাড়া এখন অব্দি কারও পেটে একফোঁটা জল পড়েনি। সবার জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসি। তাছাড়া একটা শিপিং কোম্পানি থেকে গাড়ি নিয়ে চ্যাথাম থেকে মোহনবাঁশিকে এখানে এনেছি। গাড়িটা এক্ষুনি তাদের ফেরত দিতে হবে। বিশুকেও মোহনবাঁশির খবরটা দেওয়া দরকার। আমি মিনিট চল্লিশেকের ভেতর চলে আসছি।'

বিনয় জিগ্যেস করল, 'কাকা, আমি কি আপনার সঙ্গে যাব?'

একটু ভেবে শেখরনাথ বললেন, 'না, তুমি এখানেই থাক। সেলুলার জেলটা যতটা পার, দেখ। পরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সমস্ত দেখাব।'

মোহনবাঁশির বউ ছেলেমেয়েদের ভরসা দিয়ে বললেন, 'কোনও ভয় নেই। কেউ কান্নাকাটি কোরো না।'

ডাঃ চট্টরাজ তাঁর চেম্বারে চলে গেলেন। বিনয় শেখরনাথের সঙ্গে নিচের চত্বরে নেমে এল। বাকি সকলে 'এমার্জেন্সি' বিভাগের সামনের করিডরে কয়েকটা বেঞ্চে বসে রইল।

নিচে এসে শেখরনাথ সেই ভ্যানটায় উঠে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে

banglabooks.in

গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে ফটকের দিকে ছুটল।

হাসপাতালের ব্লকটার ঠিক উলটো দিকে একই মাপের একই চেহারার বিশাল একটা ব্লক। একতলা থেকে তেতলা অব্দি লাইন দিয়ে কত যে সেল। সেসব দেখতে দেখতে পুরানো ভাবনাটা আবার ফিরে আসে। শত আলোকবর্ষ পেরিয়ে ইতিহাসের সেই উথালপাতাল দিনগুলোতে ফিরে গেল বিনয়। সারা দেশ জুড়ে, বিশেষ করে বাংলায় সশস্ত্র স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে ইংরেজদের ওপর। বাতাসে তখন বারুদের গন্ধ। চলছে গুলি, বোমা, ট্রেন ডাকাতি। মরণজয়ী বিপ্লবীরা পণ করেছে ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ শাসন উৎখাত করবেই।

ওদিকে যাদের রাজত্বে কোনওদিন সূর্যাস্ত হয় না, সেই ব্রিটিশ প্রশাসন হাত-পা গুটিয়ে বসে রইল না। তাদের বন্দুকের নল থেকে পালটা গুলি ছুটে গেল ঝাঁকে ঝাঁকে। চলল ধরপাকড়। চলল চরম দমননীতি। শত শত বিপ্লবীতে ভরে গেল কয়েদখানাগুলো। তাদের অনেককে ফাঁসিতে ঝোলানো হল। অনেককে নির্বাসন দেওয়া হল আন্দামানে।

ব্লকের ভেতরে ঢোকেনি বিনয়। সামনের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে চেষ্টা করছিল কোন সেলে ছিলেন উল্লাসকর দত্ত, কোনটায় সাভারকার ভাইরা, কোনটায় গণেশ ঘোষ, কোনটায় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়!

চলতে চলতে কখন যে ফটকের কাছাকাছি চলে এসেছে খেয়াল নেই। পুরানো দিনের ইতিহাসে মগ্ন হয়ে ছিল বিনয়।

হঠাৎ একটি মেয়ে-গলা কানে এল। —'আস্তে আস্তে। বুড়োমানুষ, জোরে জোরে কি পা ফেলতে পারে?'

চেনা কণ্ঠস্বর। লহমায় আচ্ছন্নতা কেটে যায় বিনয়ের। ব্যগ্রভাবে একটু কাত হয়ে তাকাতেই পা থেকে মাথা অব্দি সমস্ত শরীরে তড়িৎপ্রবাহ খেলে যায়— ঝিনুক। একটি বৃদ্ধের একখানা হাত ঝিনুকের কাঁধে। ঝিনুক তার পিঠটা নিজের হাতে বেড় দিয়ে আছে। বৃদ্ধের অন্য হাতটা ধরে আছে নসিমুল। পেছন থেকে ধরে রয়েছে একটি যুবক। নিশ্চয়ই 'এস এস সাগর'-এর স্টোকার। আরও একজন বৃদ্ধাও রয়েছে। তিনি খুব সম্ভব বৃদ্ধটির স্ত্রী। নসিমুল এদের জন্যই তাহলে গেটের কাছে অপেক্ষা করছিল।

বিহ্বলের মতো দাঁড়িয়ে থাকে বিনয়। কী করবে সে যেন ভেবে পায় না।

ওদিকে বৃদ্ধকে নিয়ে ঝিনুকরা ফটক থেকে খানিক দূরের ঢাল বেয়ে নিচে নেমে এসেছে। আরও মিনিট কয়েক হাঁটলেই সিসোস্ট্রেস বে'র কিনারে জেটিটায় পৌঁছে যাবে।

হঠাৎ স্নায়ুমণ্ডলীতে তীব্র একটা ঝাঁকুনি লাগল বিনয়ের। উদ্‌ভ্রান্তের মতো সেও ঢাল বেয়ে নামতে নামতে ডাকতে থাকে, 'ঝিনুক—ঝিনুক—'

নসিমুলরা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ততক্ষণে বিনয় তাদের কাছে চলে এসেছে। নসিমুল তাকে চিনতে পেরেছে। জিগ্যেস করল, 'ভাইসাব, আপ চাচাজিকা সাথ ভ্যানমে থে—'

তার কথাগুলো শুনতেই পেল না বিনয়। উতরোল আবেগে বুকের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছিল তার। যেন লক্ষ কোটি বছর পর ঝিনুককে সামনাসামনি দেখল সে। কী যে কষ্ট, কত যে সুখানুভূতি! কাঁপা গলায় বলতে লাগল, 'ঝিনুক— ঝিনুক— তুমি—' বাকিটা আর শেষ করা গেল না। গলা বুজে এল।

ফটকের সামনে খুব সম্ভব বিনয়কে লক্ষ করেনি ঝিনুক। সে প্রথমটা হকচকিয়ে যায়। তারপর ঠোঁট টিপে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবলেশহীন। বিনয়কে সে আগে কোনও দিন বুঝিবা দেখেনি। সম্পূর্ণ অপরিচিত।

কণ্ঠস্বর আবার ফিরে পেল বিনয়। —'তুমি ভবানীপুরের বাড়ি থেকে চলে আসার পর কলকাতা আর চারপাশে কত যে তোমাকে খুঁজেছি! দিনের পর দিন। সারা রাত ঘুমোতে পারিনি, মনে হত যন্ত্রণায় মৃত্যু হবে। কিন্তু মরতেও পারিনি।'

সেই একদিন বুকের ভেতর আগলে আগলে বিনয় পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে মেয়েটিকে কলকাতায় নিয়ে এসেছিল দুঃখে গ্লানিতে আতঙ্কে সে একেবারে শীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সেই ঝিনুক আর নেই। ঝলমলে স্বাস্থ্যে, লাবণ্যে সে এখন পরিপূর্ণ যুবতী।

ঝিনুক উত্তর দিল না। বিনয় যেন কথাগুলো তাকে নয়, অন্য কারওকে বলছে। উদাসীন মুখে ঝিনুক সমুদ্র, সি-গাল পাখি, আকাশ দেখতে থাকে।

উদ্বেল স্বরে বিনয় জিগ্যেস করে, 'খিদিরপুর ডকে আবছাভাবে তোমাকে যখন দেখি, মনে হয়েছিল হয়তো তুমি নও। তারপর 'রস' আইল্যান্ডেও দেখলাম। অত মানুষের ভিড়ে তেমন ভালো করে নয়। কিন্তু 'চলুঙ্গা' জাহাজে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। একই জাহাজে এতদূরে এসেছি, তুমি কি আমাকে দেখতে পাওনি ঝিনুক?'

বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে ছিল।

বৃদ্ধটি এবার বলল, 'বাবা, আপনে কারে ঝিনুক কইতে আছেন?'

ঝিনুকের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল বিনয়। —'একে—'

'আপনের ভুল অইছে বাবা। ও ঝিনুক না— সীতা।'

বিনয় বুঝতে পেরেছে, নিরুদ্দেশ হবার পর ঝিনুক নাম পালটে ফেলেছে। সে জোর দিয়ে বলল, 'সীতা না, ও ঝিনুকই।'

এতক্ষণে মুখ খুলল ঝিনুক, 'না, আমি সীতাই।'

'তুমি ঠিক বলছ না।'

বিনয়ের চোখে চোখ রেখে ঝিনুক বলল, 'যদি আমি ঝিনুকই হই, কী এসে যায়? এই পৃথিবীর কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না।' বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধার দিকে ফিরল সে। —'মাসিমা মেসোমশাই চলুন, সন্ধে হয়ে আসছে, বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে।'

দলটা নেমে যেতে লাগল। চলতে চলতেই নসিমুল, রহমান, বৃদ্ধা ও বৃদ্ধ বার বার পেছন ফিরে বিনয়কে দেখতে লাগল। ঝিনুক ফিরেও তাকাল না।

বিনয় দাঁড়িয়েই আছে, দাঁড়িয়েই আছে। হতবুদ্ধি। বিহ্বল। এতকাল খোঁজাখুঁজির পর এ কোন ঝিনুককে দেখল বিনয়? যে মেয়েটা ছিল সারাক্ষণ ত্রস্ত, সারাক্ষণ আতঙ্কগ্রস্ত, এক পলক তাকে না দেখলে কী যে ব্যাকুল হয়ে পড়ত— তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে অন্য এক নারী। দৃঢ়, অবিচল, কঠিন।

বিহ্বলতা কাটলে বিনয় অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'আজ তুমি আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বললে না। না চেনার ভান করলে। কিন্তু তোমার ঠিকানা মোটামুটি জেনে গেছি। খুব শিগগির আমি মিডল আন্দামানে যাব। দেখব সেদিন আমাকে চিনতে পার কি না।'

ঝিনুক এবারও তার দিকে তাকাল না।

দাঁড়িয়ে থাকতে বিনয়ের মনে হল, অসহ্য কষ্টে, তীব্র যাতনায় মাথার শিরা-স্নায়ু ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ছে, বুকের ভেতরের কোথায় যেন অবিরল রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

দিনের আলো কমে গিয়েছিল। ঝাপসা আঁধারে একসময় দেখা গেল ঝিনুকরা 'এস এস সাগর'-এ উঠে পড়েছে। একটু পর গম্ভীর ভোঁ বাজিয়ে উপসাগরকে চকিত করে জাহাজ চলতে শুরু করল।

॥ দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত ॥

অলংকরণ: অলয় ঘোষাল

banglabooks.in

উপন্যাস

উত্তাল সময়ের ইতিকথা

pathagar.net

'কেয়া পাতার নৌকো', 'শতধারায় বয়ে যায়'-এর পর ধারাবাহিক কাহিনি এগিয়েছে 'উত্তাল সময়ের ইতিকথা'য়। এবার তার তৃতীয় পর্ব।

প্রফুল্ল রায়

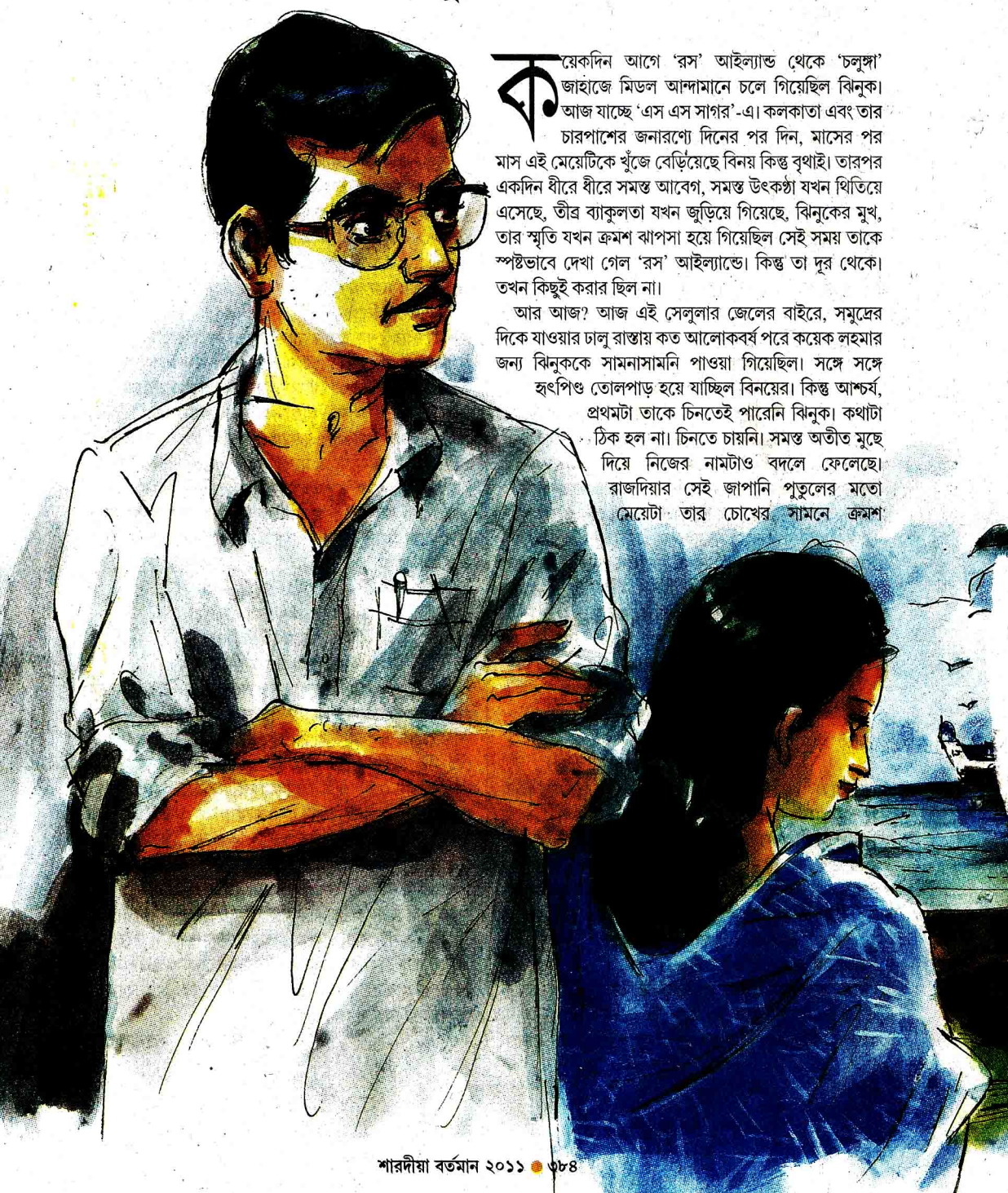

কয়েকদিন আগে 'রস' আইল্যান্ড থেকে 'চলুঙ্গা' জাহাজে মিডল আন্দামানে চলে গিয়েছিল ঝিনুক। আজ যাচ্ছে 'এস এস সাগর'-এ। কলকাতা এবং তার চারপাশের জনারণ্যে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এই মেয়েটিকে খুঁজে বেড়িয়েছে বিনয় কিন্তু বৃথাই। তারপর একদিন ধীরে ধীরে সমস্ত আবেগ, সমস্ত উৎকণ্ঠা যখন থিতিয়ে এসেছে, তীব্র ব্যাকুলতা যখন জুড়িয়ে গিয়েছে, ঝিনুকের মুখ, তার স্মৃতি যখন ক্রমশ ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল সেই সময় তাকে স্পষ্টভাবে দেখা গেল 'রস' আইল্যান্ডে। কিন্তু তা দূর থেকে। তখন কিছুই করার ছিল না।

আর আজ? আজ এই সেলুলার জেলের বাইরে, সমুদ্রের দিকে যাওয়ার ঢালু রাস্তায় কত আলোকবর্ষ পরে কয়েক লহমার জন্য ঝিনুককে সামনাসামনি পাওয়া গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ড তোলপাড় হয়ে যাচ্ছিল বিনয়ের। কিন্তু আশ্চর্য, প্রথমটা তাকে চিনতেই পারেনি ঝিনুক। কথাটা ঠিক হল না। চিনতে চায়নি। সমস্ত অতীত মুছে দিয়ে নিজের নামটাও বদলে ফেলেছে। রাজদিয়ার সেই জাপানি পুতুলের মতো মেয়েটা তার চোখের সামনে ক্রমশ

banglabooks.in

কিশোরী, তারপর পূর্ণ যুবতী হয়ে উঠেছে। কখন যে তার জীবনের পরতে পরতে মিশে গিয়েছে অচ্ছেদ্য বন্ধনে, জড়িয়ে গিয়েছে তার প্রতি মুহূর্তের শ্বাসবায়ুতে, নিজেও টের পায়নি বিনয়। সেই ঝিনুক তার পুরনো জীবনটা পুরোপুরি বাতিল করে দিয়ে হয়ে উঠেছে সীতা। ঝিনুক বলে কেউ যেন কোনও দিন এই পৃথিবীতে ছিল না।

অনেক পীড়াপীড়ির পরও সেভাবে মেনে নিতে চায়নি সে ঝিনুক। তবু তার কথায় সামান্য একটু স্বীকারোক্তি যে ছিল না তা নয়। বলেছে, কখনও যদি তার নাম ঝিনুক থেকে থাকে তাতে কার কী এসে যায়? এই নামটার জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারও কোনও লাভ বা ক্ষতি কিছুই হবে না। পৃথিবী যেমন চলছে নিজের নিয়মে তেমনই চলবে। তার আহ্নিক গতি বার্ষিক গতিতে লেশমাত্র বিঘ্ন ঘটবে না।

অথচ একদিন বিনয়কে বাদ দিয়ে কিছুই ভাবতে পারত না ঝিনুক। তাকেই ব্যগ্রভাবে আঁকড়ে ধরেছিল। সেই ভীরু, চিরদুঃখী, আতঙ্কগ্রস্ত মেয়েটি আজ কী নিদারুণ উদাসীন, সম্পূর্ণ নির্বিকার, হয়তো একটু রূঢ়ও। অথচ তার জন্য কী না করেছে বিনয়? মহা সংকটের মধ্যে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বুকের ভিতর আগলে আগলে তাকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সীমান্তের এপারে নিয়ে এসেছিল। কলকাতায় পৌঁছবার পর তার গায়ে যাতে এতটুকু আঁচড় না লাগে সে জন্য ঢালের মতো তাকে ঘিরে রেখেছে। তবু শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচাতে পারেনি। হেমনলিনী, অবনীমোহন এবং অন্যান্য আত্মীয়পরিজনরা অদৃশ্য আঙুল তুলে প্রতিটি মুহূর্তে বুঝিয়ে দিয়েছে— তুমি ধর্ষিতা, তুমি ধর্ষিতা, তোমার মধ্যে শুচিতা নেই, তুমি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছ। এসব যারা বলেছে তাদের কতজনের মুখ চাপা দিয়ে রাখা সম্ভব ছিল বিনয়ের পক্ষে? তারা কি জানে না ঝিনুকের জীবনে যে অঘটন ঘটে গিয়েছে সে জন্য তার দোষ কতটুকু?

ঝিনুককে নিয়ে বিনয় যখন দিশেহারা, চারপাশ থেকে একটা আগুনের বলয় যখন মেয়েটাকে ঘিরে ধরছিল, তাকে বাঁচাবার জন্য সুধা আর হিরণ ছাড়া অন্য কারুকে পাশে পায়নি বিনয়। অনেকটাই করেছে বিনয়রা কিন্তু সেটা যথেষ্ট ছিল না। আনন্দ আর সুনীতির ইচ্ছা থাকলেও হেমনলিনীর দাপটে তাদের মুখ বুজে থাকতে হয়েছে।

ঝিনুক অপমানে, অভিমানে, তীব্র গ্লানিবোধে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু সে চলে যাওয়ার পর বিনয় কতটা কষ্ট পেয়েছে, চারদিক উথালপাতাল করে তাকে কত খুঁজেছে, কতদিন কত রাত তার উদ্‌ভ্রান্তের মতো কেটেছে সেসব এতকাল পর ঝিনুককে কাছে পেয়ে বলতেও চেয়েছিল বিনয় কিন্তু সে সুযোগ পাওয়া যায়নি। তার কোনও কথাই কানে তোলেনি ঝিনুক। চরম উদাসীনতায় তাকে রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে সে জাহাজঘাটার দিকে চলে গিয়েছিল। তার আচরণ এতটা কঠোর, এমন আবেগহীন হবে, কে ভাবতে পেরেছে!

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল বিনয়ের। বুকের ভিতরটা যেন দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। ঝিনুক এতটা বদলে যাবে, কোনও দিন কি তা সে কল্পনা করেছে! নিদারুণ যাতনার মধ্যে হঠাৎ খেয়াল হল যে অসুস্থ বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাটিকে নিয়ে ঝিনুক পোর্টব্লেয়ারের হাসপাতালে এসেছিল তাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটল কী করে? এরা কারা? এদের খোঁজ কথায় পেয়েছে সে? প্রথমটা এইসব প্রশ্নের তালকূল খুঁজে পাচ্ছিল না বিনয়। কেমন যেন ধন্দে পড়ে গেল। আচমকা বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়ে গেল 'নতুন ভারত'-এ রিফিউজিদের জবরদখল কলোনিগুলি নিয়ে প্রতিবেদন লেখার জন্য কলকাতার চারপাশ যখন চষে বেড়াচ্ছে সেই সময় গড়িয়ার কাছাকাছি একটি কলোনির এক আধবুড়ো উদ্বাস্তু অধর ভুঁইমালীর কাছে খবর পেয়েছিল শিয়ালদহ স্টেশনে সে ঝিনুককে একজন বৃদ্ধের সঙ্গে বনগাঁ কিংবা কাঁচরাপাড়া লাইনের ট্রেনে উঠতে দেখেছে। অধর রাজদিয়া অঞ্চলের লোক। ছেলেবেলা থেকেই সে ঝিনুককে চেনে।

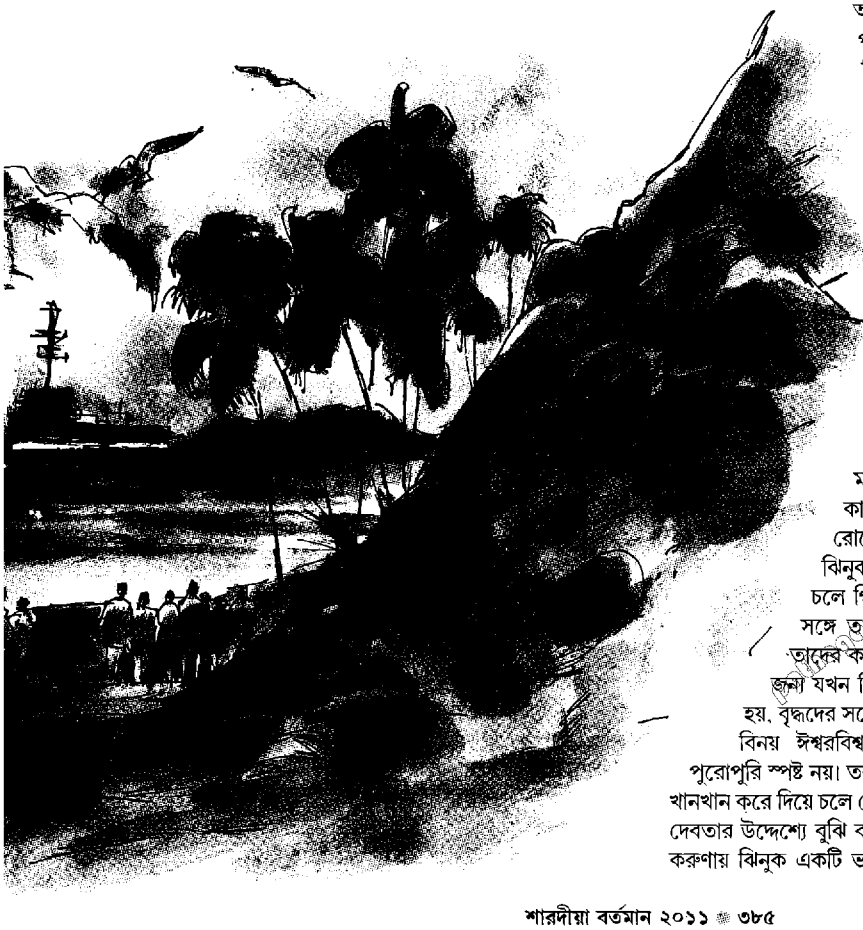

সমস্ত ব্যাপারটা এতদিনে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল বিনয়ের কাছে। ভবানীপুরে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হওয়ার পর ঝিনুক নিশ্চয়ই ঘুরতে ঘুরতে শিয়ালদহে চলে গিয়েছিল। সেখানেই খুব সম্ভব বৃদ্ধটির সঙ্গে তার দেখা হয়। বৃদ্ধটিও উদ্বাস্তু। ঝিনুক তাদের কাছে আশ্রয় পায়। তারপর পুনর্বাসনের জন্য যখন ছিন্নমূল মানুষদের আন্দামানে পাঠানো হয়, বৃদ্ধদের সঙ্গে ঝিনুকও এখানে চলে আসে।

বিনয় ঈশ্বরবিশ্বাসী কি না নিজের কাছেই সেটা পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। তবু এই মুহূর্তে যে মেয়েটি তাকে ভেঙে খানখান করে দিয়ে চলে গেছে তার সম্বন্ধে তেত্রিশ কোটি অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশ্যে বুঝি বা নিঃশব্দে জানাল; তোমাদের অপার করুণায় ঝিনুক একটি ভালো মানুষের হাতে গিয়ে পড়েছিল।

banglabooks.in

দেশভাগের পর কলকাতায় হিংস্র সরীসৃপের মতো মেয়ের দালালেরা আর লুচ্চার পাল চারদিকে ওত পেতে আছে। অরক্ষিত কোনও উদ্বাস্তু যুবতীকে দেখলেই ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে পৌঁছে দিচ্ছে নরকের খাসতালুকে। ঝিনুকের সেই চরম দুর্ভাগ্য হয়নি। তোমরাই তাকে রক্ষা করেছ।

এদিকে বাঁ ধারে, অনেকটা দূরে, মাউন্ট হ্যারিয়েটের চুড়োটার ওপাশে সূর্য বেশ কিছুক্ষণ আগেই নেমে গিয়েছিল। দিনের শেষ মলিন আলোটুকু দ্রুত মুছে যাচ্ছে। ঝাপসা হালকা অন্ধকারের সঙ্গে নেমে আসছে ফিনফিনে কুয়াশা। আঁধারে কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপপুঞ্জ। যেটুকু আলো এখনও রয়েছে তাতে মাউন্ট হ্যারিয়েটের মাথায় ধবধবে বিশাল ক্রশটা কিন্তু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

শয়ে শয়ে সি-গাল পাখি সারাদিন সমুদ্রের উপর চক্কর দিয়ে বেড়ায়। এখন তারা ডানা ঝাপটে পাড়ের দিকে চলেছে। এটা তাদের ঘরে ফেরার সময়। সেই ভোর থেকে সূর্যাস্ত অবধি উপসাগরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সার্ডিন, হাঙরের বাচ্চা কী ছোট ছোট চাঁদা মাছ ধারালো ঠোঁটে তুলে এনে খেয়েছে। পেট ভরতি। পরিতৃপ্ত সিন্ধুশকুনেরা নিত্যকর্ম সেরে এবার পাড়ের কোনও গাছের ডালে রাত কাটাবে। পরদিন সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ফের বেরিয়ে পড়বে উপসাগরের দিকে। সমস্ত দিন ধরে চলবে মাছ শিকার আর খাওয়া। পাখিগুলির পেটে রাহুর খিদে।

অন্য কোনও দিকে নজর ছিল না বিনয়ের। সে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। পলকহীন।

ঝিনুকদের জাহাজটা সিসোস্ট্রেস বে ছাড়িয়ে যেখানে গিয়ে পৌঁছেছে সেখানে একদিকে অফুরান বঙ্গোপসাগর; অন্য দিকে ছোট-বড় অনেকগুলি দ্বীপ। স্টিমশিপ 'সাগর' এক সময় ছোট হতে হতে একটি আবছা বিন্দুর মতো দ্বীপগুলির আড়ালে মিলিয়ে গেল।

উপসাগরের দিক থেকে বিকালে বা সন্ধেয় প্রবল হাওয়া উঠে আসে। আজও আসছিল। ঠান্ডা, আরামদায়ক বাতাস। বিনয়ের খেয়াল হল, অনেকক্ষণ সে পাহাড়ের ঢালের এই রাস্তাটায় দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্যে শেখরনাথ হয়তো ফিরে এসেছেন। তিনি বলে গিয়েছিলেন, বিনয় যেন আজ যতটা পারে সেলুলার জেলটা ঘুরে ঘুরে দেখে। ঘণ্টাখানেক বা ঘণ্টা দেড়েকের ভিতর বিশাল ওই বন্দিশালার কতটুকুই বা দেখা সম্ভব? পরে পুরো দু'-তিনটে দিন তাকে সঙ্গে নিয়ে যতগুলি ব্লক আছে সব দেখিয়ে দেবেন।

কিন্তু আজ প্রায় কিছুই দেখা হয়নি। অন্যমনস্কর মতো হাঁটতে হাঁটতে জেলের থমথমে ভীতিকর চেহারার গেট পেরিয়ে বিনয় চলে এসেছিল বাইরের রাস্তায়। আর সেখানেই দেখা হয়ে গিয়েছে ঝিনুকের সঙ্গে। কতকালের চেনা এই ঝিনুক কিন্তু আজ মনে হল কত অচেনা। সে যেন অজানা গ্রহের কোনও মানুষ। অথচ তার সঙ্গে দেখা হোক, এই তীব্র বাসনাটা মনের কোনও নিভৃত কুঠুরিতে লুকিয়ে রেখেছিল, এমনকী ঝুমা তার কাছাকাছি এসে পড়ার পরও। কত দুঃখ, কত যাতনাই না এই মেয়েটির জন্য সে সয়েছে। কিন্তু এরকম একটা দেখা হবে সে জন্য সে কি আদৌ প্রস্তুত ছিল? টের পাচ্ছিল উতরোল বুকের তলদেশে অবিরল শেল বিঁধে যাচ্ছে।

ক্লান্ত, বিপর্যস্ত বিনয় আর দাঁড়াল না; ঢালু রাস্তার চড়াই বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠে এল। তারপর সেলুলার জেলের গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে সোজা হাসপাতালের দোতলায়।

এখন চারদিকে আলো জ্বলছে।

একপাশে সারি সারি কুঠুরি; এক সময় যা ছিল কয়েদিদের সেল। সেগুলির সামনে দিয়ে টানা চওড়া রেলিংগুলি প্যাসেজ দোতলার এক মাথা থেকে বহুদূরে শেষ মাথা অবধি চলে গেছে।

প্যাসেজে খানিকটা পর পর বসার জন্য বেঞ্চি পাতা। কিছুক্ষণ আগে এখানে প্রচুর লোকজন থিক থিক করছিল। তারা ছিল ভিজিটর; হাসপাতালে ভরতি রোগীদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব। তাদের বেশিরভাগই চলে গিয়েছে, ভিড় এখন বেশ হালকা। এখানে-ওখানে সামান্য কয়েকজনকে দেখা যায়।

বিনয় যখন শেখরনাথের সঙ্গে নিচে নেমে যায় র স্ত্রী ছেলেমেয়েরা প্যাসেজের একটি বেঞ্চে যেমন বসে ছিল ঠিক তেমনি জড়সড় হয়ে বসে আছে। পাংশু, শীর্ণ, উৎকণ্ঠিত সারি সারি মুখ। শেখরনাথকে তাদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে। জেফ্রি পয়েন্টের সেটলমেন্ট থেকে পুনর্বাসন দপ্তরের যে কর্মীরা কে ধরাধরি করে নিয়ে এসেছিল তারা শেখরনাথদের কাছাকাছি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। একটা ফাঁকা বেঞ্চের উপর দু'টো বড় ডেকচিতে ডাঁই করা আটার রুটি আর আলু, কুমড়ো এবং নানারকম সবজি দিয়ে তৈরি ঘ্যাঁট ছাড়াও রয়েছে শালপাতার একগোছা থালা।

বিনয় আন্দাজ করে নিল শেখরনাথ তাঁর ভাইপো বিশ্বজিৎ রাহার সঙ্গে দেখা করে খাবারদাবার নিয়ে ফিরে এসেছেন। এতগুলি মানুষ সেই কোন সকালে মোহনবাঁশিকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটে এসেছিল; সারাদিনে তাদের পেটে একফোঁটা জলও পড়েনি। খিদেয় নাড়ি চুঁইয়ে যাচ্ছে। একে দুর্ভাবনা, তার উপর সারাদিন না খাওয়া। ওরা যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে— বিরাট সমস্যা। দেখা যাচ্ছে, শেখরনাথের সব দিকে নজর।

বিনয় ভেবেছিল, জারোয়াদের তিরে মারাত্মক জখম হওয়ার খবরটা পেয়ে বিশ্বজিৎ তক্ষুনি চলে আসবেন। কেননা ছিন্নমূল মানুষগুলির প্রতি তাঁর কত যে সহানুভূতি! তিনি না আসায় রীতিমতো অবাকই হল বিনয়।

ওদিকে শেখরনাথের কথামতো পুনর্বাসনের একজন কর্মী শালপাতার থালায় রুটি-তরকারি সাজিয়ে মোহন বাঁশির স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের দিকে বাড়িয়ে ধরল।

মোহনবাঁশির স্ত্রীর কপালের আধাআধি অবধি ঘোমটা টানা। করুণ সজল দৃষ্টিতে একবার শেখরনাথের দিকে তাকিয়ে তক্ষুনি চোখ নামিয়ে নিল। ছেলেমেয়েগুলি বোবার মতো তাকিয়ে রইল শুধু। তারা কেউ খাবারের থালাগুলি ধরল না। হাত গুটিয়ে সবাই বসে থাকে।

শেখরনাথ নরম গলায় বললেন, 'কী হল, নাও—'

ঢোক গিলে শুকনো গলায় মোহনবাঁশির স্ত্রী বলল, 'খাওনের ইচ্ছা নাই। জবর তরাস (ভয়) লাগতে আছে।'

ছেলেমেয়েরা কিছু বলল না।

শেখরনাথ তাদের মনোভাব আঁচ করে নিয়েছেন। বললেন, 'ভয় পেলে চলবে? মনে জোর রাখতে হবে। ডাক্তারবাবু বলেছেন, মোহনবাঁশি বেঁচে যাবে।' শেষ কথাগুলি সাহস দেওয়ার জন্য। ডাক্তার চট্টরাজ ঠিক এতখানি ভরসা দেননি। তিনি বলেছেন, মোহনবাঁশির প্রাণরক্ষার জন্য তাঁরা সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন। হয়তো লোকটা বেঁচে যাবে। তবে সবই নির্ভর করছে অপারেশনের পর। ব্যস, এটুকুই।

ডাক্তার চট্টরাজ যা বলেছেন হুবহু তা জানালে মোহনবাঁশির স্ত্রী ছেলেমেয়েরা আরও ভেঙে পড়বে। তারা কিছুতেই খাবে না; একরকম জোরজার করে নিজে তাদের হাতে খাবারের থালাগুলি ধরিয়ে দিলেন শেখরনাথ। 'খাও বলছি।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও, নিঃশব্দে খাওয়া শুরু হল।

শেখরনাথ এবার পুনর্বাসন কর্মীদের দিকে ফিরলেন।— 'সারাদিন তোমাদের যথেষ্ট ধকল গিয়েছে। না খাওয়া, না চান। তার উপর পাহাড়ি রাস্তায় ট্রাকের ঝাঁকুনি। নাও নাও, রুটিটুটি তুলে নিয়ে খেতে শুরু কর।'

পুনর্বাসনের কর্মীরা সামান্য ইতস্তত করে বলল, 'কাকা, আপনে খাইবেন না?'

'আমার জন্য ভেবো না। বিশুর কাছে গিয়েছিলাম। সে

banglabooks.in

আমাকে জোর করে খাইয়ে দিয়েছে আর তোমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছে।' বলতে বলতে শেখরনাথের নজর এসে পড়ল বিনয়ের উপর।— 'আরে, তোমার কথা একেবারেই খেয়াল ছিল না। কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

ঝিনুকের ব্যাপারটা না জানিয়ে ভাসা ভাসা জবাব দিল বিনয়।— 'আপনি সেলুলার জেলটা দেখতে বলে গিয়েছিলেন। এধারে-ওধারে ঘুরে তাই দেখছিলাম।'

কী দেখেছে তা নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আর কোনও প্রশ্ন করলেন না শেখরনাথ। তাড়া দিয়ে বললেন, 'সারাদিনে তোমারও তো কিছু খাওয়া হয়নি। রুটি-তরকারি খেয়ে নাও—'

খাওয়াদাওয়া চুকে গেলে শেখরনাথ পুনর্বাসন কর্মীদের বললেন, 'এবার তোমরা তোমাদের আস্তানায় চলে যাও। ভালো করে বিশ্রাম নাও। আর তোমাদের হাসপাতালে আসতে হবে না। কাল সকালে উঠে সোজা জেফ্রি পয়েন্টের সেটলমেন্টে চলে যাবে। মোহনবাঁশির ব্যাপারটা আমরা দেখব।'

বিনয় আগেই জেনেছিল, পোর্টব্লেয়ারের এবারডিন মার্কেটের পাশে রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট একটা বড় বাড়ি ভাড়া নিয়েছে! কলকাতা থেকে নতুন উদ্বাস্তুরা এলে সেখানে তারা দু'-এক দিন থাকে। তারপর তাদের সাউথ আন্দামানের নানা এলাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শুধু কলকাতা থেকে আসা উদ্বাস্তুরাই নয়, পুনর্বাসন দপ্তরের কর্মীরা সুদূর সেটলমেন্টগুলি থেকে কোনও প্রয়োজনে পোর্টব্লেয়ারে এলে তারাও এখানে কাটিয়ে যায়।

জেফ্রি পয়েন্ট থেকে মোহনবাঁশিকে নিয়ে যে কর্মীরা এসেছিল তারা চলে গেল। মোহনবাঁশির স্ত্রী ছেলেমেয়েরা যেখানে বসে আছে তাদের সেখানে অপেক্ষা করতে বলে শেখরনাথ বিনয়কে বললেন, 'চল, ডাক্তার চট্টরাজের সঙ্গে দেখা করে পেশেন্টের এখনকার হাল জেনে নিই। এতক্ষণে সে নিশ্চয়ই মোহনবাঁশির ট্রিটমেন্টের সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেলেছে।'

ডাক্তার চট্টরাজের চেম্বারটি কোনাকুনি ডানধারে— খানিকটা দূরে। সেদিকে যেতে যেতে বিনয় জিজ্ঞেস করল, 'এমন একটা মারাত্মক ঘটনার খবর পেয়েও রাহাসাহেব এলেন না কেন? ভেবেছিলাম'— বাকিটা শেষ না করে থেমে গেল সে।

শেখরনাথ বললেন, 'ওর আসার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সন্ধেবেলায় চিফ কমিশনার রিহ্যাবিলিটেশনের ক'জন অফিসারকে তাঁর বাংলোয় ডেকেছেন। তাই আসতে পারল না। হাসপাতালের কাজ চুকলে মোহনবাঁশির বউ ছেলেমেয়ে আর তোমাকে তার বাংলোয় নিয়ে যেতে বলেছে। যে ক'দিন পোর্টব্লেয়ারে আছি, তার বাংলোতেই থাকব।'

বিনয় আর কোনও প্রশ্ন করল না।

ডাক্তার চট্টরাজ তাঁর চেম্বারেই ছিলেন। মোহনবাঁশিকে এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ভরতি করা হয়েছিল। ডাক্তার চট্টরাজকে দেখে মনে হল, তাকে দেখে একটু আগে ফিরে এসেছেন। চুল এলোমেলো, কেমন একটু চিন্তাগ্রস্ত, অস্থির অস্থির ভাব। লক্ষণটা ভালো লাগল না বিনয়ের।

শেখরনাথ আর বিনয়কে দেখে উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার চট্টরাজ। টেবিলের এধারে সারি সারি চেয়ারগুলি দেখিয়ে বললেন, 'বসুন বসুন—'

শেখরনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'মোহনবাঁশিকে তোমার হাতে দিয়ে আমি বিশুর কাছে গিয়েছিলাম। এক ঘণ্টার বেশি কেটে গেছে। ওর কন্ডিশন কীরকম বুঝছ?'

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসে রইলেন ডাক্তার চট্টরাজ। তারপর সোজা শেখরনাথের দিকে তাকালেন।— 'খুবই সিরিয়াস কাকা।'

দুর্ভাবনার ছায়া পড়ল শেখরনাথের চোখেমুখে।— 'কীরকম?'

ডাক্তার চট্টরাজ জানালেন, জারোয়াদের তির মোহনবাঁশির ফুসফুসে ঢুকে গেছে। সেটা ভীষণ বিপজ্জনক। তিরটা বার করতে গিয়ে যদি ভিতরে রক্তক্ষরণ হয় লোকটাকে বাঁচানো যাবে কি না বলা মুশকিল।

নীরবে বসে রইলেন শেখরনাথ। তাঁর উৎকণ্ঠা বাড়ছিল। বিনয়েরও।

বেশ কিছুক্ষণ পর ডাক্তার চট্টরাজ বললেন, 'যে অবস্থায় মোহনবাঁশিকে নিয়ে এসেছিলেন তিরটা ঠিক সেইরকম বিঁধে আছে। ওটা বার না করলেই নয়। কিন্তু আজ তা সম্ভব না।'

রুদ্ধশ্বাসে শেখরনাথ জানতে চাইলেন, 'কেন'?

'তিরটা বার করার জন্য আমার দু'জন অ্যাসিস্টান্ট সার্জন দরকার। তেমন কেউ আপাতত হাসপাতালে নেই।' ডাক্তার চট্টরাজ বলতে লাগলেন, 'আপনি তো জানেন কাকা, আমাদের এখানে প্রয়োজনের তুলনায় স্টাফ কম। বিশেষ করে ডাক্তার। কলকাতা বা মাদ্রাজ থেকে কোনও ডাক্তার এখানে চাকরি নিয়ে আসতে চায় না। মাত্র কয়েকজনকে নিয়ে এত বড় হাসপাতাল চালাতে হচ্ছে। আমার দু'জন ব্রাইট ইয়াং সহকর্মী দু' সপ্তাহ আগে কার নিকোবরে গেছে। সেখানে ক'টা ক্রিটিকাল অপারেশন সেরে কাল সকালে তাদের ফেরার কথা। ওরা এসে পৌঁছুলেই তিরটা বার করব।'

'যদি কোনও কারণে ওদের না আসা হয়, তা হলে?'

'সেটা বিরাট সমস্যা। আশা করছি এসে যাবে। না এলে আমাকেই যা করার করতে হবে। রিস্ক হবে ঠিকই, কিন্তু সেটা না নিয়ে উপায় নেই।

গভীর উদ্বেগের সুরে শেখরনাথ বললেন, 'আজ সকালের দিকে তির বিঁধেছে। সেই অবস্থায় সারাদিন কেটেছে, রাতটাও কাটবে। আমার কিন্তু একেবারেই ভালো মনে হচ্ছে না।'

ডাক্তার চট্টরাজ বললেন, 'যাতে ইনফেকশন ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য দু'টো ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে। রাত্তিরে আরও দু'টো দেওয়া হবে। একটাই সুলক্ষণ, ফুসফুসের ফাংশন বন্ধ হয়ে যায়নি। মোহনবাঁশি বেঁচে আছে, তবে চেষ্টা করেও জ্ঞান ফেরাতে পারিনি। ভাববেন না কাকা, আজকের রাতটা আমি হাসপাতালে মোহনবাঁশির কাছে থাকব। কোয়ার্টারে ফিরব না।'

একটু চিন্তা করে শেখরনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কী মনে হয়, আমার হাসপাতালে থাকা দরকার? তা হলে মোহনবাঁশির বউ ছেলেমেয়ে আর বিনয়কে বিশুর বাংলোয় পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসব।'

মোহনবাঁশি পূর্ব পাকিস্তানের একজন সামান্য উদ্বাস্তু, যার সঙ্গে লেশমাত্র সম্পর্ক নেই, সম্পূর্ণ অনাত্মীয়, জেফ্রি পয়েন্টে আসার আগে তাকে কোনও দিন দেখেননি, তবু তার প্রতি কী গভীর মমতা শেখরনাথের। কতখানি তীব্র উদ্বেগ! বয়স তো কম হয়নি, তার উপর সেই সকাল থেকে শরীরের উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। সেসব অগ্রাহ্য করে তিনি কি না মোহনবাঁশির জন্য হাসপাতালে রাত কাটাতে চাইছেন! অগ্নিযুগের এই বিপ্লবী মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধা শতগুণ বেড়ে গেল বিনয়ের। অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে সে।

এদিকে ডাক্তার চট্টরাজ ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।— না না কাকা, আপনাকে এখানে এসে রাত জাগতে হবে না। হাসপাতালে তো আপনার কিছু করার নেই। রাহা সাহেবের বাংলোয় গিয়ে খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়ুন। বয়স হয়েছে, ঘুমটা কিন্তু আপনার খুব দরকার। কাল বেলার দিকে এসে মোহনবাঁশির খবর নেবেন।'

'ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ, বিশুর ওখানে চলেই যাই। কিন্তু ঘুমোতে কি আর পারব? মোহনবাঁশির জন্য বড্ড চিন্তা হচ্ছে ডাক্তার।' বলতে বলতে উঠে পড়লেন।

বিনয়ও আর বসে থাকল না। তাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরের প্যাসেজে বেরিয়ে এলেন শেখরনাথ। নিচু গলায় বললেন,

banglabooks.in

'ডাক্তারের সঙ্গে যা কথা হল, মোহনবাঁশির বউ ছেলেমেয়েদের কিন্তু বোলো না। শুনলে কান্নাকাটি শুরু করে দেবে। যা বলার আমিই ওদের বলব।'

বিনয় আস্তে মাথা হেলিয়ে দিল।— 'আচ্ছা।'

মোহনবাঁশির পুরো পরিবারটি যেখানে বসে ছিল সেখানে আসতেই তার স্ত্রী ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। শুষ্ক, শীর্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'ডাক্তারবাবু কী কইল? মানুষটা কেমুন আছে?'

মানুষটা বলতে মোহনবাঁশি। উত্তর দিতে গিয়ে একটু যেন থেমে গেলেন শেখরনাথ। তারপর বললেন, 'ইঞ্জেকশন, ওষুধ সবই দেওয়া হয়েছে। ভয়ের কারণ নেই।'

মোহনবাঁশির স্ত্রী গেঁয়ো মেয়েমানুষ। দেশভাগের আগে পূর্ববাংলায় তাদের নিজেদের গ্রাম এবং তার চারপাশের কয়েকটি গ্রামগঞ্জের বাইরে কোনও দিন পা বাড়ায়নি। নিরক্ষর হলেও সে নির্বোধ নয়, মুখ দেখে মনের কথা হয়তো পড়তে পারে। একদৃষ্টে সে শেখরনাথকে লক্ষ করছিল। চোখের পাতা পড়ছিল না তার। বলল, 'আপনে ঠিক নি ক'ন?'

শেখরনাথ ভিতরে ভিতরে খুব সম্ভব বিব্রত বোধ করলেন। লহমায় তা সামলে নিয়ে বললেন, 'বেঠিক বলব কেন? এখন চল—'

'না, আমাগো যাইতে কইয়েন না। মনে বড় কুডাক ডাকতে আছে। আমরা এহানেই থাকুম। অন্য কুনোহানে যামু না।'

'এখানে কোথায় থাকবে?'

'এই কাঠের পাটায় (বেঞ্চে) বইয়া (বসে) থাকুম।'

'খুব দরকার না হলে রোগীর বাড়ির লোকেদের হাসপাতালে রাত্তিরে থাকতে দেয় না। তেমন বুঝলে ডাক্তারবাবু তোমাদের থাকতে বলতেন।' বলে একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার ওপর তোমাদের ভরসা আছে তো?'

'নিয্যস (নিশ্চয়ই)। আপনেরা ছাড়া এই দ্বীপি আমাগো আপনাজন (আপনজন) আর কে আছে?'

'তা হলে চল।'

অনেক বোঝানোর পর প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত মোহনবাঁশির স্ত্রীকে রাজি করানো গেল।

শেখরনাথ বিশ্বজিতের একটি জিপ নিয়ে এসেছিলেন। দোতলা থেকে নেমে নিচের বিশাল চত্বরে এসে মোহনবাঁশির গোটা পরিবার এবং বিনয়কে নিয়ে জিপে উঠে পড়লেন শেখরনাথ।

দুই

জিপটা সেলুলার জেলের বিশাল চত্বর পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। খানিকটা এগিয়ে টিলার ঢাল বেয়ে নিচে নেমে সোজা এবারডিন মার্কেট। মার্কেটের দোকানপাট বেশ রাত অবধি খোলা থাকে। এখন তো সবে সন্ধে পেরিয়েছে। চারিদিকে আলো জ্বলছে। ইলেকট্রিক লাইট ছাড়াও রয়েছে গ্যাসের আলোও। লোকজনও প্রচুর চোখে পড়ছে। বিকিকিনি চলছে পুরোদমে।

জিপ চালাচ্ছিল বিশ্বজিৎ রাহার ড্রাইভার কালীপদ। ফ্রন্ট সিটে তার পাশে বসে আছে বিনয় এবং শেখরনাথ। পেছনের মুখোমুখি দুটো লম্বা সিটে মোহনবাঁশির স্ত্রী-ছেলেমেয়েরা। উদ্বাস্তুরা সেটেলমেন্ট থেকে কোনও কারণে পোর্টব্লেয়ারে এলে এবারডিন মার্কেটের পাশে পুনর্বাসন দপ্তরের ভাড়া করা বাড়িতে রাখা হয়। কিন্তু মোহনবাঁশির পরিবারের লোকজন এতটাই কাতর, এতটাই উৎকণ্ঠিত যে রিহ্যাবিলিটেশনের কর্মীরা ওদের সামলাতে পারবে না; তাই শেখরনাথ বিশ্বজিতের বাংলোয় নিয়ে চলেছেন। খুব সম্ভব এই নিয়ে বিশ্বজিতের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। যে ক'দিন মোহনবাঁশির স্ত্রী-ছেলেমেয়েরা পোর্টব্লেয়ারে আছে, বিশ্বজিতের বাংলোতেই থাকবে। ওদের চোখে চোখে রাখা একান্ত দরকার।

এবারডিন মার্কেট এবং তার চারপাশের এলাকাটা খুব ভালোই চেনে বিনয়। এই তো সেদিন উদ্বাস্তুদের সঙ্গে 'রস' আইল্যান্ড থেকে মোটরবোটে পোর্টব্লেয়ারে নেমে এবারডিন মার্কেটের জিমখানা ময়দানে এসেছিল। সেখান থেকে বিশ্বজিতের সঙ্গে তাঁর বাংলোয়।

মার্কেটের জমজমাট চৌহদ্দি পেছনে ফেলে পশ্চিম দিকের রাস্তা ধরল জিপটা। উঁচু-নিচু টিলা পেরিয়ে সেটা চলেছে তো চলেছেই। দু'ধারে পরিচিত দৃশ্য। রাস্তার নিচের ঢালু জমিতে ধানখেত; দূরে দূরে ছাড়া ছাড়া ভাবে বাড়ি-ঘর। কাঠের বাড়িই বেশি; ক্বচিৎ দু-চারটে পাকা দালান।

এক সময় ফুঙ্গি চাউং বা বুদ্ধমন্দিরের কাছে এসে বাঁক ঘুরে জিপটা ডাইনে দৌড় শুরু করল। সামনে পাহাড়; তার ওধারের ঢালের মাঝামাঝি মিডল পয়েন্টে বিশ্বজিৎ রাহার বাংলো।

ক'দিন আগেই পূর্ণিমা ছিল। আকাশে ছিল পূর্ণ চাঁদের মায়া। সেই চাঁদ অনেকটা ক্ষয়ে গেলেও যেটুকু জ্যোৎস্না ঢালছে তাতে চরাচর যেন কোনও অপার্থিব রহস্যে ভরে আছে।

জিপের সবাই চুপচাপ। কেউ কোনও কথা বলছিল না। শুধু পেছনের সিট থেকে মোহনবাঁশির স্ত্রীর চাপা কান্নার ক্ষীণ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

এক সময় পাহাড় পেরিয়ে বিশ্বজিতের বাংলোর সামনে এসে জিপ থামল। বিনয়কে নিয়ে শেখরনাথ নেমে পড়লেন। তারপর মোহনবাঁশির স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের নামিয়ে আনলেন। —'এসো—এসো আমার সঙ্গে।'

কাঠের দোতলা বাড়ি। রাস্তা থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে শেখরনাথ গলার স্বর উঁচুতে তুললেন। 'গোপাল, কার্তিক, ভুবন—আমরা এসে গেছি।'

বিনয় জানে ওই তিনজন বিশ্বজিতের কাজের লোক। ওদের আগে থেকে খবর দেওয়া ছিল। তারা দৌড়ে দোতলার সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াল।

শেখরনাথ কার্তিককে জিগ্যেস করলেন, 'একটা ঘরে চারজনের মতো বিছানা-টিছানা ঠিক করে রাখতে বলেছিলাম। রেখেছিস তো?'

বাড়ি সাফ করা, ঘর গুছানো, বিছানা পাতা—এইসব কাজ কার্তিক করে। গোপাল তার সঙ্গে হাত লাগায়, তা ছাড়া নানা ফাইফরমাশও খাটে। কার্তিক বলল, 'হ্যাঁ, কাকা।'

বিনয় আগেই লক্ষ করেছে যার সঙ্গেই শেখরনাথের দেখা হয়েছে, বাঙালি হলে তারা কাকা বলেছে, বাকিরা চাচা। এমনকী এই বাংলোর কাজের লোকেরাও তাই। বিশ্বজিতের কাকা, সেই সুবাদে তিনি আন্দামানের সব বাসিন্দারই কাকা।

শেখরনাথ জিগ্যেস করলেন, 'বিশু এসেছে?'

'না।'

বিনয় আন্দাজ করে নিল চিফ কমিশনারের বাংলোয় মিটিং সারতে বিশ্বজিতের দেরি হচ্ছে। তাই এখনও তিনি ফিরতে পারেননি।

সবাই দোতলায় উঠে এল। এখানে বেতের সোফা-টোফা দিয়ে সাজানো মস্ত ড্রইং-রুমের তিন দিকে পাঁচখানা শোওয়ার ঘর। এই বাংলোয় এক রাত কাটিয়ে গেছে বিনয়। এসব তার চেনা।

শেখরনাথ বললেন, 'কোন ঘরে ব্যবস্থা হয়েছে।'

বাঁ পাশের কোণের ঘরটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল কার্তিক।

শেখরনাথ বললেন, 'ওটার লাগোয়া বাথরুম আছে। ওদের ওখানে নিয়ে যা। গরম জল করে দিস। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে ওরা চান-টান সেরে নিক।' ভুবনকে বললেন, 'তোর রান্নাবান্না হয়ে গেছে?'

ভুবন জানাল, দু-একটা পদ বাকি আছে।

banglabooks.in

'তাড়াহুড়ো করতে হবে না। হাসপাতালে ওরা রুটি-তরকারি খেয়ে এসেছে। এই তো সন্ধে পার হল। ক'টা আর বাজে! ঘণ্টা দেড়-দুই পরে ওদের ভাত দিস।'

কার্তিক মোহনবাঁশির স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোণের ঘরে চলে গেল। শেখরনাথ বিনয়কে সঙ্গে করে ড্রইংরুমের সোফায় গিয়ে বসলেন। ওঁরা আজকের সারাদিনের ঘটনাগুলো নিয়ে এলোমেলোভাবে কথা বলতে লাগলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে বিশ্বজিৎ ফিরে এলেন। তাঁর জিপে বিনয়রা হাসপাতাল থেকে এসেছিল। তিনি অন্য একটা গাড়িতে এসেছেন।

বিশ্বজিৎ সোজা বিনয়দের কাছে এসে বসলেন। জিগ্যেস করলেন, 'কাকা, মোহনবাঁশি কর্মকারের লেটেস্ট খবর কী? আমার অফিস থেকে হাসপাতালে গিয়ে কেমন দেখলেন?'

শেখরনাথ যে ঘরটায় মোহনবাঁশির স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের পাঠানো হয়েছে সতর্কভাবে একবার সেদিকে তাকালেন। গলার স্বর যাতে সেখানে না পৌঁছায় সেভাবে প্রায় ফিস ফিস করে বললেন, 'দেখতে আর দিল কোথায়? ওকে এমার্জেন্সিতে রাখা হয়েছে।' তারপর ডাক্তার চট্টরাজের সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে, সব জানিয়ে দিলেন।

দুর্ভাবনার রেখাগুলো ফুটে ওঠে বিশ্বজিতের চোখে-মুখে।

—'খুব সমস্যা হল কাকা। লোকটাকে যদি বাঁচানো না যায়, জেফ্রি পয়েন্টে সেটলমেন্টে তার ভীষণ খারাপ রি-অ্যাকশন হবে। কিছুদিন আগে জারোয়ারা একবার হানা দেওয়ার পর উদ্বাস্তুরা এত ভয় পেয়ে যায় যে কিছুতেই আন্দামানে থাকতে চাইছিল না। তখন কেউ খুন-জখম হয়নি। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাদের রাখতে পারা গিয়েছিল। কিন্তু মোহনবাঁশির মৃত্যু হলে ওরা কী যে করবে ভেবে পাচ্ছি না। দেখা যাক, কার নিকোবর থেকে দুই সার্জন ফিরে আসার পর কী হয়। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।'

শেখরনাথের হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল। —'দ্যাখ বিশু, জেফ্রি পয়েন্টের উত্তর দিকটায় জারোয়ারা থাকে। আমার ধারণা, ওধারের জঙ্গল কাটা পড়ছে বলে ওরা খেপে গেছে। ওদের তাড়িয়ে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন করাটা ঠিক হচ্ছে না।'

একটু নীরবতা।

তারপর শেখরনাথই ফের শুরু করলেন, 'উত্তর দিকটা বাদ দিয়ে তোরা বরং পুব দিকের জঙ্গলগুলো আরও বেশি করে রিক্লেম কর।'

বিশ্বজিৎ চকিত হয়ে উঠলেন। 'কিন্তু'

'কী হল?'

'গভর্নমেন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে, উত্তর আর পুবের জঙ্গল সাফ করতে হবে। নইলে এত ভি পি ফ্যামিলিকে জমি দেওয়া যাবে কী করে?'

শেখরনাথ বললেন, 'আমি কিন্তু তোর লোকেদের উত্তর দিকের জঙ্গল কাটতে বারণ করে এসেছি।'

'সে কী!' কয়েক লহমা হতবাক তাকিয়ে থাকেন বিশ্বজিৎ। তারপর ভয়ে ভয়ে বললেন, 'এটা কিন্তু ঠিক করেননি কাকা।'

'তার মানে?' বেশ রেগেই গেলেন শেখরনাথ। 'যারা ওখানকার আদি বাসিন্দা, জঙ্গল কেটে তাদের এলাকা ছোট করে দেওয়া হচ্ছে, এটা কি ঠিক কাজ? তোরা জানিস না অনেকটা জায়গা জুড়ে জারোয়ারা ঘুরে বেড়ায়?'

ঢোক গিলে বিশ্বজিৎ বললেন, 'গভর্নমেন্ট এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমাদের পক্ষে এর বাইরে যাওয়া সম্ভব নয় কাকা। ওপর থেকে যে নিয়ম বেঁধে দেবে সরকারি কর্মচারী হিসেবে আমাদের তা না মেনে উপায় নেই।'

'এর ফলে জারোয়ারা কিন্তু আরও বেশি হোস্টাইল হয়ে উঠবে। ওদের ডিসটার্ব করা উচিত নয়।'

বিশ্বজিৎ চুপ করে রইলেন।

স্থির দৃষ্টিতে ভাইপোকে লক্ষ করতে করতে শেখরনাথ বললেন, 'তোরা যে নিরুপায় তা বুঝতে পারছি। তোদের ওপর যে হুকুম জারি করা হয়েছে সেটা তামিল করতে তোরা বাধ্য। কিন্তু আমি গভর্নমেন্টের চাকর নই। আন্দামান-নিকোবরের হর্তাকর্তা বিধাতা হলেন চিফ কমিশনার। আমি দু-একদিনের মধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলব, জেফ্রি পয়েন্টের উত্তর দিকের জঙ্গল কাটা বন্ধ করা হোক।'

বিশ্বজিৎ তাঁর বিপ্লবী কাকাটিকে খুব ভালোই চেনেন। ভীষণ একরোখা। প্রচণ্ড জেদি। কোনও নিয়মকানুনের তোয়াক্কা করেন না। যা সংগত মনে করেন সেটাই করবেন। একবার যখন গোঁ ধরেছেন চিফ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করবেন, তাঁকে কোনওভাবেই ঠেকানো যাবে না। চিফ কমিশনার ওঁকে স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে যথেষ্ট সম্মান করেন কিন্তু তাঁর কথা কতটা মানবেন, বিশ্বজিৎ সে ব্যাপারে নিশ্চিত নন। বরং যথেষ্ট সন্দিহান। কেননা একবার সরকারি স্তরে অনেক বিচার-বিবেচনা আর ভাবনা-চিন্তার পর যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেখান থেকে পিছিয়ে আসা মুশকিল। বিশ্বজিৎ বললেন, 'আপনার যখন মনে হয়েছে, দেখা করুন।'

এবার শেখরনাথ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। 'তোর সঙ্গে আরেকটা খুব জরুরি কথা আছে।'

উৎসুক চোখে তাকালেন বিশ্বজিৎ।

জেফ্রি পয়েন্টের উদ্বাস্তু সৃষ্টিধরের বউয়ের বাচ্চা হওয়ার উদ্বেগজনক ঘটনাটার অনুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে শেখরনাথ বললেন, 'আমি ওখানে ছিলাম তাই সমস্যাটার মোটামুটি সুরাহা হয়েছে। ডাক্তার নেই, ওষুধ-বিষুধ নেই, নার্স নেই। জেফ্রি পয়েন্ট থেকে তিনটে পাহাড় পেরিয়ে যে রিফিউজি সেটলমেন্ট বসানো হয়েছে সেখান থেকে একজন দাইকে নিয়ে এসে ব্যাপারটা সামাল দেওয়া গেছে। এভাবে তো চলতে পারে না। এতগুলো মানুষকে তোরা জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গেছিস। তাদের অসুখ-বিসুখ আছে, অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে, বিষাক্ত কানখাজুরা যে কোনও সময় কামড়াতে পারে। এদের জন্যে ইমিডিয়েটলি ওখানে একটা হেল্‌থ সেন্টার খোলা দরকার। চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে ডাক্তার, কমপাউন্ডার থাকা চাই। নইলে রোগীদের চিকিৎসার জন্যে পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূরে পোর্টব্লেয়ারে আনতে হলে অনেকে রাস্তাতেই পরপারে চলে যাবে।'

বিশ্বজিৎ বললেন, 'কাছাকাছি দু-তিনটে সেটলমেন্টের জন্যে একটা করে হেল্‌থ সেন্টার খোলার পরিকল্পনা আছে। কিন্তু এখনও ফান্ডের ব্যবস্থা হয়নি।'

'তামাশা নাকি! এতগুলো মানুষকে ঘোর জঙ্গলে এনে ফেলে দিলাম। তারপর মরলে মর, বাঁচলে বাঁচো। এতগুলো মানুষের লাইফ নিয়ে ছেলেখেলা!' গনগনে মুখে বললেন শেখরনাথ।

একেবারে কাঁচুমাচু হয়ে গেলেন বিশ্বজিৎ। 'কাকা, আপনি ভাববেন না, খুব তাড়াতাড়িই সব হয়ে যাবে।'

'দেখা যাক।' শেখরনাথ বলতে লাগলেন, 'সারা ভারতবর্ষ আজ যে স্বাধীনতার সুখ-ভোগ করছে তা এই মানুষগুলোর চরম স্যাক্রিফাইসের জন্যে। এটা সব সময় মনে রাখিস। ওয়েস্ট বেঙ্গলে, ত্রিপুরায়, আসামে বা অন্য কোথায় রিফিউজিদের জন্যে কী করা হচ্ছে, আমার পক্ষে নিজের চোখে তা দেখা সম্ভব নয়। শুনছি সর্বস্ব খুইয়ে যে লোকগুলো এপারে চলে এসেছে ওই সব জায়গায় তাদের হাল খুব শোচনীয়। সে যাক, আন্দামানে এদের জন্যে দায়সারা কিছু করে হাত ধুয়ে ফেললে আমি কিন্তু ছাড়ব না। তোমাদের চিফ কমিশনারকে জানিয়ে দিও, এই পোর্টব্লেয়ার শহরে তার অফিসের সামনে মুভমেন্ট শুরু করে দেব।'

বিশ্বজিৎ চমকে উঠলেন। 'না না কাকা, মুভমেন্টের কথা একদম ভাববেন না। তাতে আন্দামান সেটলমেন্টের ভীষণ ক্ষতি

banglabooks.in

হয়ে যাবে। এই দ্বীপে রিফিউজিরা আসতেই চাইবে না।' একটু থেমে বললেন, 'এত বড় 'রিহ্যাবিলিটেশনের কাজ এই দ্বীপে কেন, সারা দেশেই আগে কখনও হয়নি। শুরুতে অনেক ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। আমরা সব ঠিক করে নেব।'

শেখরনাথ একটু নরম হলেন। 'দেখা যাক।' তারপর জিগ্যেস করলেন, 'চিফ কমিশনারের বাংলোয় রিফিউজিদের নিয়ে কী মিটিং হল তোদের?'

'আপনি তো আগেই শুনেছেন, মাস দেড়েকের ভেতর আরও আড়াইশো ভি পি ফ্যামিলিকে আন্দামানে নিয়ে আসা হবে। তাদের বেশির ভাগকেই পাঠানো হবে মিডল আন্দামানে। একশোর মতো ফ্যামিলিকে নিয়ে যাওয়া হবে জেফ্রি পয়েন্টে।' বিশ্বজিৎ জানাতে লাগলেন, এতগুলো পরিবারকে সাত একর করে দিতে হলে সাড়ে সতেরোশো একর জমি দরকার। মিডল আন্দামানে জঙ্গল কেটে সাতশো একরের মতো জমি বার করা হয়েছে। সেখানে আরও জমি দরকার। তাই জঙ্গল কাটা থেমে নেই। জেফ্রি পয়েন্টে যে জমি আছে তার ওপর অরণ্য নির্মূল করে আরও তিনশো সাড়ে তিনশো একর জমি চাই। মিটিংয়ে এইসব জমি সম্বন্ধে সবিস্তার জানতে চেয়েছেন চিফ কমিশনার। কীভাবে তা ডিস্ট্রিবিউট করা হবে তা নিয়ে আলোচনাও হয়েছে।

শেখরনাথ কোনও প্রশ্ন করলেন না।

বিশ্বজিৎ বলতে লাগলেন, 'তবে একটা দুশ্চিন্তার ব্যাপার আছে কাকা।'

'কী?'

'স্বাধীনতার পর আন্দামানে রিহ্যাবিলিটেশন প্রোজেক্ট শুধুমাত্র বাঙালি উদ্বাস্তুদের জন্যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু যে উদ্বাস্তুরা কলকাতা থেকে আসতে চাইবে না তাদের জন্যে ঠিক করে রাখা জমি অনন্তকাল ফেলে রাখা হবে না। কিছুদিন অপেক্ষা করে সে সব মোপলাদের দেওয়ার কথা ভাবা হবে। আসল ব্যাপারটা অন্য জায়গায়।'

'কীরকম।'

'পশ্চিমবাংলার বাইরে এটা সেকেন্ড বেঙ্গল হয়ে উঠুক চিফ কমিশনর খুব সম্ভব তা চান না।'

চকিতে সেদিনের কথা মনে পড়ে গেল বিনয়ের। 'রস' আইল্যান্ড থেকে উদ্বাস্তুদের নিয়ে এবারডিন মার্কেটের সামনের মাঠে চলে এসেছিল বিভাস আর নিরঞ্জন। সঙ্গে ছিল বিনয় আর বিশ্বজিৎও। সেখানে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে চিফ কমিশনারকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর তিনি তাদের আন্দামানে স্বাগত জানিয়ে অনেক ভালো ভালো কথা বলেছিলেন। তাঁর মুখ থেকে অবিরল মধু ঝরে পড়ছিল। শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল বিনয়। মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধাও হয়েছিল খুব। পরে এই নিয়ে যখন বিশ্বজিতের সঙ্গে কথা হয়, রহস্যময় হেসে তিনি বলেছেন, লোকটার দুটো মুখ। আজ বোঝা গেল একটা মুখ দিয়ে তিনি উদ্বাস্তুদের জন্য অপার সহানুভূতি ঢেলে দেন। কিন্তু আড়ালে যে মুখটা রয়েছে সেটা ভীষণ চতুর। ফন্দিবাজ। উদ্বাস্তুরা হাজারে হাজারে এলে এই বিশাল দ্বীপপুঞ্জ বাঙালিদের দখলে চলে যাবে। সেটা তাঁর কাম্য নয়। এই দ্বিতীয় মুখটা সম্পর্কে সেদিন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বিশ্বজিৎ।

এদিকে রীতিমতো চিন্তিত দেখাল শেখরনাথকে। বললেন, 'এটা ভীষণ দুর্ভাবনার কথা। মোপলাদের সম্বন্ধে আমার কোনওরকম বিদ্বেষ নেই। কিন্তু প্রায়োরিটি অবশ্যই বাঙালি উদ্বাস্তুদের রিহ্যাবিলিটেশন। ওয়েস্ট বেঙ্গল তো উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ বা বম্বে প্রেসিডেন্সির মতো বিশাল স্টেট নয়। এত উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন দেওয়ার মতো জমি-জায়গা সেখানে কোথায়? আন্দামান হাতছাড়া হয়ে গেলে মহা সর্বনাশ।'

বিশ্বজিৎ উত্তর দিলেন না।

বিপ্লবী কাকা এবং আন্দামানের বড় অফিসার তাঁর ভাইপোর কথা নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছিল বিনয়। প্রচুর অর্থ ঢেলে অরণ্য নির্মূল করে যে জমি পাওয়া যাচ্ছে, উদ্বাস্তুরা না এলে তার একটা ব্যবস্থা যে করা হবে এমন জনরব কিছুদিন ধরে হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সেভাবে কান দেয়নি বিনয়। কিন্তু স্বয়ং চিফ কমিশনার আজ যখন মোপলাদের কথা বিশ্বজিৎকে বলেছেন, তাতে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে বিনয়। চিফ কমিশনার হলেন আন্দামান-নিকোবরের সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তি। তিনি যদি মনে করেন, ফাঁকা জায়গায় মোপলাদের বসাবেন, কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর প্রস্তাব উড়িয়ে দেবে না; যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে শুনবে।

শেখরনাথের চোখেমুখে উৎকণ্ঠা-ক্ষোভ-অসন্তোষ ফুটে উঠছিল। তিনি থামেননি। 'আমি তো দু-চারদিনের মধ্যে চিফ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। তাঁকে জারোয়াদের কথা তো বলবই, মোপলাদের প্রসঙ্গও তুলব। বলব, এখানকার তিনটে বড় দ্বীপ সাউথ, নর্থ আর মিডল আন্দামানে শুধু বাঙালি রিফিউজিদের রিহ্যাবিলেটেশনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই প্রোজেক্টে কিছুতেই অন্য কারুকে বসানো চলবে না। আন্দামানে আরও দু'শোরও বেশি দ্বীপ আছে। তার কয়েকটায় সুইট ওয়াটার পাওয়া যায়, জমিও ফার্টাইল। গভর্নমেন্ট ইচ্ছা করলে মোপলাদের সেসব জায়গায় নিয়ে বসাক।'

শুনতে শুনতে আঁতকে উঠলেন বিশ্বজিৎ। 'না না কাকা, চিফ কমিশনারকে মোপলাদের কথা একেবারেই বলবেন না। এ ব্যাপারে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। চিফ কমিশনার তাঁর মনোভাব জানিয়েছেন শুধু। যদি তাঁকে এসব বলতে যান ডেফিনিটলি ভাববেন আমিই আপনাকে এসব বলেছি। একজন সাব-অর্ডিনেট অফিসার হিসেবে এটা মারাত্মক বিশ্বাসভঙ্গ। এরপর হয়তো আমাকে কোনও গোপন মিটিংয়ে ডাকবেন না। উদ্বাস্তুদের জন্যে স্বাধীনভাবে যে কাজটুকু করতে পারছি তাও করতে দেবেন না; আমার ক্ষমতা ছেঁটে পেটোয়া অন্য কারুকে দায়িত্ব দিয়ে দেবেন। রিফিউজিদের সম্পর্কে তার কতটা সহানুভূতি থাকবে কে জানে। এই প্রোজেক্ট তো লোহালক্কড়, মেশিন-টেশিন নিয়ে নয়। এর 'র' মেটিরিয়াল হল উৎখাত হয়ে আসা, বিপন্ন মানুষ। জীবনে তাদের দাঁড় করিয়ে দিতে হলে ভালোবাসা, সহানুভূতি দরকার।'

বিশ্বজিতের কথাগুলো যুক্তিসংগত মনে হল শেখরনাথের। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, মোপলাদের কথা তুলব না।'

হঠাৎ বিনয় বলে উঠল, 'কাকা, আমার কিছু বলার আছে।'

শেখরনাথ তার দিকে ঘুরে বসলেন। —'বেশ তো। বল—'

'এখানকার সেটলমেন্টের ব্যাপারে অন্য দিকেও কিন্তু ভীষণ প্রবলেম রয়েছে।

'কীরকম?'

'কলকাতায় সরকার বিরোধী পার্টিগুলো উদ্বাস্তুদের নিয়ে আন্দোলন করতে রাস্তায় নেমেছে। রোজই সেখানে গোলমাল হচ্ছে। পুলিশের লাঠি, গুলি-টুলিও চলছে।'

'হ্যাঁ, জানি।' শেখরনাথ বললেন, 'মেনল্যান্ড থেকে কাগজগুলো আসে, তার মধ্যে তোমাদের 'নতুন ভারত'ও আছে, সেগুলোতে এসব খবর থাকে। আত্মঘাতী মুভমেন্ট। এই হঠকারী পলিটিকসের দাম কিন্তু একদিন দিতে হবে।'

এরপর কেউ আর কিছু বলল না। ড্রইংরুমের আবহাওয়া কেমন এক নৈরাশ্য এবং উৎকণ্ঠায় ভরে যেতে লাগল।

তিন

এখন অনেক রাত।

ভুবনরা ঘণ্টা দুয়েক আগে মোহনবাঁশির স্ত্রী-ছেলে-মেয়েকে খাইয়ে দিয়েছিল। তারা এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। বিনয়, শেখরনাথ এবং বিশ্বজিতেরও স্নান-খাওয়া হয়ে গেছে।

banglabooks.in

এই বাংলোয় উপসাগরের মুখোমুখি পরপর তিনটে বেডরুম। একেবারে পশ্চিম দিকের ঘরটায় সেদিন রাত কাটিয়ে গিয়েছিল বিনয়। আজও সেখানেই তার জন্য বিছানা করে দেওয়া হয়েছে। ওটা এই বাংলোর গেস্ট রুম। ঠিক হয়েছে বিনয় যখনই পোর্ট ব্লেয়ারে আসবে ওখানেই থাকবে। তার পাশের ঘরটা শেখরনাথের আর পুব দিকের শেষ ঘরটা বিশ্বজিতের।

বিনয় তার ঘরে চলে এসেছিল। দুই দেওয়ালে জোরালো আলো জ্বলছে। তেজি আলোয় ভরে আছে ঘরটা।

গোপালের কাজে খুঁত নেই। খাটের পাশে জগ ভর্তি জল এবং কাচের ঝকঝকে গেলাস রেখেছে। তাছাড়া এলাচ-লবঙ্গ ভর্তি একটা ছোট কৌটোও। এখন মশারি খাটিয়ে বিছানার চারপাশে পরিপাটি করে গুঁজে দিচ্ছে।

শিয়রের দিকে খোলা জোড়া জানলা। তার পাশে পড়াশোনার জন্য ছোট টেবিল এবং চেয়ার। বিনয় চেয়ারে বসে তড়িৎ গতিতে গোপালের হাত চালানো দেখছিল। সেই সকালের দিকে জেফ্রি পয়েন্ট থেকে মোহনবাঁশিকে ট্রাকে চাপিয়ে তারা চলে এসেছে। সারাদিন শরীরের ওপর প্রচণ্ড ধকল গেছে। স্নানের পর পেটে ভাত পড়তেই অসীম ক্লান্তিতে দু'চোখ জুড়ে আসছিল। গোপাল তার কাজ শেষ করা মাত্র সে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়বে।

বিশ্বজিৎ ঘরে এসে ঢুকলেন। তাঁর হাতে পুরু ব্রাউন কাগজের একটা প্যাকেট। একটু অবাক হয়েই উঠে দাঁড়াল বিনয়। খানিক আগেই খাওয়াদাওয়া চুকিয়ে তিনি শুতে চলে গিয়েছিলেন। হঠাৎ কী এমন হল যে এ সময় তাঁকে আসতে হয়েছে!

বিশ্বজিৎ বললেন, 'নানা কথায় একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। কলকাতা থেকে কাল আপনার কয়েকটা চিঠি এসেছে। এর ভেতর সব রেখে দিয়েছি। ভেবেছিলাম জেফ্রি পয়েন্টে পাঠিয়ে দেব। ভালোই হল আপনি পোর্টব্লেয়ারে চলে এসেছেন। এই নিন।' প্যাকেটটা বিনয়ের হাতে দিলেন।

গোপালের মশারি গোঁজা হয়ে গিয়েছিল। সে চলে গেল। বিশ্বজিৎ কিন্তু গেলেন না। ঘরে বাড়তি একটা চেয়ার রয়েছে সেটা টেনে এনে বসতে বসতে বললেন, কী হল, দাঁড়িয়ে কেন? বসুন। আপনার সঙ্গে জরুরি একটা কথা আছে। আর্জিও বলতে পারেন।'

বিনয়ের বিস্ময় বাড়ছিলই। এতক্ষণ ড্রইংরুমে বসে কত আলোচনা হয়েছে। একসঙ্গে ডাইনিং টেবিলে বসে তারা খেয়েছে। তখনও কিছু কথাবার্তা যে হয়নি তা নয়। তারপরও বিশ্বজিতের কী এমন কথা থাকতে পারে, সে ভেবে পেল না। তাছাড়া আর্জি শব্দ কেমন ধন্দের মতো মনে হচ্ছে। ধীরে ধীরে বসে পড়ল বিনয়। কোনও প্রশ্ন করল না।

বিশ্বজিৎ বললেন, 'মোহনবাঁশি কর্মকারের ব্যাপারটা খুবই আনফরচুনেট ঘটনা। আপনি নিজে তার প্রত্যক্ষদর্শী। আমার বিশেষ অনুরোধ এই নিয়ে কোনও রিপোর্ট কলকাতায় পাঠাবেন না।'

বিনয় চমকে উঠল। — 'এ কী বলছেন! আমি একজন সাংবাদিক। এখানে যা ঘটছে, নিজের চোখে যা যা দেখছি তা লেখার জন্যেই তো আমাকে আন্দামানে পাঠানো হয়েছে। সঠিক তথ্য পাঠকের কাছে তুলে না ধরাটা তো অন্যায়। ডিসঅনেস্টি।'

বিশ্বজিৎ প্রায় অনুনয়ের সুরে বললেন, 'আপনি যা বললেন তা হাঙ্ড্রেড পারসেন্ট ট্রু। কিন্তু বেঙ্গল, বিশেষ করে উদ্বাস্তুদের স্বার্থে দয়া করে এই ইনসিডেন্টটার কথা লিখবেন না।' তিনি বোঝাতে লাগলেন, কলকাতায় উদ্বাস্তুদের নিয়ে মারমুখি আন্দোলন চলছে, এই রিপোর্টটা বেরুলে পার্টিগুলো মারাত্মক একটা অস্ত্র হাতে পেয়ে যাবে।' রিফিউজিরাও ভীষণ ভয় পাবে। আন্দামানের জাহাজে তাদের তোলা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এদিকে জঙ্গলের ফাঁকা জমিগুলোতে মোপলাদের বসানোর ভাবনাচিন্তা চলছে। সেটা বিপজ্জনক ব্যাপার।

কত ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন এই দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। পুরোদমে বিশাল কর্মকাণ্ড চলছে। উদ্বাস্তুরা না তাদের নতুন করে বাঁচার সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করে ফেলে। একটা ঘটনা— যদিও সেটা খুবই মর্মান্তিক— গোপন করলে যদি হাজার হাজার মানুষের কল্যাণ হয় সেটা বিরাট ব্যাপার। আন্দামান নামে এই জিয়নকাঠিটি কখনওই ছাড়া ঠিক হবে না।

বিশ্বজিৎ আরও বললেন, জেফ্রি পয়েন্টে জারোয়ারা আর যাতে হামলা চালাতে না পারে সে জন্য সিকিউরিটি বন্দোবস্ত আরও জোরদার করা হবে। তাছাড়া আরও কিছু কিছু ব্যবস্থার কথাও ভাবা হবে।

শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে পড়েছিল বিনয়। বিশ্বজিৎকে যত দেখছে তার শ্রদ্ধা যেন ততই বেড়ে যাচ্ছে। এই মানুষটির লেশ মাত্র স্বার্থ নেই। তিনি অজস্র টাকা মাইনে পান, প্রচুর পার্কস, সেই সঙ্গে বিপুল ক্ষমতা। রিফিউজিরা যদি না আসে, ফাঁকা জমিতে যদি মোপলাদের বসিয়ে দেওয়া হয় তাতে তাঁর এতটুকু ক্ষতি হবে না। বরং যেভাবে পুনর্বাসনের কাজে জঙ্গলে জঙ্গলে ছোটাছুটি করেন, যেভাবে দিন রাত পরিশ্রম করেন তার কিছুই করতে হবে না। গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ফুরফুরে হালকা মেজাজে তিনি বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে পারবেন। অথচ উদ্বাস্তুদের জন্য তাঁর কী অফুরান মমতা, তার জন্য তিনি কত ভাবেন। নিঃস্বার্থ এই মানুষটি বহুজন হিতে নিজের সমস্ত অস্তিত্ব সঁপে দিয়েছেন।

বিনয় কয়েক লহমা তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর গাঢ় গলায় বলল, 'ঠিক আছে, মোহনবাঁশির কথা লিখব না।'

বিশ্বজিৎ উঠে পড়লেন। কৃতজ্ঞ সুরে বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ। আমি চলি। আপনি শুয়ে পড়ুন।'

তিনি চলে যাবার পরও বসে রইল বিনয়। এখন চারিদিক নিঝুম। শুধু সিসোস্ট্রেস বে'র ঢেউগুলো অবিরল ঝাঁপিয়ে পড়ছে পাড়ের পাথরের চাঁইগুলোর ওপর। দূর সমুদ্র থেকে ঝোড়ো হাওয়া উঠে এসে পোর্টব্লেয়ারের সবগুলো বিশাল বিশাল গাছের ঝুঁটি ধরে ঝাঁকিয়ে চলেছে। ঢেউ আর বাতাসের আওয়াজ ছাড়া কোথাও অন্য কোনও শব্দ নেই।

এক সময় উঠে পড়তে যাচ্ছিল বিনয়। তখনই খেয়াল হল হাতের ভেতর চিঠির প্যাকেটটা ধরা রয়েছে। না, এখন আর শোওয়া হবে না। প্যাকেটটা টেবিলে রেখে চিঠিগুলো বার করল সে। গুনে দেখল মোট চারটে সবই খামের চিঠি।

প্রথম খামটা খুলতেই 'নতুন ভারত'-এর চিফ রিপোর্টার প্রসাদ লাহিড়ির চিঠি বেরিয়ে পড়ল। তাঁর চিঠিতে ফেনানো ব্যাপার থাকে না। কাজের কথাগুলো গুছিয়ে সংক্ষেপে লিখে পাঠান।

প্রসাদদা আগের চিঠির মতোই এবারও লিখেছেন বিনয়ের রিপোর্টগুলো পাঠকদের মধ্যে তুমুল সাড়া জাগিয়েছে। তবে লেখার সঙ্গে আন্দামানের রিফিউজি সেটলমেন্ট, সেখানকার মানুষজন, এবং অন্যান্য বাসিন্দা, বিশেষ করে পেনাল কলোনির লোকজন, সেলুলার জেল, 'রস' আইল্যান্ড ইত্যাদি এলাকায় যারা থাকে তাদের ফোটো থাকাটা ভীষণ জরুরি। তাছাড়া আন্দামানের আদিম জনজাতি জারোয়া, ওঙ্গে এবং গ্রেট আন্দামানিজদের ছবি যেভাবে হোক জোগাড় করে পাঠাতে হবে। মনে রাখা দরকার খবরের কাগজে চার কলম একটা প্রতিবেদনের চাইতে প্রাসঙ্গিক একটা ভালো ফোটো পাঠকের কাছে বিরাট ছাপ রাখে। রিপোর্টের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং গুরুত্ব অনেক বাড়িয়ে দেয়। আপাতত আন্দামান থেকেই একটা ক্যামেরা জোগাড় করে কাজ চালিয়ে নিক। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অফিস থেকে ক্যামেরা পাঠানো হচ্ছে।

প্রসাদদা লিখেছেন, আগের চিঠিতে তিনি যা জানিয়েছিলেন,

banglabooks.in

কলকাতার অবস্থা এখন তার চেয়ে অনেক বেশি অগ্নিগর্ভ। হাজরা পার্ক, শ্রদ্ধানন্দ পার্ক, দেশবন্ধু বা দেশপ্রিয় পার্ক— সর্বত্র রোজ উদ্বাস্তুদের নিয়ে মিটিং চলছে। তার ওপর রয়েছে মিছিল। মহানগরের উত্তর বা দক্ষিণ কিংবা পুব, যেদিকেই যাওয়া যাক বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মিছিল শুরু হয়ে যায়। মিছিলে মিছিলে যান চলাচল ঘণ্টার পর ঘণ্টা থমকে যায়। শহরের নাভিশ্বাস উঠতে থাকে।

এদিকে জবরদখল কলোনিগুলো থেকে উদ্বাস্তুদের তুলে দেবার জন্য জমি মালিকদের চাপে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উচ্ছেদ বিল আনতে চলেছে। বিরোধী দলগুলো কিছুতেই বিল পাশ করতে দেবে না। ফলে বিরাট সংঘাত অনিবার্য।

সীমান্তের ওপার থেকে উদ্বাস্তুরা যেমন আসছিল তেমনই আসছে। যে সব ছিন্নমূল মানুষ পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসামে গিয়েছিল উৎখাত হয়ে তারাও আসছে। তাদের আসাটা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।

শুধু উদ্বাস্তুদের নিয়ে আন্দোলনই নয়, ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্টও দ্রুত বিরাট আকার নিচ্ছে। কলকাতার চারপাশে যত কলকারখানা, বিশেষ করে জুট মিল আর ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিটগুলোর কোনও না কোনওটায় রোজই প্রায় ডাকা হচ্ছে স্ট্রাইক, মালিকপক্ষ ঝুলিয়ে দিচ্ছে লক-আউটের নোটিস। উদ্বাস্তুদের মতো কারখানার শ্রমিকদেরও নিয়ে বেরুচ্ছে মিছিল। জওহরলাল নেহরু বলেছেন, কলকাতা এখন মিছিল নগরী— সিটি অব প্রশেসনস।

কলকাতার পরিস্থিতি জানানো হল। বিনয় যেন যত শিগগির পারে চার পাঁচটা প্রতিবেদন একসঙ্গে পাঠিয়ে দেয়।

প্রসাদদার আগের চিঠির বয়ান প্রায় একইরকম ছিল। তবে উদ্বাস্তুদের আন্দোলনটা আরও ঘোরালো হয়েছে। সেই সঙ্গে নতুন যোগ হয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট।

অন্যমনস্কর মতো চিঠিটা ভাঁজ করে খামে পুরতে পুরতে বিনয় আন্দাজ করতে চেষ্টা করল কলকাতা যেন একটা আগ্নেয়গিরির মাথায় বসে আছে।

এবার দু'নম্বর চিঠি। সেটা সুনীতির। মাত্র কয়েকটা লাইন। তার মধ্যে নিজের যাবতীয় ক্ষোভ এবং অভিমান ঢেলে দিয়েছে। কারণও আছে। আন্দামানে আসার পর অনেককেই চিঠি লিখেছে, বিনয়। আনন্দকে লিখেছে বলে সুনীতিকে লেখার কথা ভাবেনি।

সুনীতি লিখেছে অতি অবশ্য বিনয় যেন তার চিঠির জবাব দেয়। বিনয়ের জন্যে সারাক্ষণ সে চিন্তায় থাকে। অথচ তার কথা ভাইয়ের মনে পড়ে না। এরপর লিখেছে— হেমনলিনী, আনন্দ, তার দেওর এবং জা দীপক আর মাধুরী সবাই ভালো আছে। পারিবারিক নানা ব্যস্ততার কারণে সুধাদের বাড়ি এর মধ্যে যাওয়া হয়নি। তবে সামনের রবিবারের পরের রবিবার সে আর আনন্দ অবশ্যই যাবে। সারাটা দিন তাদের সঙ্গে কাটিয়ে আসবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনেকের কথাই লিখেছে সুনীতি কিন্তু ঝুমা সম্পর্কে একেবারেই নীরব। ঝুমা নামে কোনও তরুণীকে সে চেনে বলেই মনে হয় না।

চিঠিটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে বিনয়। আটশো মাইল দূরে বসে ঝুমা সম্পর্কে তার নতুন মনোভাবটা কি আঁচ করে ফেলেছে সুনীতিরা? বোঝা গেল না।

এক সময় তিন নম্বর খামটা খুলল বিনয়। সুধার চিঠি। খুদি খুদি অক্ষরে পাকা তিনটি পাতা বোঝাই। এর কমে সে চিঠি লিখতে পারে না।

বিনয় যে তার আগের চিঠির জবাব দিয়েছিল সেটা পেয়ে সুধা ভীষণ খুশি। তার আবদার, বিনয়ের যত কাজই থাক, সে যেন অবশ্যই, অবশ্যই সময় করে নিয়মিত তাকে চিঠি লেখে। সে তাদের একমাত্র ভাই। কলকাতায় তাদের নতুন বাড়িতে না থাকায় কত দুঃখ যে পেয়েছিল সুধা। এই কষ্ট তার ইহ জীবনে ঘুচবে না।

বিনয় উঠল গিয়ে কিনা একটা নোংরা বারোয়ারি মেসে। সেখানে রাজ্যের মানুষ, সারাক্ষণ হইচই, হট্টগোল। এই সব জায়গায় খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কোনওভাবেই মনের মতো হতে পারে না। আধো-অন্ধকার চাটাইয়ের ময়লা আসনে বসে কী যে খায় বিনয়! তবু একটু সান্ত্বনা, ইচ্ছা করলে যখন তখন 'শান্তিনিবাস' মেসে গিয়ে তাকে দেখে আসা যায়। বিনয়ও আসতে পারে তাদের কাছে। ট্রামে বা বাসে বড়জোর মিনিট কুড়ি পঁচিশেকের ব্যাপার। কিন্তু কালাপানি পাড়ি দিয়ে আন্দামানের কোন ভয়ংকর বিজন অরণ্যে গিয়ে বসে আছে বিনয়। আতঙ্কে সারাক্ষণ সুধার বুক কাঁপে।

সুধার আরও একটা দুর্ভাবনার কারণ হেমনাথ। তিনিও রয়েছেন ধরাছোঁয়ার বাইরে— বহুদূরে। অন্য কোনও গ্রহে। নিত্য দাস-এর মধ্যে তাদের বাড়ি আসেনি, দাদুর খবরও পাওয়া যাচ্ছে না। কাগজে রোজই খবর থাকে পূর্ব পাকিস্তানের হাল ক্রমশ আরও খারাপ হচ্ছে। হেমনাথের জন্য ভীষণ অস্থির হয়ে আছে সুধা।

সে আরও জানিয়েছে, এর মধ্যে তার দাদাশ্বশুর দ্বারিক দত্তকে নিয়ে কম ভোগান্তি যায়নি। হঠাৎই শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। এই বয়সে টাইফয়েড। স্পেশালিস্ট ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল। রাত জেগে হিরণ, সুধা আর উমাকে শুশ্রূষা করতে হয়েছে। প্রাণের আশা প্রায় ছিলই না। নেহাত আয়ুর জোরে দ্বারিক দত্ত এ যাত্রা সামলে উঠেছেন। একটা মারাত্মক ফাঁড়া কেটে যাওয়ায় আপাতত স্বস্তি। সুধার জেঠিশাশুড়ি সরস্বতী— যিনি বারো মাস কোনও না কোনও রোগে ভোগেন— ঈশ্বরের করুণায় ভালো আছেন।

এবার যুগলের কথা। সে এখন মুকুন্দপুর কলোনিরই নয়, ওই অঞ্চলের বেশ কয়েকটা জবরদখল কলোনিরও ছোটখাট নেতা। বিরোধী পার্টিগুলোর ডাকে উদ্বাস্তুদের নিয়ে এসে সে কলকাতায় মিছিল করে। ক্রমশ সে রাজনীতির মধ্যে ঢুকে পড়ছে। কলকাতায় এলে সে সুধাদের বাড়ি আসবেই। যুগল জানায় একবার তারা উদ্বাস্তু হয়ে এ দেশে এসেছে। সরকার যদি জোর করে উচ্ছেদ আইন পাশ করায়ও, জান গেলেও তারা কলোনির দখল ছাড়বে না। কোনওভাবেই দ্বিতীয়বার তারা বাস্তুহারা হবে না।

এসবের মধ্যে একটা সুখবরও দিয়েছে সুধা। অফিসে হিরণের একটা ভালো প্রোমোশনও হয়েছে। মাইনে বেড়ে গেছে অনেকটাই।

সবশেষে একটা কথা জানতে চেয়েছে সুধা। বিনয় তার প্রথম চিঠিতে লিখেছিল আন্দামানে আসার পর তার জীবনে একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। সেটা এমনই যা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। ঘটনাটা কী, তা জানায়নি। শুধু লিখেছিল কলকাতায় ফিরে সে সবাইকে হতবাক করে দেবে।

সুধা লিখেছে, কবে বিনয় ফিরবে সে জন্য ধৈর্য ধরে বসে থাকতে পারবে না। হেঁয়ালি না করে বিনয় যেন সব খুলে বিশদভাবে জানায়। তাদের বাড়ির সবাই সে জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

পড়া শেষ করল বিনয়। তার চিঠিতে ঝিনুক সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছিল সে। কিন্তু না, ঝিনুকের কথা এখন কিছুতেই সুধাকে জানানো যাবে না।

বিনয় ভেবেছিল, ঝিনুককে কলকাতায় নিয়ে গেলে একটা চমক লাগানো যাবে। কিন্তু আজ সেলুলার জেলের সামনের ঢালু রাস্তায় ঝিনুক তার সঙ্গে যেভাবে কথা বলেছে, যে ধরনের আচরণ করেছে, চিনেও না-চেনার ভান করেছে তাতে দমে

banglabooks.in

গিয়েছিল সে। তার বিশ্বাস ছিল, একবার তারা মুখোমুখি দাঁড়ালে ঝিনুকের সব অভিমান, সব দুঃখ ঘুচে যাবে। সেই কোন কিশোর বয়স থেকে এই মেয়েটির সঙ্গে পাশাপাশি বড় হতে হতে তার ওপর বিপুল অধিকার জন্মে গিয়েছিল। অন্তত তেমনটাই তার ধারণা। কিন্তু এতকালের সম্পর্কটা আজ একরকম অস্বীকারই করেছে ঝিনুক।

মনে মনে একটা ধাক্কা খেলেও বিনয় কিন্তু আশা ছাড়েনি। তার সংকল্প আরও দৃঢ় হয়েছে। 'রস' আইল্যান্ডে ঝিনুককে দেখার পর থেকেই সে স্থির করে রেখেছে মধ্য আন্দামানে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবে। জেফ্রি পয়েন্টে বর্মী— শেল কালেক্টর লা পোয়ের সঙ্গে তার কথাও হয়ে গেছে। বিনয় তাদের মোটরবোট 'সি-গাল'-এ চেপে মিডল আন্দামানে চলে যাবে। লা পোয়ে সেখানকার সবকটা রিফিউজি সেটলমেন্ট চেনে। একবার পৌঁছুতে পারলে লা পোয়ে ঠিক খুঁজে খুঁজে ঝিনুককে বার করে ফেলবে। বিনয় বলবে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে একবারও তার কথা মনে পড়ল না ঝিনুকের? আত্মীয়-পরিজন, বিশেষ করে অবনীমোহন তার সঙ্গে যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছেন তার জন্য বিনয় কি দায়ী? সে যে কত কষ্ট পেয়েছে তা কি একবারও ভাবল না ঝিনুক?

ঝিনুককে বোঝাবে ঠিকই কিন্তু ঝিনুক কি শেষ পর্যন্ত কলকাতায় যেতে আদৌ রাজি হবে? যে বিশ্বাসের জোরে বিনয় তাকে নিয়ে যাবার কথা ভেবেছে তার ভিতটা যেন অনেকখানি ধসে পড়েছে। অদ্ভুত এক সংশয়ে তার বুকের ভেতরটা ভারী হয়ে যেতে থাকে।

এর মধ্যেই চার নম্বর অর্থাৎ শেষ খামটা হাতে তুলে নিতেই বিনয়ের সারা শরীরে শিহরন খেলে গেল। শিহরন না বলে বিদ্যুৎপ্রবাহ বলা যেতে পারে। খামের ওপর গোটা গোটা অক্ষরে তার নাম লেখা। হাতের লেখাটা তার চেনা— ঝুমা।

এর আগেও ঝুমা চিঠি লিখেছে। কিন্তু 'রস' আইল্যান্ডে ঝিনুককে দেখার পর সে চিঠির উত্তর দেয়নি বিনয়।

আশ্চর্য, আজও ঝিনুকের সঙ্গে সেলুলার জেলের সামনে দেখা হয়েছে। আর আজই কিনা ঝুমারও চিঠি এল। এই দুই নারী অদৃশ্য কোনও সুতোয় তার জীবনে বাঁধা রয়েছে। অন্ততকাল ধরে। সেই গিঁট যেন ছেঁড়া যায় না। কখনও ঝিনুক সামনে এসে দাঁড়ায়, কখনও ঝুমা। আচ্ছন্নের মতো, খানিকটা নিজের অজান্তেই যেন খাম খুলে চিঠিটা বার করল বিনয়। খুব ছোট্ট চিঠি। সামান্য কয়েকটি লাইন।

'একটা মেয়ে প্রাণভরে তোমাকে ভালোবেসেছে। সে সারাদিন তোমার চিঠির আশায় অপেক্ষা করে থাকে। এই মহানগরে কত মানুষ তোমার চিঠি পায়। শুধু সেই মেয়েটা বাদ। তার অপরাধ কী?'

লাইনগুলোর মাথায় কোনও সম্বোধন নেই, নিচে কারুর নামও না।

ঝুমার অভিমান, ঝুমার মানসিক যাতনা এর মধ্যেই তীব্র ব্যাকুলতা নিয়ে ফুটে উঠেছে। ক'দিন আগেই এই মেয়েটাকে নিজের জীবন থেকে খারিজ করে দেবার কথা ভেবেছিল বিনয়। কিন্তু ঝিনুকের মতো সেও যেন শতপাকে তাকে জড়িয়ে রেখেছে। সরিয়ে দিতে গেলেও বুঝি বা তাকে সরানো যায় না। ঝিনুক আর ঝুমা, এই দুই নারী যেন তার অনিবার্য নিয়তি।

চিঠিটা ফের খামের ভেতর পুরে উঠে পড়ল বিনয়। সোজা গিয়ে দাঁড়াল খোলা জানলার পাশে।

সেই সন্ধে থেকে কুয়াশা পড়তে শুরু করেছিল। এখন তা অনেক গাঢ় হয়েছে। কুয়াশার স্তর ভেদ করে ক্ষীণ চাঁদের যে আলোটুকু চুঁইয়ে চুঁইয়ে নেমে আসছে তাতে চরাচরের কোনও কিছুই স্পষ্ট নয়। দূরের দ্বীপগুলো একেবারে ঝাপসা। মাউন্ট হ্যারিয়েটের যে সাদা ক্রসটা আকাশের দিকে মাথা তুলে থাকে সেটাও দেখা যাচ্ছে না। শুধু আগের মতোই ঢেউ ভেঙে পড়ার শব্দ আর তুমুল ঝোড়ো হাওয়া। বিনয় টের পেল তার বুকের ভেতর তেমনই কিছু চলছে। অবিরল।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে। বিমূঢ়। বুদ্ধিভ্রষ্ট। তারপর কখন এসে শুয়ে পড়ল নিজেরই খেয়াল নেই।

পরদিন কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল বিনয়ের। এক টানা নয়, থেমে থেমে আর্ত, করুণ সুরে কেউ কেঁদে চলেছে।

চার

চোখে ঘুমের ঘোর লেগে আছে। বিনয় প্রথমটা বুঝতে পারল না কান্নার আওয়াজটা কোত্থেকে আসছে। ধড়মড় করে উঠে বসল সে। একটু খেয়াল করতেই সবটা স্পষ্ট হয়ে এল। এই বাংলোতেই কেউ কাঁদছে। কোনও বয়স্ক মেয়েমানুষ।

কাল রাতে সেলুলার জেলের হাসপাতাল থেকে মোহনবাঁশির স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসা হয়েছিল। নিশ্চয়ই তার স্ত্রীর কান্না। এই সকালবেলায় কী এমন ঘটতে পারে যে সে কেঁদে চলেছে।

বিছানা থেকে বাইরে নেমে এল বিনয়। ভেতর দিকের দরজা খোলা রয়েছে। সেটা পেরিয়ে বিশাল ড্রইং-কাম-ডাইনিং হল-এ আসতেই দেখা গেল মেঝের একধারে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কেঁদে চলেছে মোহনবাঁশির বউ। তার গায়ের সঙ্গে লেপটে আছে ছেলে-মেয়েরা। তারা অবশ্য কাঁদছে না। কেমন যেন জড়সড়, ভয়াতুর।

ওদিকে বিশ্বজিৎ এবং শেখরনাথও তাঁদের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। ভুবন কার্তিক আর গোপালকেও দেখা যাচ্ছে।

বিনয় বিশ্বজিতের কাছে চলে এল। কৌতূহলের চেয়ে উৎকণ্ঠাই হচ্ছে তার বেশি। নিচু গলায় জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে, মহিলা এত কাঁদছে কেন? হাসপাতাল থেকে কোনও খারাপ খবর এসেছে?'

বিশ্বজিৎ মাথা নাড়লেন। –'না তো'—

'তাহলে?'

'কী জানি—'

বিশ্বজিতের কথা শেষ হওয়ার আগেই শেখরনাথ মোহনবাঁশির স্ত্রীর কাছে চলে গেলেন। জানতে চাইলেন। —'কী হল তোমার? কেঁদো না, কেঁদো না।'

কাঁপা কাঁপা হাতে মুখ থেকে শাড়ির আঁচল সরাল মোহনবাঁশির বউ। চোখ দুটো ফোলা ফোলা, লাল, জলে ভর্তি। বোঝা যায় অনেকক্ষণ কাঁদছে সে।

শেখরনাথ জিগ্যেস করলেন, 'কান্নার কী হল?'

ধরা ধরা, ভারী গলায় মোহনবাঁশির বউ বলল, 'আমার মনে জবর কু-ডাক ডাকতে আছে। সারা রাইত কাইল ঘুম হয় নাই। হ্যায় (সেটা) কি অহনও বাইচা রইছে?'

'তেমন কিছু হলে হাসপাতাল থেকে লোক চলে আসত। চিন্তা কোরো না।' নরম, সহানুভূতির সুরে বললেন শেখরনাথ।

ব্যাকুলভাবে মোহনবাঁশির বউ বলল, 'আমাগো হাসপাতলে লইয়া চলেন—'

'কিছুক্ষণ পরেই যাব। তোমরা চানটান করে খেয়ে নাও। আজ সারাদিন হাসপাতালেই থাকতে হবে।'

ঘণ্টাখানেক বাদে মোহনবাঁশির বউছেলেমেয়ে এবং বিনয়কে নিয়ে একটা গাড়িতে বেরিয়ে পড়লেন শেখরনাথ। বিশ্বজিতের পক্ষে এবেলা যাওয়া সম্ভব নয়। পুনর্বাসন দপ্তরের অনেকটা দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। তা ছাড়া তিনি একজন ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটও। তাঁর কোর্টে নানা রকম মামলা লেগেই থাকে। আজ একটা জটিল কেসের শুনানি আছে। সেসব ঝক্কি সামলাতে

banglabooks.in

সামলাতে তিনটে বেজে যাবে। তারপর আদালত থেকে সোজা হাসপাতালে যাবেন।

সাড়ে ন'টার মতো বাজে। দিনটা বেশ ঝলমলে। ভোরের দিকে যে কুয়াশা পড়েছিল তা কেটে গিয়ে উজ্জ্বল রোদে ভেসে যাচ্ছে শহর পোর্টব্লেয়ার। রোদটা খুব একটা তেজি নয়, বেশ আরামদায়ক। কোথাও ছিটেফোঁটা মেঘও নেই। পরিষ্কার, ঝকঝকে নীলাকাশ। উপকূলের কিনার ঘেঁষে অজস্র পাখি উড়ছে। সবই সি-গাল।

কোনও দিকে লক্ষ ছিল না বিনয়ের। চড়াই-উতরাই ভেঙে যতই গাড়িটা হাসপাতালের দিকে এগচ্ছে ততই উৎকণ্ঠার মাত্রাটা বেড়েই চলেছে। নিকোবর থেকে সেই দুই ডাক্তার কি ফিরে আসতে পেরেছেন? চিফ মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তার চট্টরাজ কাল জানিয়েছিলেন, ওঁরা না এলে মোহনবাঁশির অপারেশন করাটা খুবই কঠিন হয়ে উঠবে। হয়তো করা সম্ভবই হবে না। তখন কী হবে?

গাড়িটা সেলুলার জেলের প্রকাণ্ড গেট পার হয়ে সোজা হাসপাতালের সামনে এসে দাঁড়াল।

দোতলায় উঠতেই দেখা গেল, এর মধ্যেই বেশ ভিড় জমেছে। নতুন রোগী তো আছেই, পুরানো রোগীদের সঙ্গে দেখা করতে তাদের বাড়ির লোকজনও হাজির।

লম্বা প্যাসেজে ভিজিটরদের জন্য যে সারি সারি বেঞ্চ পাতা রয়েছে সেখানে মোহনবাঁশির বউছেলেমেয়েদের বসিয়ে বিনয়কে সঙ্গে করে ডাক্তার চট্টরাজের চেম্বারে চলে এলেন শেখরনাথ।

ডাক্তার চট্টরাজ একাই রয়েছেন। কোনও পেশেন্টের এক্স-রে প্লেট খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন। শেখরনাথদের বসার জন্য হাতের ইশারা করলেন।

প্লেটটা দেখা হলে সেটা টেবিলের একধারে নামিয়ে রেখে গম্ভীর মুখে বললেন, 'ভীষণ মুশকিল হয়ে গেল কাকা।' তাঁকে বেশ চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে।

শেখরনাথ সামনের দিকে একটু ঝুঁকে জিগ্যেস করলেন, 'কী ব্যাপার, নিকোবর থেকে তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনরা কি এখনও আসেনি?'

আস্তে মাথা নাড়লেন ডক্টর চট্টরাজ।

শেখরনাথের দুই চোখে উদ্বেগ ফুটে বেরয়। জিগ্যেস করলেন, 'মোহনবাঁশির কন্ডিশন আজ কেমন?' আরও ডেটারিওরেট করেছে?'

ডাক্তার চট্টরাজ বললেন, 'মনে হয় না। তবে রাত্তিরে অনেক চেষ্টা করেও জ্ঞান ফেরানো যায়নি। আসলে ফুসফুস থেকে তিরটা বার করা দরকার। ওটা বেশিক্ষণ বিঁধে থাকলে বিপদ হবে।'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর ডাক্তার চট্টরাজই ফের শুরু করলেন, 'ইন্টার-আইল্যান্ড শিপ সারভিসের যে জাহাজটা দ্বীপে দ্বীপে ঘুরে বেড়ায় এখন সেটা নিকোবরে যাবার কথা নয়। ক'দিন আগে সুকুমার আর তাপস ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের জাহাজে গিয়েছিল। আজ সকালে সেই জাহাজেই তাদের ফেরার কথা।' ঘড়ি দেখে বললেন, 'দশটা বেজে গেল! কেন জাহাজটা আসছে না, বুঝতে পারছি না।'

যে বিপ্লবী একদিন অসীম দুঃসাহসে বন্দুক-রিভলবার হাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছিলেন, তাঁর কাছে জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে লেশমাত্র প্রভেদ ছিল না, একজন তুচ্ছ উদ্বাস্তুর জন্য তাঁকে এই মুহূর্তে ভীষণ বিচলিত দেখাচ্ছে। বললেন 'ধরা যাক, ওদের আসতে আরও দেরি হল, তখন—' একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, না করে থেমে গেলেন।

ডাক্তার চট্টরাজ আগে থেকেই খুব সম্ভব সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলেন। তখুনি উত্তর দিলেন, 'আর-এক ঘণ্টা দেখব। তারপর আমি একাই অপারেশনটা করব। হয়তো একটু রিস্ক নেওয়া হবে কিন্তু কিছু করার নেই।'

বিনয় চুপচাপ বসে দু'জনের কথা শুনছিল। লক্ষ করেছে কথার ফাঁকে ফাঁকে ডান পাশের জোড়া জানলার বাইরে বারবার তাকাচ্ছেন। দূরে, উতরাইয়ের নিচের দিকে সিসোস্ট্রেস বে'র এপারে একটা ছোট জেটি রয়েছে। একদিন এই জেটিতে নেমেই 'রস' আইল্যান্ড থেকে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে মোটর বোট থেকে ওখানে এসেই নেমেছিল সে। বনবিভাগের জাহাজ ওখানে এসে ভেড়ার কথা। কিন্তু না, জেটিটা একেবারে শুনশান। তিনটে লোক জেটির ওপর বসে বসে হাতপাখা নেড়ে গল্প করছে। খুব সম্ভব ওরা জাহাজ দপ্তরের খালাসি জাতীয় কর্মী। অলস সময়টা তারা এই ভাবেই খোশমেজাজে উড়িয়ে দিচ্ছে।

এগারোটা বাজতে যখন মিনিট কুড়ি বাকি, সেই সময় একজন সিনিয়র ওটি নার্সকে ডাকিয়ে আনলেন ডাক্তার চট্টরাজ। কিছু বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, সেই সময় দুই যুবক প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে দৌড়াতে চেম্বারে এসে ঢুকল। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এসেছে, তাই একটু হাঁপাচ্ছিল।

ডাক্তার চট্টরাজের কপাল কুঁচকে গেল। – 'কী ব্যাপার, তোমাদের এত দেরি হল? খবর পাঠালাম একটা ক্রিটিকাল কেস এসেছে। ইমিডিয়েট অপারেশন করতে হবে। একটু দায়িত্ববোধ থাকা উচিত।'

বিনয় আন্দাজ করে নিল, এই দু'জন ডাক্তার চট্টরাজের সহকারী। কাঁচমাচু মুখে তারা জানাল, বনবিভাগের জাহাজ ঠিক সময়েই নিকোবর থেকে রওনা হয়েছিল। কিন্তু সিসোস্ট্রেস বে'র জেটিতে না ভিড়ে অনেকটা ঘুরে চ্যাথাম জেটিতে চলে যায়। তারা বারবার বলেছিল, তাদের যেন সিসেস্ট্রেস বে'তে নামিয়ে দেয়। কিন্তু জাহাজে কনজারভেটর অব ফরেস্টস ব্রজদুলাল মণ্ডল ছিলেন। নিকোবরে একটা জরুরি কাজে তাঁকে যেতে হয়েছিল। এদিকে আজই পোর্টব্লেয়ারে বেলা দশটায় তাঁদের একটা কনফারেন্স আছে। চ্যাথাম হয়ে গেলে ঠিক সময়ে তাঁর কনফারেন্সে পৌঁছাতে সুবিধা হয়। তাই সেসোস্ট্রেস বে'তে ওদের জাহাজ থামেনি। যাদের জাহাজ তাঁদের মর্জিমতো তো চলতে হবে।

ডাক্তার চট্টরাজ ওদের যুক্তিটা মেনে নিলেন। এ নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন না করে বললেন, 'অনেকটা পথ জাহাজে এসেছ কিন্তু এখন রেস্টের সময় নেই। ভেতরে গিয়ে তৈরি হয়ে নাও। পেশেন্টের নাম মোহনবাঁশি কর্মকার। তার ব্লাড, সুগার সব টেস্ট করা আছে। সিস্টার স্টেলার কাছে রিপোর্টগুলো আছে; দেখে নেবে। কেস হিস্ট্রিও লেখা আছে; পড়ে নিও। আমি এদিকের একটা কাজ সেরে আসছি।'

দুই জুনিয়র ডাক্তার চলে গেল। ডাক্তার চট্টরাজ বললেন, 'কাকা, অপারেশনের জন্যে মোহনবাঁশি কর্মকারের স্ত্রীর কনসেন্ট চাই। তাকে বন্ডে সই করতে হবে। লিখতে না জানলে তার টিপসই লাগবে।'

শেখরনাথ অবাক। বললেন, 'তার কনসেন্ট লাগবে কেন?'

'এটা মারাত্মক ধরনের ক্রিটিকাল কেস। অপারেশনটা খুব ঝুঁকির ব্যাপার। পেশেন্টের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ, এখানে স্ত্রী, তাকে বন্ডে সই বা টিপসই দিতে হয়। এটাই নিয়ম।' বলে একটু থামলেন ডাক্তার। তারপর ফের শুরু করলেন, 'মোহনবাঁশির স্ত্রী বন্ডে সই না করলে অপারেশন করা যাবে না।'

'তাহলে ব্যাপারটা ওকে বুঝিয়ে বলতে হবে।'

'হ্যাঁ।'

একটু চিন্তা করে শেখরনাথ জিগ্যেস করলেন, 'তুমি ঝুঁকির কথা বললে। আমি ডাক্তার নই, তবু সেটা আন্দাজ করতে পারছি। জানতে চাইছি অপারেশন করলে কী ধরনের সমস্যা

pathagar.net

banglabooks.in

হতে পারে?'

ডাক্তার চট্টরাজ বললেন, 'আমরা সব রকম প্রি-কশনারি ব্যবস্থা করেই অপারেশন করব। কিন্তু সবচেয়ে দুশ্চিন্তার বিষয় হল তিরটা যদি ফুসফুসের অনেকটা ভেতরে ঢুকে থাকে, আর সেটা খুলতে গিয়ে যদি রক্তপাত হয় অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম দেখা দেবে।

'সেটা কী?'

'প্রচণ্ড শ্বাসজনিত কষ্ট। এমনকী শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে।' ব্রিটিশ ভারতের প্রাক্তন বিপ্লবীটিকে বিচলিত দেখাল। তিনি বললেন, 'তার মানে তো মৃত্যু।'

অস্পষ্টভাবে ডাক্তার চট্টরাজ বললেন, 'হ্যাঁ।' তারপর গলার স্বরটা পরিষ্কার করে নিলেন। –'এই কথাগুলো পেশেন্টের স্ত্রীকে ভালো করে বোঝাতে হবে। তার রাজি হওয়া না-হওয়ার ওপর অপারেশন নির্ভর করছে।'

'তাকে বোঝাবে কে?'

'প্রাইমারি দায়িত্ব আমার। তবে আপনিও সঙ্গে থাকবেন। আন্দামানের সবাই আপনাকে শ্রদ্ধা করে, বিশ্বাস করে।' বলে ঘড়ি দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ডাক্তার চট্টরাজ।-'এগারোটা বেজে গেছে। আর দেরি করা যাবে না। মোহনবাঁশির স্ত্রীকে এখানে ডাকা দরকার। আমি লোক পাঠাচ্ছি।'

'না না, কারওকে পাঠাতে হবে না। আমি ওকে নিয়ে আসছি।' শেখরনাথ উঠে পড়লেন। একটু পরে মোহনবাঁশির বউকে সঙ্গে করে ফিরে এলেন। ছেলেমেয়েগুলো সঙ্গে এসেছিল। তারা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

শেখরনাথ জিগ্যেস করলেন, 'তোমার নাম কী?'

ডাক্তারের চেম্বারে তার ডাক পড়বে, ভাবতে পারেনি মেয়েমানুষটি। কেমন যেন হতচকিত সে। কোনওরকমে বলতে পারল, 'জোছ্ছনা—'

'জ্যোৎস্না?'

আস্তে মাথা নাড়ল শেখরনাথের বউ।

শেখরনাথ একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'বোসো—'

জ্যোৎস্না বসল না; শেখরনাথদের সামনে চেয়ারে বসতে তার সংকোচ হচ্ছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে জিগ্যেস করল, 'আমারে আনলেন ক্যান? মানুষটার কি কিছু হইচে? বাইচা আছে তো?'

'কিছু হয়নি। বেঁচে আছে। ডাক্তারবাবু তোমার সঙ্গে মোহনবাঁশির অপারেশনের ব্যাপারে কথা বলবেন। মন দিয়ে শোনো।'

টেবিলের একটা কোনা ধরে দাঁড়িয়ে রইল জ্যোৎস্না।

pathagar.n

banglabooks.in

অপারেশন সম্পর্কে খানিক আগে ডাক্তার চট্টরাজ শেখরনাথকে যা যা বলেছিলেন, সে সব জানিয়ে দিলেন জ্যোৎস্নাকে।

কিছুক্ষণ বিহ্বলের মতো তাকিয়ে রইল জ্যোৎস্না। তারপর শেখরনাথের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। সারা শরীর তার কাঁপছে। ভাঙা ভাঙা ভয়ার্ত সুরে সে বলল, 'কাটান ছিড়ান (কাটাছেঁড়া অর্থাৎ অপারেশন) কইরাও যদিন হেরে (তাকে) বাচান না যায়, হেইটা (সেটা) কইরা কী অইব বাবা?' শেখরনাথকে সে বাবা বলল।

বলেই দু'হাত মুখ ঢেকে মেঝের ওপর আছড়ে পড়ল জ্যোৎস্না। সমানে কেঁদে চলেছে সে। কান্নাটা তার বুকের ভেতর থেকে যেন উথলে উথলে বেরিয়ে আসছে। জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে একটানা বলে চলেছে সে, মানুষটার মরণ অইব, আর আমি টিপসই দিমু? কিছুতেই না, কিছুতেই না। হের (তার) থিকা আপনেরা আমারে মাইরা ফেলান, মাইরা ফেলান—'

বন্ডে টিপসই দেবার ব্যাপারে প্রতিক্রিয়াটা এমন হবে, ভাবা যায়নি। চেম্বারের সবাই হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে থাকে।

কয়েক লহমা মাত্র। তারপর চেয়ার ঠেলে উঠে পড়েন শেখরনাথ। দু'হাতে জ্যোৎস্নাকে টেনে তুলে একরকম জোর করেই চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'কাঁদবে না, কাঁদবে না। আমার কথা শোনো। আমাকে বাবা বলেছ তো? আমার ওপর ভরসা রাখো। তোমাদের এতটুকু ক্ষতি হয় তাই কখনও আমি করব না।'

শান্ত হতে খানিকটা সময় লাগল জ্যোৎস্নার। তারপর চোখের জল মুছে ভারী গলায় বলল, 'কী কইবেন কন—'

শেখরনাথ এবার যা বললেন, তা এইরকম। মোহনবাঁশির অপারেশন না হলে মৃত্যু অনিবার্য। হাসপাতালে তাকে রাখা হবে না; আজই জেফ্রি পয়েন্টে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন ডাক্তার চট্টরাজ। অপারেশন হলে বাঁচার সম্ভাবনা আছে; ষোলো আনার মধ্যে আট আনা; মৃত্যুর আশঙ্কাও আট আনা। এখন জ্যোৎস্নাকেই ঠিক করতে হবে সে কী করবে। তার টিপসই ছাড়া কোনও ভাবেই অপারেশন করা যাবে না। এটাই হাসপাতালের নিয়ম।

জ্যোৎস্না বলল, 'আপনে যা কইবেন হেইটাই করুম।'

'না; আমি না। তোমাকেই ভাবতে হবে টিপসই দিতে রাজি আছ কিনা। তবে সময় কিন্তু হাতে বেশি নেই। যত দেরি করবে মোহনবাঁশির পক্ষে ততই ক্ষতি।'

কিছুক্ষণ নতমুখে বসে রইল জ্যোৎস্না। বিনয় সারাক্ষণ এই চেম্বারে নীরব দর্শকের মতো সব শুনে যাচ্ছিল এবং দেখেও যাচ্ছে। সে লক্ষ করল জ্যোৎস্নার ভেতরে কোথাও যেন একটা যুদ্ধ চলছে। একসময় মুখ তুলে তাকাল সে। এই জ্যোৎস্না ভয়কাতর, ত্রস্ত, আতঙ্কগ্রস্ত জ্যোৎস্না নয়। অন্য কেউ। দৃঢ়, নিজের সিদ্ধান্তে অনড়। বোঝা যাচ্ছে, সে মনস্থির করে ফেলেছে। বলল, 'কুনহানে(কোথায়)টিপসই দিতে অইব, দেখাইয়া দ্যান—'

ডাক্তার চট্টরাজ ফর্মের নানা জায়গা পূরণ করে রেখেছিলেন। নিচের দিকের একটা ফাঁকা জায়গা দেখিয়ে বললেন, 'এখানে—' একটা কালির প্যাড তিনি জ্যোৎস্নার দিকে এগিয়ে দিলেন।

টিপসই হয়ে গেলে দ্রুত উঠে পড়লেন ডাক্তার চট্টরাজ। শেখরনাথকে বললেন, 'আমি ওটি'তে চলে যাচ্ছি কাকা। যতক্ষণ অপারেশন শেষ না হচ্ছে বিনয়বাবু আর আপনি আমার চেম্বারে বসতে পারেন। জ্যোৎস্না কর্মকার বাইরের বেঞ্চে গিয়ে বসুক।'

শেখরনাথ জিগ্যেস করলেন, 'অপারেশনে কতক্ষণ লাগবে?'

'অপারেশন করতে কতটা সময় লাগবে?'

'এখনই বলতে পারছি না। তবে তিন চার ঘণ্টার কম নয়।'

শেখরনাথ বললেন, 'আমরা এখানে থাকব না। জ্যোৎস্নাদের সঙ্গেই থাকব।'

তাঁর মনোভাবটা বুঝতে পারল বিনয়। জ্যোৎস্না এবং তার ছেলেমেয়েদের কাছে তিনি থাকলে ওরা ভরসা পাবে।

ডাক্তার চট্টরাজ আর কিছু বললেন না। অপারেশন থিয়েটার তেতলায়। চেম্বার থেকে বেরিয়ে তিনি সেখানে চলে গেলেন। শেখরনাথও বসে থাকলেন না; বিনয় এবং জ্যোৎস্নাকে সঙ্গে করে বাইরের প্যাসেজে বেঞ্চিতে এসে বসলেন।

সময় কাটতে থাকে। এদিকে হাসপাতালের চত্বরে নতুন নতুন রোগী আসছে। সঙ্গে তাদের বাড়ির লোকজন। চারিদিক এখন সরগরম।

সূর্য সেলুলার জেলের মাথা ডিঙিয়ে পশ্চিম দিকে খানিকটা নেমে গেছে। হাসপাতালের এই লম্বা প্যাসেজ থেকে সেসোস্ট্রেস বে'র অনেকটা অংশ চোখে পড়ে। তেজি রোদে উপসাগরের জল ফেনিয়ে উঠে পাড়ের দিকে ধেয়ে আসছে। অশান্ত, উত্তাল ঢেউয়ের অবিরল গজরানি শোনা যাচ্ছে। দূরে-কাছে যতদূর চোখ যায় জেলেদের ছোট ছোট বোট। মাঝে মাঝে দু-চারটে লঞ্চ। হাসপাতাল থেকে সেগুলোকে দম-দেওয়া খেলনা জলযানের মতো দেখায়। তবে সবচেয়ে বেশি করে যা চোখে পড়ে তা হল ঝাঁকে ঝাঁকে সী-গাল।

জ্যোৎস্না উপসাগরের দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে আছে। টিপসই দেবার আগের মুহূর্তে তার যে মনোবল দেখা গিয়েছিল তা ক্রমশ যেন ভেঙে পড়ছে। মাঝে মাঝে বিড় বিড় করে চাপা গলায় সে বলে যাচ্ছে, 'কী কুক্ষণে যে আন্দারমানে আইছিলাম। কত মাইনষে (মানুষ) নিষেধ করছিল যাইও না। পাদ্রির বাবুরা আইয়া কইছিল যাইও না। তভু জমিন পামু এই ভরসায় চইলা আইলাম। অহন আমার সব্বস্ব যাইতে বইছে।'

পাশে বসে সমানে তাকে সাহস দিয়ে যাচ্ছেন শেখরনাথ। ডাক্তার চট্টরাজ খুব বড় ডাক্তার। ধন্বন্তরি। কত মানুষ যে তিনি বাঁচিয়েছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। তার কথা যেন শুনতেই পায় না জ্যোৎস্না।

মোহনবাঁশির ছেলেমেয়েরা বিশ্বজিতের বাংলো থেকে বেরোবার পর একটি কথাও বলেনি। চুপচাপ বোবার মতো তারা বসে আছে।

একসময় বিনয়কে নিয়ে উঠে পড়লেন শেখরনাথ। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এসে বললেন, 'সেই কখন ওরা দু'টি ভাত খেয়ে এসেছে। বেলা হেলতে শুরু করেছে; নিশ্চয়ই ওদের খিদে পেয়ে গেছে। এক কাজ কর গাড়ি নিয়ে এবারডিন মার্কেটে চলে যাও। ওখানে অনেক হোটেল আর খাবারের দোকান আছে। তুমি সবার মতো রুটি তরকারি মিষ্টি নিয়ে এসো।' পকেট থেকে টাকা বার করে দিতে দিতে বলতে লাগলেন, 'আমি জ্যোৎস্নাদের কাছেই থাকি। দু'জনে একসঙ্গে চলে গেলে ওরা দিশেহারা হয়ে পড়বে।'

যে গাড়িতে সবাই হাসপাতালে এসেছিল সেটা একধারে দাঁড়িয়ে আছে। বিনয় আধঘণ্টার ভেতর রুটি টুটি কিনে ফিরে এল।

মোহনবাঁশির ছেলেমেয়েরা তবু একটু আধটু খেল। কিন্তু জ্যোৎস্নাকে কোনওভাবেই খাওয়ানো গেল না।

শেখরনাথ বারবার বোঝাতে লাগলেন, 'না খেলে নাড়ি চুঁইয়ে যাবে। ডাক্তাররা তো মোহনবাঁশিকে দেখছেন। সে যাতে সুস্থ হয়ে ওঠে সেই চেষ্টা করছেন। নিজেকে কষ্ট দিয়ে কী লাভ তোমার?'

ব্যাকুলভাবে জ্যোৎস্না বলতে লাগল, 'আমারে খাওনের কথা কইয়েন না বাবা। গলা দিয়া কিছু নামব না।'

আরও ঘণ্টা দুই পর সূর্য যখন মাউন্ট হ্যারিয়েটের দিকে হেলতে শুরু করেছে, সেই সময় ডাক্তার চট্টরাজ তেতলা থেকে নেমে এলেন।

pathagar.n

banglabooks.in

শেখরনাথের সঙ্গে বিনয় জ্যোৎস্নারাও ব্যগ্রভাবে উঠে দাঁড়াল। ডাক্তার চট্টরাজ বললেন, 'অপারেশন হয়ে গেছে।'

পাঁচ

ডাক্তার চট্টরাজকে ভীষণ ক্লান্ত এবং বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। কপালে দানা দানা ঘাম জমেছে। আন্দাজ করা যায় তাঁর ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে।

কেউ কিছু বলার আগেই রুদ্ধশ্বাসে জ্যোৎস্না জিগ্যেস করল, 'হ্যায় (সে) বাইচা আছে তো?' কণ্ঠস্বরে তীব্র ব্যাকুলতা। পোর্টব্লেয়ারে আসার পর এই প্রশ্নটা যে সে কতবার করেছে।

ডাক্তার চট্টরাজ উত্তর দিতে গিয়ে একটু থমকে গেলেন। তারপর যেন দ্বিধা কাটিয়ে উঠে বললেন, 'সেই রকমই আশা করছি।'

জ্যোৎস্না বলল, 'ডাক্তারবাবু, আমারে হের (তার) কাছে লইয়া যান।'

'এখন নিয়ে যাওয়া যাবে না।'

'দয়া করেন ডাক্তারবাবু, হেরে (তাকে) একবার খালি দেখুম। আপনের পায়ে ধরি—'

জ্যোৎস্না ডাক্তার চট্টরাজের পায়ের দিকে ঝুঁকতে যাচ্ছিল. বিব্রতভাবে তার হাতদুটো ধরে বললেন, 'না না. তুমি বোসো। অপারেশনের পর তোমার স্বামীকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে। সে ঘুমোচ্ছে।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে। হাতজোড় করে সে সমানে বলে যেতে লাগল, মোহনবাঁশির কাছে তাকে নিয়ে যেতেই হবে।

শেখরনাথ আর বিনয় একদৃষ্টে ডাক্তার চট্টরাজকে লক্ষ করছিল। দু'জনেরই মনে হচ্ছিল, অপারেশনটা হয়ে গেলেও কোথায় যেন সমস্যা রয়েছে। শেখরনাথ কী ভেবে জ্যোৎস্নাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে বসতে বলে ডাক্তার চট্টরাজকে বললেন, 'চল, তোমার চেম্বারে যাওয়া যাক—'

ডাক্তার চট্টরাজ খুব সম্ভব এটাই চাইছিলেন। ব্যস্তভাবে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন—'

চেম্বারে গিয়ে শেখরনাথ জিগ্যেস করলেন, 'তোমার মুখচোখ দেখে কেমন যেন লাগছে। অপারেশনটা কি সাকসেসফুল হয়নি?'

'নিশ্চয়ই হয়েছে।' ডাক্তার চট্টরাজ চকিত হয়ে উঠলেন।— 'তবে কেসটা তো ভীষণ ক্রিটিক্যাল। একটা প্রবলেম দেখা দিয়েছে। সেটা মোহনবাঁশির স্ত্রীর সামনে বলতে চাইনি।'

'কী প্রবলেম?' শেখরনাথকে চিন্তিত দেখাল।

'অনেক কষ্টে খুব সাবধানে আমরা তিরটা বার করতে পেরেছি। কিন্তু যে ভয়টা হচ্ছিল সেটা ঘটেছে।'

'কী সেটা?'

'ফুসফুস থেকে খানিকটা ব্লিডিং হয়েছে। এখনও হচ্ছে। আপনাকে আগেই বলেছিলাম, রক্ত বেরোনোটা ভালো নয়।'

মুখটা থমথমে হয়ে গেল শেখরনাথের। কোনও প্রশ্ন না করে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

ডাক্তার চট্টরাজ বললেন, 'রক্ত বেরোনোর ফলে পেশেন্টের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে।'

শেখরনাথ জিগ্যেস করলেন, 'ফ্যাটাল কিছু হয়ে যাবে না তো?'

'বাহাত্তর ঘণ্টা না গেলে সেটা বলা যাবে না। তবে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে, সেই সঙ্গে ব্লাডও। এখন দেখা যাক।'

অনেকক্ষণ নীরবতা।

তারপর শেখরনাথ বললেন, 'জ্যোৎস্না ভীষণ উতলা হয়ে আছে। ওকে নিয়ে গিয়ে কি একবার মোহনবাঁশিকে দেখিয়ে আনা যায়?'

মাতৃ চরণে মানব কল্যানে
তন্ত্র ও জ্যোতিষ সম্রাট
শ্রী সৌমেন ব্যানার্জ্জী
বাস্তু, বিবাহ, শত্রুতা, গুপ্ত গভীর সমস্যার সমাধানে অদ্বিতিয়।
চেম্বার - বাঁকুড়া, বর্ধমান, বিষ্ণুপুর, বাড়ি- হাটকৃষ্ণনগর
M-9434007228/9832154568 সহ- বাপী ও রাজু
প্রতি অমাবস্যায় তারাপীঠ নগেন বাবা আশ্রম।
প্রতি শনিবার নিজমন্দিরে মহানিশায় মহাহোম।

লাখো জনের লাখো মত শ্রীকানন সম্পর্কে একমত
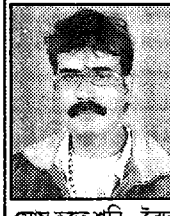
বিচার সঠিক হলে পাথর কথা বলে
বর্ধমান শহরে একমাত্র জ্যোতির্বিদ ও ভবিষ্যত বক্তা
শ্রীকানন
গোল্ড মেডিলিষ্ট B.Sc., I.A.R.P. (Cal)
সোম হতে শনি - বৈদ্যনাথ কাটরা, কার্জনগেট (10 AM - 5 P.M)
পাঁজা মার্কেট, বিবেকানন্দ কলেজ মোড় (6-8 P.M.), বর্ধমান।
রবিঃ- বাড়িতে জুবিলা, (ভায়া- সগড়াই মোড়) বর্ধমান
মোঃ 9732087480 / 9732087480

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
যুবকল্যাণ বিভাগের যৌথ উদ্যোগে
যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষন কেন্দ্রে
IT, DTP, FA
এবং Hardware
সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্সে
ভর্তি চলছে
তমলুক - তমলুক হসপিটাল মোড়, বাদামতলা, উন্নয়ন ক্লাবের বিপরীতে
ফোন - ০৩২২৮ ২৬৯১৯৫
কাঁথি - সেরপুর, মেচেদা বাইপাসের নিকট,
ফোন - ৯২৩২৪০০৬০০
সত্বর যোগাযোগ করুন

রানা রক্ষিত পরিচালিত
কলিকাতার সুবিখ্যাত- রক্ষিত স্পেশ্যাল
১নং আর.এন.মুখার্জ্জী রোড, (মার্টিন বার্ন বিল্ডিং) কলি-১
২০১১-১২ বর্ষের ভ্রমন সূচী
বৈষ্ণবদেবী ডালহৌসী ধরমশালা কাংড়া ভ্যালী, শ্রী শ্রী কেদারনাথ-বদ্রীনারায়ণ ধাম, সিমলা-কুলু-মানালী-চণ্ডীগড -অমৃতসর, নৈনীতাল-কৌসানী-মুন্সীয়ারী-মায়াবতী, গ্যাংটক -পেলিং-ইয়ুমথাম, পশুপতিনাথ-কাঠমাণ্ডু-পোখরা, কিন্নর-কৈলাস, লে-লাদাখ, কামাক্ষ্যা-গৌহাটী-শিলং-কাজিরাঙ্গা।
এছাড়াও বিশদ জানতে- (০৩৩) ২২৩১-৯০৬৫/০৯৬৭
আপনার কোন না কোন প্রতিবেশীর কাছেই আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

banglabooks.in

ডাক্তার চট্টরাজ বললেন, 'সেটা ঠিক হবে না। পেশেন্টের নাকে অক্সিজেনের নল, বেডের পাশে ব্লাড আর অন্য সব ওষুধের বোতল ঝুলছে। এসব দেখলে মোহনবাঁশির স্ত্রী খুব নার্ভাস হয়ে পড়বে।'

'তবু—' বাকিটা শেষ না করে থেমে গেলেন শেখরনাথ।

'বেশ, আপনি যখন বলছেন তাই হবে। কিন্তু দূর থেকে দেখাব। এমন একটা দৃশ্য দেখলে কান্নাকাটি করবে, স্বামীকে আঁকড়ে ধরতে চাইবে। আপনাকে কিন্তু সেটা সামলাতে হবে।'

'ঠিক আছে।'

এই সময় বিশ্বজিৎ চেম্বারে এসে ঢুকলেন।—'কিছুক্ষণ আগে কোর্টের হিয়ারিং শেষ হল। ড্রাইভারকে তাড়া দিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে চলে এসেছি। অপারেশন কেমন হল?' তিনি ডাক্তার চট্টরাজের দিকে তাকালেন।

ডাক্তার চট্টরাজ সব জানিয়ে দিলেন।

খুবই চিন্তাগ্রস্ত দেখাল বিশ্বজিৎকে। বললেন, 'যেভাবে হোক, লোকটাকে বাঁচাতেই হবে, নইলে আন্দামানের রিহ্যাবিলিটেশনে এর বিরাট ধাক্কা এসে লাগবে।'

ডাক্তার চট্টরাজ বললেন, 'আমার মনে আছে। আগেও অনেকবার বলেছেন। আমরা মোহনবাঁশির স্ত্রীকে নিয়ে পেশেন্টের কাছে যাচ্ছি। আপনি কি যাবেন?'

'নিশ্চয়ই।'

চেম্বার থেকে বেরিয়ে জ্যোৎস্নাকে সঙ্গে নিয়ে শেখরনাথরা তেতলায় উঠতে লাগলেন। মোহনবাঁশির ছেলেমেয়েদের অবশ্য সঙ্গে নেওয়া হল না। তাদের বারবার বলা হল, দোতলার বেঞ্চে যেন বসে থাকে, অন্য কোথাও না যায়।

সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে শেখরনাথ জ্যোৎস্নাকে বোঝাতে লাগলেন, শরীরে ছুঁচ এবং নাকে নল ঢুকিয়ে মোহনবাঁশিকে নানারকম ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। সেসব দেখে সে যেন ভয় না পায়, কান্নাকাটি না করে।

জ্যোৎস্না ঘাড় কাত করে জানাল—তেমন কিছুই করবে না।

অপারেশনের পর তেতলার সমুদ্রের দিকে কাচ দিয়ে ঘেরা একটা কেবিনে রাখা হয়েছে মোহনবাঁশিকে। সে চিত হয়ে শুয়ে আছে। চোখদুটো বোজা। বোঝা যায় সম্পূর্ণ বেহুঁশ। ডাক্তার চট্টরাজ যেমন বলেছিলেন ঠিক তেমনি নল টল, অক্সিজেন সিলিন্ডার ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে।

দুই তরুণ ডাক্তার সুকুমার আর তাপস এবং একজন নার্স মোহনবাঁশির বেডের পাশে রয়েছে।

ডাক্তার চট্টরাজ বললেন, 'আপনাদের এতজনকে কিন্তু কেবিনের ভেতর নেওয়া যাবে না।'

শেখরনাথ বললেন, 'যাওয়ার দরকার কী? এখান থেকেই ভালো দেখা যাচ্ছে।'

ডাক্তার চট্টরাজ দাঁড়ালেন না। কেবিনে ঢুকে নিচু গলায় সুকুমার এবং তাপসের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। নিশ্চয়ই রোগীর চিকিৎসা সম্পর্কে কোনও পরামর্শ দিচ্ছেন।

বিনয় জ্যোৎস্নার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল। সে লক্ষ করল, জ্যোৎস্না পলকহীন বেডে শায়িত মোহনবাঁশিকে দেখছে। শেখরনাথ তাকে কাঁদতে বারণ করেছিলেন। সে শব্দ করে কাঁদছে না ঠিকই, তবে চোখ জলে ভরে যাচ্ছে। ঠোঁট দুটো কাঁপছে থরথর করে।

শেখরনাথও জ্যোৎস্নার দিকে নজর রেখেছিলেন। চাপা, নরম গলায় বললেন, 'না না, চোখের জল ফেলো না। ডাক্তারবাবুরা চেষ্টার ত্রুটি করছেন না। চোখ মোছো—'

ধীরে ধীরে আঁচল তুলে চোখ মুছে ফেলল জ্যোৎস্না।

ডাক্তার চট্টরাজ কেবিন থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন, 'দেখানো হয়েছে। এবার আপনারা বাড়ি চলে যান কাকা। কাল আবার আসবেন।'

শেখরনাথ বললেন, 'আচ্ছা—'

বিশ্বজিৎ জিগ্যেস করলেন, 'ওষুধ টোষুধ, ইঞ্জেকশন কিছু কিনে দিতে হবে?'

ডাক্তার চট্টরাজ বললেন, 'আপাতত দরকার নেই। তেমন বুঝলে পরে জানাব।'

এতক্ষণ নীরব ছিল। হঠাৎ ভাঙা ভাঙা, জড়ানো গলায় জ্যোৎস্না বলে উঠল, 'আমি বাড়িত্ যামু না।'

সবাই অবাক। শেখরনাথ জিগ্যেস করলেন, 'যাবে না কেন?'

'আমারে পোলামাইয়া লইয়া হের (তার) কাছে থাকতে দ্যান।'

অর্থাৎ জ্যোৎস্না চাইছে তাদের মোহনবাঁশির কেবিনে থাকতে দেওয়া হোক। একবার যখন স্বামীকে দেখতে পেয়েছে তাকে চোখের আড়াল করতে চায় না।

ডাক্তার চট্টরাজ বললেন, 'বিরাট অপারেশন হয়েছে মোহনবাঁশির। এখনও জ্ঞান ফেরেনি। এই অবস্থায় এতজন তার কেবিনে থাকবে তাই হয় নাকি? হাসপাতালে এভাবে থাকার নিয়ম নেই।'

জ্যোৎস্না শেখরনাথের দিকে তাকায়। আকুল স্বরে বলে, 'বাবা, আপনে আমার পোলামাইয়াগুলারে লইয়া যান। আমি হের (তার) ঘরের এক কিনারে চুপ কইরা বইয়া (বসে) থাকুম। কথা কমু না, কান্দুম না। আমারে দয়া করেন।'

শেখরনাথ বললেন, 'ডাক্তারবাবু কী বলেছেন শুনলে তো। ওঁর পক্ষে হাসপাতালের নিয়ম ভাঙা সম্ভব নয়। চল—' জ্যোৎস্নার একটা হাত ধরে আস্তে আস্তে তেতলার ওয়ার্ড পেরিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। বিনয় এবং বিশ্বজিৎ ওঁদের পাশাপাশি চলতে লাগলেন।

জ্যোৎস্না আর একটি কথাও বলল না। ঘাড় ঘুরিয়ে যতক্ষণ মোহনবাঁশির কেবিনটা চোখে পড়ে, দেখতে লাগল।

পরদিন সাড়ে ন'টায় আবার জ্যোৎস্নাদের নিয়ে হাসপাতালে এলেন শেখরনাথ। বিনয়ও এসেছে। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যাপারে বিশ্বজিতের আজ পর পর বেশ ক'টা মিটিং আছে। তাছাড়া কিছুক্ষণের জন্য হলেও একবার কোর্টে যেতে হবে। তাই আজ আর তাঁর পক্ষে হাসপাতালে আসা সম্ভব নয়। এবেলা তো বটেই, বিকেলের দিকেও আসতে পারবেন না।

কাল বাংলোয় ফেরার পর কিছু খেতে চায়নি জ্যোৎস্না। একরকম জোর করেই তাকে খাইয়েছেন শেখরনাথ আর বিশ্বজিৎ। শেখরনাথ বলেছেন, 'তুমি যদি না খেয়ে খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়, আমরা মুশকিলে পড়ে যাব। একদিকে মোহনবাঁশি, আরেকদিকে তুমি। তখন কাকে সামলাব? নিজেকে সুস্থ রাখতে হবে। খাও—খাও বলছি।' প্রায় ধমকই দিয়ে উঠেছিলেন।

আজ হাসপাতালে এসে সামান্য সুখবর পাওয়া গেল। বাইরের প্যাসেজের বেঞ্চিতে জ্যোৎস্নাদের বসিয়ে শেখরনাথ আর বিনয় ডাক্তার চট্টরাজের চেম্বারে চলে গিয়েছিল।

ডাক্তার চট্টরাজ বললেন, 'ফুসফুসের ব্লিডিং অনেকটাই থামানো গেছে। তবে শ্বাসকষ্টটা একইরকম আছে। আপাতত আরও চব্বিশ ঘণ্টা অক্সিজেন চলবে। তারপর দেখা যাক।'

শেখরনাথের মুখ দেখে মনে হল, মোহনবাঁশির ফুসফুসে রক্তপাত কমে আসায় সামান্য হলেও তাঁর মানসিক চাপ কেটেছে। উৎসুক সুরে জিগ্যেস করলেন, 'আউট অফ ডেঞ্জার বলা যায় কী?'

'এখনও পুরোপুরি নয়। আজ সারাদিন চেষ্টা চালিয়ে যাব। ব্লিডিংটা পুরোপুরি বন্ধ করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। সেটা করতে পারলেই ফিফটি পারসেন্ট কাজ হয়ে যাবে। তখন বলতে পারব আশা আছে।'

'সন্ধের আগে হাসপাতাল থেকে যাচ্ছি না। অনেক আশা নিয়ে থাকব। জ্যোৎস্নাকে কি বলতে পারি মোহনবাঁশি একটু

pathagar.net

banglabooks.in

ভালো আছে? বুঝতেই পারছ কিরকম প্রচণ্ড উদ্বেগে ক'টাদিন তার কাটছে—'

ডাক্তার চট্টরাজ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর দ্বিধার সুরে বললেন, 'আচ্ছা, বলবেন।'

শেখরনাথ বললেন, 'এখন তাহলে আমরা উঠি। তুমি নিশ্চয়ই মোহনবাঁশিকে দেখতে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

সবাই চেম্বারের বাইরে বেরিয়ে এল। ডাক্তার চট্টরাজ সিঁড়ি ভেঙে তেতলায় চলে গেলেন। বিনয়কে সঙ্গে করে শেখরনাথ গেলেন জ্যোৎস্নাদের কাছে। লম্বা অলিন্দের একপাশে ছেলেমেয়েদের নিয়ে জড়সড় হয়ে বসে ছিল জ্যোৎস্না। সে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ায়। দু'চোখে অনন্ত প্রশ্ন।

শেখরনাথ হাত তুলে তাকে বললেন, 'দুশ্চিন্তা কোরো না। ডাক্তারবাবু বলেছেন মোহনবাঁশির বিপদ কেটে এসেছে। সে সুস্থ হয়ে উঠবে। তবে আরও কিছুদিন তাকে হাসপাতালে থাকতে হবে।'

জ্যোৎস্নার দু'চোখে উৎকণ্ঠা এবং আশা আলোআঁধারির মতো ফুটে উঠতে থাকে। ব্যগ্রভাবে সে বলে, 'ডাক্তারবাবু ভরসা দিছে তো বাবা?' শেখরনাথের মুখে শোনার পরও যেন পুরোপুরি ভরসা পাচ্ছে না সে।

বিনয়ের দিকে আঙুল বাড়িয়ে শেখরনাথ বললেন, 'ও তো আমার সঙ্গেই ছিল। ডাক্তারবাবু কী বলেছেন, ওকেই জিগ্যেস করে দেখ।'

জ্যোৎস্নার হঠাৎ খেয়াল হল শেখরনাথের মতো শুভাকাঙ্ক্ষী আপনজন এই আন্দামান দ্বীপে তাদের আর কেউ নেই। সে ডাক্তার চট্টরাজ সম্পর্কে যে প্রশ্নটা করেছে তার মধ্যে খানিকটা অবিশ্বাস রয়েছে। ওটা করা ঠিক হয়নি। শেখরনাথের পায়ের দিকে ঝুঁকে ব্যাকুলভাবে বলে, 'কেওরে (কারওকে) জিগাইতে অইব না। আমারে মাফ কইরা দ্যান। বোঝেনই তো বাবা, হ্যার (তার অর্থাৎ মোহনবাঁশির) লইগা মনখান বড় উতলা। কী কইতে যে কী কইয়া ফালাই (ফেলি)! মাথা আমার ঠিক থাকে না।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে—' জ্যোৎস্নার দু'হাত ধরে টেনে তুলে তাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন শেখরনাথ। বললেন, 'তোমাদের তো মোহনবাঁশির কাছে এবেলা যেতে দেবে না। ওবেলা অবস্থা বুঝে দেখতে দিতে পারেন। এতটা সময় কী করবে?'

বিহ্বলের মতো জ্যোৎস্না বলল, 'কী করুম!'

'এক কাজ কর, আমাদের সঙ্গে গাড়ি আছে। তুমি বিশ্বজিতের বাংলোয় চলে যাও। সকালে কী চাট্টি খেয়ে এসেছ! দুপুরে পেট ভরে খেয়ে ওখানে বিশ্রাম কর। বিকেলে ফের গাড়ি গিয়ে তোমাদের হাসপাতালে নিয়ে আসবে।'

কালও হাসপাতাল ছেড়ে যেতে রাজি হয়নি জ্যোৎস্না। আজও হল না। বলল, 'আমরা এখানেই থাকুম।'

জ্যোৎস্নার মনোভাবটা বোঝেন শেখরনাথ। স্বামীর সঙ্গে দেখা না হলে হাসপাতালে তার কাছাকাছি থাকা যাবে, এটুকুই তার সান্ত্বনা। তিনি আর জোর করলেন না। একটু কী ভেবে বললেন, 'তোমরা তাহলে এখানেই বসে থাকো। আমরা একটু ঘুরে আসি।'

'কহন (কখন) আইবেন?'

'দুপুরে। তোমাদের খাবার নিয়ে আসব।'

জ্যোৎস্না আর কোনও প্রশ্ন করল না।

শেখরনাথ বিনয়কে বললেন, 'চল, নিচে নামা যাক—'

বিনয় বলল, 'কাকা, আপনি বলেছিলেন, সেলুলার জেলটা ভালো করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবেন। আজ আপনার কি অন্য কোনও কাজ আছে?'

'না, নেই। আজ তোমাকে যতটা পারি দেখাব। কিন্তু এই কুখ্যাত জেলখানার বিরাট ইতিহাস। কত বিপ্লবী কত খুনি দস্যু সারা ভারত থেকে এখানে দ্বীপান্তরের সাজা নিয়ে এসেছিল! সে কি একদিনে শোনানো যায়। চল, যতটা পারি—'

নিচের বিশাল চত্বরে নেমে শেখরনাথ উলটো দিকের লম্বা তেতলা উইংটা দেখিয়ে বললেন, 'আজ ওখানে যাব। তার আগে চারপাশ দেখাই।'

মোহনবাঁশিকে নিয়ে জেফ্রি পয়েন্ট থেকে আসতেই হাসপাতালে বিনয়ের চোখে পড়েছিল ভূমিকম্পে এবং জাপানি বোমায় দুটো উইং ধ্বংস হয়ে যাবার পর বাকি যে পাঁচটা মস্ত মস্ত উইং এখনও দাঁড়িয়ে আছে, হাসপাতালটা বাদ দিলে তার প্রতিটি তলায় সারি সারি কুঠুরি বা সেল। প্রতিটি সেলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ব্রিটিশ আমলের কত যে বর্বর নির্যাতনের নীরব কাহিনি। এর কিছু কিছু বিবরণ নানা বইতে পড়েছে বিনয় কিন্তু একজন বিপ্লবী যিনি তাঁর জীবনের অতি মূল্যবান অনেকগুলো বছর এই ভয়ংকর নরককুণ্ডে কাটিয়েছেন তাঁর মুখে শোনাটা বিরল অভিজ্ঞতা। আন্দামানে এসে শেখরনাথের সঙ্গে দেখা হওয়াটাকে বিরাট সৌভাগ্য বলেই মনে হয় বিনয়ের।

শেখরনাথ বললেন, 'হাসপাতালের সামনে যে মস্ত চত্বরটায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি, ইংরেজ রাজত্বে এখানে কী ছিল জানো?'

বিনয় মাথা নাড়তে থাকে।—জানে না।

শেখরনাথ জানালেন, এই বিস্তৃত ফাঁকা জমিতে ছিল টিনের লম্বা লম্বা ছাউনির তলায় ঘানিঘর।

'জেলখানায় ঘানিঘর!' বিনয় বেশ অবাকই হল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সারি সারি ঘানি বসানো হয়েছিল। ঘানি টানা দেখেছ কখনও?'

'দেশে থাকতে কলুদের বাড়িতে দেখেছি। বলদ দিয়ে টানানো হত।'

'আর এখানে টানানো হত কয়েদিদের দিয়ে।' বলে একটু হাসলেন।

বিনয় জিগ্যেস করল, 'আপনার মতো বিপ্লবীদের দিয়েও?'

শেখরনাথের হাসি সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল।—'সবাইকে দিয়েই। কেউ বাদ নয়। আর বিপ্লবী বলে গুরুঠাকুর নাকি যে তাদের মাথায় করে রাখতে হবে? ইংরেজদের রাগ তো রেভোলিউশনারিদের ওপর সবচেয়ে বেশি।' তারা সশস্ত্র বিপ্লব ঘটিয়ে ওদের তাড়িয়ে ইন্ডিয়া স্বাধীন করতে চায়।'

বিনয় আন্দাজ করে নিল শেখরনাথকেও ঘানি ঘোরাতে হয়েছে। একজন মানুষ জীবনে যাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল দেশের বন্ধনমুক্তি, যিনি চিরকুমার, নিজের সিদ্ধিতে পৌঁছতে যিনি সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন তাঁকে প্রচণ্ড নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছে, ভাবতেও মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায় তার।

'শুনে খুব কষ্ট হল তো? আরে বাবা, প্রায় দু'শো বছরের এত বড় একটা কলোনির অজস্র সম্পদ লুটপাট করে লন্ডনের জেল্লা যেখানে দিন দিন বাড়ানো হচ্ছে, সেখানে বাধা পড়লে ইংরেজ মুখ বুজে সহ্য করবে? ওই অত্যাচারটুকু রেভোলিউশনারিদের প্রাপ্য।'

একটু চুপচাপ।

তারপর শেখরনাথ বললেন, 'দিনে নারকেল থেকে তেল বার করতে হত। পাক্কা পনেরো সের। পেটি অফিসার নিজের হাতে মেপে নিত।'

উৎসুক সুরে বিনয় জানতে চাইল, 'পেটি অফিসার কাদের বলে? জেলের স্টাফ?'

শেখরনাথ বুঝিয়ে দিলেন। কয়েদিদের মধ্যে যাদের কয়েক বছর জেল খাটা হয়ে গেছে, যারা জেলারের তাঁবেদার, ইংরেজদের নামে যারা কথায় কথায় সেলাম ঠোকে, তাদের ভেতর থেকে অন্য কয়েদিদের ওপর নজরদারি করার জন্য কয়েকজনকে বেছে নেওয়া হত। জেলের হর্তাকর্তারা এদের

pathagar.n

banglabooks.in

দু'ভাগে ভাগ করে দিয়েছিল। একেবারে নিচের স্তরের নজরদারদের বলা হত টিন্ডাল, তার ওপরে পেটি অফিসার। টিন্ডালদের মাইনে দেওয়া হত মাসে দু'টাকা, পেটি অফিসাররা পেত সোয়া তিন কি সাড়ে তিন টাকা। তখনকার দিনে এই টাকাটা খুব কম নয়, বিশেষ করে কালাপানির সাজা খাটতে আসা কোনও কয়েদির পক্ষে।

এইভাবে কয়েদিদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করেছিল। টিন্ডাল আর পেটি অফিসাররা বেশিরভাগই হত পাঠান। মানুষ যে এমন নিষ্ঠুর এবং বর্বর হতে পারে ভাবা যায় না। নতুন পদমর্যাদা পেয়ে তারা সারা সেলুলার জেল দাপিয়ে বেড়াত। সারাক্ষণ তক্কে তক্কে থেকে সাধারণ কয়েদিদের খুঁত ধরতে চেষ্টা করত। ওদের শকুনের নজর, কিছু না কিছু একটা বার করে ফেলতই। তারপর নৃশংস নির্যাতন।

শেখরনাথ বললেন, 'সে টরচার তুমি কল্পনা করতে পারবে না বিনয়।'

বিনয় রুদ্ধশ্বাসে শুনে যাচ্ছিল। জিগ্যেস করল, 'কী ধরনের টরচার?'

'সেলুলার জেলের ভেতর কয়েদিদের দিয়ে নানারকম পরিশ্রমের কাজ করানো হত। যেমন ধর ডিউটি ছিল সকাল সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে বারোটা। তারপর দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার জন্য একঘণ্টা গ্যাপ। ফের দেড়টা থেকে সন্ধে অব্দি হাড়ভাঙা খাটুনি। কয়েদিদের কারওকে ঘানি টানতে হত, কারওকে নারকেল ছোবড়া পিটিয়ে সরু সরু তার বার করতে হত, কারওকে কাঠ চেরাই করতে হত। যার পনেরো সের নারকেল তেল বার করার কথা টিন্ডাল কি পেটি অফিসার ওজন করে যদি দেখত আধপোয়া বা তিনপোয়া কম হয়েছে তার দু'দিন রাতের খানা বন্ধ। যাকে নারকেল ছোবড়া থেকে আড়াই সের তার বার করতে হবে তার কম হলে সেই কয়েদিরও একই সাজা। পর পর তিনদিন যদি কম হয় তখন টিকটিকিতে চড়ানো হত।'

'টিকটিকি কাকে বলে?'

'সামনের উইংটার পেছনে যে চত্বরটা রয়েছে সেখানে এখনও দু'চারটি আছে। নিজের চোখে দেখলে বুঝতে পারবে। এসো আমার সঙ্গে—'

বিশাল তেতলা বিল্ডিংটার পাশ দিয়ে ওদিকে চলে এল দু'জনে। এই এলাকাটা ভীষণ নির্জন। কোনও জনপ্রাণী চোখে পড়ছে না। এ ধারের মস্ত বিল্ডিংটা খাঁ খাঁ করছে। ইংরেজরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেলগুলোতে নতুন কয়েদি আর আসেনি। যদিও বা দু'চারজন ছিল, স্বাধীনতার আগে আগেই খুব সম্ভব তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

চারিপাশ নিরেট এক শূন্যতা বিনয়কে যেন ঘিরে ধরতে থাকে।

এখানকার চত্বরটা হাসপাতালের চত্বরের মতো একই মাপের। তবে ওদিকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু এখানে বড় বড় ঘাস আর আগাছা জন্মেছে প্রচুর। এক কোণে ক'টা বেজি বেশ গুছিয়ে ঘর-সংসার পেতেছিল। হঠাৎ উটকো, অবাঞ্ছিত দু'টো লোককে দেখে তুমুল হইচই বাধিয়ে ছোটাছুটি করতে করতে তাদের অসন্তোষ জানাতে থাকে।

চত্বরের এক কোণে বিনয়কে নিয়ে যেতে যেতে শেখরনাথ বললেন, 'এখানেও তেলের ঘানির জন্য বড় শেড ছিল। ইংরেজরা যাবার আগে ভেঙে দিয়ে গেছে। পরে এই নিয়ে হুলস্থূল বাধে তাই বহু কুকীর্তির চিহ্ন লোপাট করে দিয়েছে। কিন্তু তারপরও যা যা পাওয়া গেছে তাতে ভারতের মেনল্যান্ডের মানুষ শিউরে উঠেছে। সে যাক, এই যে ধারে—'

চত্বরের বাঁ প্রান্তে চারটে তেকোনা, ত্রিভুজের আকারের স্ট্যান্ড দাঁড় করানো রয়েছে। সামনের দিকে দু'টো লোহার মজবুত পায়া, পেছন দিকে একটা। প্রায় সাত আট ফিটের মতো উঁচু। পায়াগুলোতে সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় জং ধরে গেলেও এখনও বেশ শক্তপোক্তই আছে। সামনের অংশের প্রায় পুরোটা জুড়ে পুরু কাঠের পাটাতন আটকানো।

শেখরনাথ বললেন, 'এই হল টিকটিকি। এতে চড়িয়েই কয়েদিদের বেত মেরে শায়েস্তা করা হত।'

অবাক বিস্ময়ে স্ট্যান্ডগুলো দেখতে লাগল বিনয়।

শেখরনাথ কীভাবে বেতের বাড়ি মারা হত বিশদভাবে তা বুঝিয়ে দিলেন। কয়েদিকে উলঙ্গ করে পাটাতনে তার বুকটা ঠেসে হাতদুটো পেছনের লোহার পায়ার সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা হত, আর পা দু'টো বাঁধা হত স্ট্যান্ডের দুই পায়ার সঙ্গে যাতে কয়েদি নড়াচড়া করতে না পারে।

কখনও কখনও টিন্ডাল বা পেটি অফিসাররা বেত মারার মহান কর্তব্যটি পালন করত। তাছাড়া জেলর এটি করার জন্য অন্য পুরনো, ঘাগি কয়েদিদেরও কাজে লাগাত। কেননা রোজ কম করে তিরিশ চল্লিশ জনকে বেতানো হত। দু-চারজনের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী কারও বরাদ্দ দশ ঘা বেত, কারও পনেরো, কারও পঁচিশ। পঁচিশ অবধি পৌঁছবার আগেই বেশিরভাগ কয়েদি সেন্সলেস হয়ে যেত। তখন তার মাথায় জলটল দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে পিঠে ওষুধ লাগিয়ে তার সেলে পাঠিয়ে দেওয়া হত। এইভাবেই সেলুলার জেলে বিভীষিকার রাজত্ব চালিয়ে যেত।

শেখরনাথ বলতে লাগলেন, 'অত্যাচারের এটা হল সামান্য নমুনা। পরে যখন ব্লকে ব্লকে ঘুরে তোমাকে কুঠুরিগুলো দেখাব তখন আরও অনেক কিছু জানতে পারবে।'

বিনয় কী বলতে যাচ্ছিল, বলা হল না, নিজেকে সামলে নিল।

শেখরনাথ তাকে লক্ষ করছিলেন। কপাল কুঁচকে মজার একটা ভঙ্গি করলেন। বললেন, 'কী বলতে চাও—আমাকে টিকটিকিতে চড়ানো হয়েছিল কি না, তাই তো?'

বিনয় চুপ করে রইল।

শেখরনাথ বললেন, 'বার ছ'য়েক আমাকে তোলা হয়েছিল। সেলুলার জেলে আসব আর বেত খাব না, তাই কখনও হয়?' বলে পেছন ফিরে পাঞ্জাবিটা উঁচুতে তুলে পিঠটা দেখিয়ে দিলেন। সারা পিঠ জুড়ে অগুনতি আড়াআড়ি কালো কালো দাগ। গভীর ক্ষত শুকিয়ে গেলে যেমন হয় সেইরকম।

স্বাধীনতা সংগ্রামীকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এসে কী অসহনীয় নির্যাতন সইতে হয়েছে তার একটি ঝলক দেখে শিউরে ওঠে বিনয়।

এইসময় দূর থেকে কেউ ডেকে ওঠে, 'ভাইসাব, ভাইসাব—'

ছয়

শেখরনাথ ঘুরে দাঁড়ালেন। বিনয়ও। একটা লম্বা-চওড়া লোক—শেখরনাথের চেয়ে ছোটই হবে, ষাটের নিচে বয়স, কাঁচাপাকা চুল চামড়া ঘেঁষে ছোট ছোট করে ছাঁটা, তামাটে রং, এই বয়সেও বেশ তাগড়াই, পরনে ঢোলা ফুলপ্যান্ট আর হাফহাতা শার্ট, পায়ে পুরু সোলের চপ্পল, হাতে কালো কারে বাঁধা গুচ্ছের তাবিজ আর মাদুলি—বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে আসছে।

শেখরনাথ তাকে দেখে খুশিই হলেন। গলার স্বর উঁচুতে তুলে বললেন, 'আরে বৈজু, তুই? এখানে?'

লোকটা অর্থাৎ বৈজু ততক্ষণে কাছে চলে এসেছে। এবার তাকে আরও স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। গোলাকার সরল মুখ, পুরু ঠোঁট, ওপরের মাড়িটা একটু উঁচু তাই কয়েকটা দাঁত সবসময় বেরিয়ে থাকে। বলল, 'হ্যাঁ ভাইসাব।' বলে ঝুঁকে ভক্তিভরে শেখরনাথের পা ছুঁয়ে হাতটা মাথায় ঠেকাল।

'তুই আমার খবর পেলি কী করে?'

বৈজু জানায়, কিছুক্ষণ আগে রাহা সাব অর্থাৎ বিশ্বজিৎ রাহার

pathagar.net

banglabooks.in

সঙ্গে আদালতের কাছে তার দেখা হয়েছিল। তিনি জানিয়েছেন, জেফ্রি পয়েন্টের নতুন রিফিউজি সেটলমেন্টে জারোয়ারা একজন উদ্বাস্তুকে তির মেরেছে; বেহুঁশ অবস্থায় তাকে নিয়ে শেখরনাথ পোর্ট ব্লেয়ারে এসেছেন। লোকটাকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। হাসপাতালে এলে শেখরনাথের সঙ্গে দেখা হবে। তাই দৌড়তে দৌড়তে সে চলে এসেছে। অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও দেখা না পেয়ে কী ভেবে এধারে আসতেই শেখরনাথের দেখা পায়।

বৈজু বলল, 'বহোৎ রোজ বাদ আপনার সাথ দেখা হল। তবিয়ৎ ঠিক হ্যায় তো ভাইসাব?'

শেখরনাথ আস্তে মাথা নাড়লেন। তাঁর শরীর স্বাস্থ্য ঠিকই আছে।

বৈজু বলতে লাগল, 'দেখা হবে কী করে? আপনি ক'রোজ আর পোর্ট ব্লেয়ারে থাকেন? জাজিরায় জাজিরায় (দ্বীপে দ্বীপে) ঘুরে বেড়ান। এখন রিফিউজিদের নিয়ে পড়েছেন। পচাশ ষাট 'মিল' দূরে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে নয়া নয়া সেটলমেন্ট দেখছেন। আপনার সব খবর কানে আসে।

শেখরনাথের মুখে হালকা হাসি লেগেই ছিল। বললেন, 'জেল থেকে বেকার হয়ে পড়েছি। কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে তো। সময় কাটবে কী করে?'

পোর্ট ব্লেয়ারে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বিনয় একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে। সবাই এখানে হিন্দি-উর্দু মেশানো ভাষায় কথা বলে। বাঙালি ছাড়া অন্যদের সঙ্গে শেখরনাথ এবং বিশ্বজিৎ ওই ভাষাটাই বলে থাকেন। বিনয় শুনেছে, আঠারোশো সাতান্নয় 'মিউটিনি'র পর যে বিদ্রোহী সিপাহিদের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল তাদের শতকরা নব্বই ভাগই উত্তরপ্রদেশের লোক। ওদের ভাষাটাই পরে এখানে চালু হয়ে যায়। বর্মী হোক, কারেন হোক, শিখ, পাঠান বা মারাঠি—যারাই মিউটিনির পরবর্তীকালে কালাপানির সাজা খাটতে এসেছিল তাদের মুখের বুলি ওটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বৈজু বলল, 'সময় কাটানোর জন্যে নয়, মানুষকে আপনি প্যার করেন, তাই তাদের কোনও তখলিফ হলে পাশে গিয়ে দাঁড়ান। সময় কেটে যায়।'

শেখরনাথ উত্তর দিলেন না।

একটু চুপচাপ।

তারপর বৈজু বলল, 'আপনার দেখা যখন পেয়েছি তখন আর ছাড়ছি না। পুরো দো সাল আমাদের কোঠিতে যাননি। কবে আসবেন বলুন—'

শেখরনাথ বললেন, 'তুই তো জেনেই গেছিস, একজন রিফিউজিকে নিয়ে হাসপাতালে এসেছি। বিপদ অনেকটা কেটে এসেছে। তবু আরও কয়েকটা দিন তাকে হাসপাতালে থাকতে হবে। যতদিন না সে পুরো সুস্থ হয়ে উঠছে, কোথাও যেতে পারব না।'

'ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায়। ভালো হয়ে উঠলেই যাবেন। সোমবারী আপনার কথা দো-এক রোজ পরপরই বলে। বলে, আপনি আমাদের বিলকুল ভুলে গেছেন।'

একটু ভেবে শেখরনাথ বললেন, 'জেফ্রি পয়েন্টে ফেরার আগে তোদের ওখানে একবার নিশ্চয়ই যাব। সোমবারীকে বলে দিস। সে ভালো আছে তো?'

'হ্যাঁ। ভগোয়ান রামজি কিষুণজির কিরপায় (কৃপায়) আচ্ছাই হ্যায়।' বৈজু বলল, 'আমি তা হলে এখন চলি ভাইসাব। এবারডিন মার্কিটে কিছু কেনাকাটা করতে হবে। ঘরে চাল ডাল ফুরিয়ে এসেছে।'

'আচ্ছা, যা—'

এতক্ষণ শেখরনাথের সঙ্গেই কথা বলে গেছে বৈজু। তাঁর পাশে যে বিনয় দাঁড়িয়ে আছে, সেভাবে খেয়ালই করেনি। পা বাড়াতে গিয়ে তার চোখ এসে পড়ল বিনয়ের ওপর। বলল, 'এই বাবুসাবকে তো পহ্চানতে পারলাম না। নয়া মালুম হচ্ছে।' আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের লোকজন প্রায় সবাই সবাইকে চেনে। বিনয়কে সে আগে কখনও দেখেনি, তাই এই কৌতূহল।

শেখরনাথ বললেন, 'ও আমার ভাতিজা (ভাইপো) বলতে পারিস।' কলকাতায় থাকে। ওখানে আখবরে কাজ করে। পত্রকার। আন্দামানের নয়া সেটলমেন্ট আর পুরনো পেনাল কলোনি দেখতে এসেছে। এসব নিয়ে ওদের কাগজে লিখবে।'

শেখরনাথ তাকে ভাইপো বলে পরিচয় দিয়েছেন, তার মানে খুব কাছে টেনে নিয়েছেন। এটা বিনয়ের পক্ষে বিরাট এক মর্যাদা। বুকের ভেতরটা আবেগে যেন উথালপাতাল হতে লাগল।

একে পত্রকার অর্থাৎ সাংবাদিক, তার ওপর শেখরনাথের ভাইপো। সসম্ভ্রমে বৈজু কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, 'নমস্তে বাবুসাব। আপনি কত রোজ আন্দামানে থাকবেন?'

বিনয় প্রতি-নমস্কার করে জানায়, বেশ কিছুদিন তাকে থাকতে হবে। জঙ্গল নির্মূল করে উদ্বাস্তুদের যেসব নয়া বসত গড়ে উঠছে, সেগুলো তো আছেই, যে কয়েদিরা একদিন কালাপানির মেয়াদ খাটতে এসেছিল সারা ভারতবর্ষ এবং বার্মা থেকে দীর্ঘ বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে, এখানকার বড় বড় দ্বীপগুলোতে ঘুরে তাদের কলোনিগুলো দেখতে তো সময় লাগবেই।

বৈজুর চোখ আবার শেখরনাথের দিকে ঘুরে গিয়েছিল। সে তাঁকে বলল, 'ভাইসাব যেদিন আমাদের কোঠিতে যাবেন, ভাতিজাকেও নিয়ে যাবেন। আমরা বহোৎ খুশ হব।'

আস্তে মাথা নাড়লেন শেখরনাথ। বিনয়কে অবশ্যই নিয়ে যাবেন।

বৈজু আর দাঁড়াল না; যেমন লম্বা লম্বা পা ফেলে এসেছিল হুবহু সেইভাবেই চলে গেল।

লোকটাকে বেশ ভালো লেগে গিয়েছিল বিনয়ের। ভারী বিনয়ী। নম্র ব্যবহার, কথাবার্তা চমৎকার। শেখরনাথকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। সেটা অবশ্য এই দ্বীপপুঞ্জের সবাই করে থাকে। নিজের চোখে তা দেখেছে বিনয়।

শেখরনাথ বিনয়কে জিগ্যেস করলেন, 'বৈজুকে কেমন মনে হল তোমার?'

যা মনে হয়েছে, অকপটে জানিয়ে দিল বিনয়।

শেখরনাথ একটু হাসলেন।—'অথচ জানো, বৈজু একসময় ড্রেডেড ক্রিমিনাল ছিল। আমি যে বছর সেলুলার জেলে আসি সেই বছর তিন তিনটে মার্ডার করে একই দিনে সেও এসেছিল। এমনকী খিদিরপুর থেকে একই জাহাজে। এস এস মহারাজা। তাকে রাখা হয়েছিল আমার ঠিক পাশের সেলে।'

বিনয় অবাক। বৈজুর মতো সরল ভালোমানুষ তিন তিনটে মার্ডার করতে পারে, এ যেন ভাবাই যায় না। সে জিগ্যেস করে, 'খুন করেছিল কেন?'

'তা জানি না। আন্দামানে যেসব এক্স-কনভিক্ট দেখতে পাবে, তাদের সবার গায়ে দু-চারটে মার্ডারের হিস্ট্রি জুড়ে আছে। কে কী কারণে খুন করেছে তা জানা একটা পুরো জীবনেও সম্ভব হবে না।'

বৈজু সম্বন্ধে ভীষণ আগ্রহ বোধ করছিল বিনয়। কয়েকদিন আগে জেফ্রি পয়েন্টে একজন রিফিউজি সৃষ্টিধরের দশ মাসের পোয়াতি বউ যখন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, যে কোনও সময় তার পেট থেকে বাচ্চা বেরিয়ে আসতে পারে—দাইয়ের খোঁজে তিনটে পাহাড় পেরিয়ে অন্য একটা রিফিউজি সেটলমেন্টে শেখরনাথের সঙ্গে বিনয়ও গিয়েছিল। পথে পড়েছিল ব্রিটিশ আমলের একটা পেনাল কলোনি। সেখানে রঘুবীর আর তার স্ত্রী মা ফুনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন শেখরনাথ। একদিন রঘুবীররাও দ্বীপান্তরী সাজা মাথায় নিয়ে আন্দামানে এসেছে।

pathagar.n

banglabooks.in

কিন্তু শরীরে যে অপরাধের রক্তধারা বইত তা কবেই শোধন হয়ে গেছে। এখন তারা পরিপূর্ণ সংসারী মানুষ। সুখী গৃহস্থ। এই দ্বীপে বছরের পর বছর কাটিয়ে জীবন থেকে ভয়ংকর, গ্লানিকর অতীতকে ওরা মুছে দিয়েছে। বিনয় ঠিক করেছিল পেনাল কলোনি সম্পর্কে জানতে ওদের কাছে চলে যাবে। কিন্তু কবে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ফিরে সেখানে যাওয়া সম্ভব হবে, জানা নেই। হাতের কাছে যখন বৈজুকে পাওয়া গেছে, সুযোগটা কোনও ভাবেই ছাড়বে না সে। শেখরনাথের সঙ্গে তাদের কোঠিতে চলে যাবে। তার খুব কৌতূহল হচ্ছিল রঘুবীর কীভাবে মা ফুনকে বা বৈজু কীভাবে সোমবারীকে বিয়ে করেছিল, তা জানতেই হবে। মেনল্যান্ড থেকে অন্ট ন'শো মাইল দূরে বহু বছর আগে তাদের যৌবনে বৈজু কোন পদ্ধতিতে তাদের স্ত্রীদের জোগাড় করেছিল সেটা বিনয়ের কাছে মস্ত ধাঁধা।

শেখরনাথ বললেন, 'চল, ডানপাশের ব্লকটায় ঢোকা যাক। এখানেই আমার জীবনের অনেকগুলো বছর কেটে গেছে।'

আগাছা আর বুনো ঘাসে ভরা মস্ত চত্বরটা। পাঁচটা পাথরের সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলেন শেখরনাথরা। হাসপাতালের ব্লকটার মতো এটাও অবিকল একই রকমের। একতলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি সারি সারি কুঠুরি বা সেল। প্রতিটি সেলের সামনে লোহার মোটা মোটা শিক বসানো নিচু দরজা। দরজাগুলোতে মস্ত মস্ত মজবুত তালা ঝুলছে। প্রতিটি সেল সাত ফিটের মতো লম্বা, চওড়া ছ'ফিটের বেশি হবে না। সামনে দরজা, পেছনে ঘুলঘুলির চেয়ে সামান্য বড় জানলা; সেগুলোতেও মোটা শিক গেঁথে দেওয়া। সেলগুলোর সামনে দিয়ে চওড়া, টানা বারান্দা চলে গেছে। বারান্দার একপাশে সেল, অন্যপাশে রেলিং। পঁচিশ-তিরিশ ফিট পর পর ওপরে ওঠা বা নিচের চত্বরে নামার জন্য সিঁড়ি।

সুবিশাল তিনতলা ব্লকটা একেবারে নিঝুম। কেউ কোথাও নেই। যে ব্লকটায় হাসপাতাল সেখানে একটা বেডও খালি নেই। সব বেডেই পেশেন্ট। তাছাড়া ডাক্তার, নার্স, ক্লাস-ফোর স্টাফের কর্মী এবং রোগীদের ভিজিটরে সর্বক্ষণ এলাকাটা গমগম করে। কিন্তু এই পরিত্যক্ত ব্লকটা এত নির্জন, এত স্তব্ধ যে গা ছম ছম করে।

দীর্ঘ বারান্দা দিয়ে বিনয়কে পাশে নিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে দূরে আট-দশ তলা হাইটের উঁচু ওয়াচ টাওয়ার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিলেন শেখরনাথ। বললেন, 'ওটা একবার লক্ষ কর।'

ওয়াচ টাওয়ার আগেও চোখে পড়েছে বিনয়ের। তবু সেদিকে তাকাল সে। টাওয়ারটা মাঝখানে রেখে একসময় সেটার গা থেকে জেলখানার সাতটা তিনতলা উইং সাতদিকে সামান্য কোনাকুনি বেরিয়ে গেছে। সাতটার সবগুলোই টিকে নেই। জাপানি বোমায় একটা ভেঙে গিয়েছিল; একটা ভূমিকম্পে শেষ।

শেখরনাথ বললেন, 'ওই উঁচু ওয়াচ টাওয়ারটার একটা স্পেশাল ব্যাপার আছে।'

'কী ব্যাপার?' বিনয় উৎসুক হল।

'ওটার টপ ফ্লোর থেকে জেলখানার প্রায় প্রত্যেকটা সেল দেখা যায়। ইংরেজরা আর্কিটেকচারটা কেমন আটঘাট বেঁধে তৈরি করেছিল ভেবে দেখ। ব্রিটিশ পুলিশ অফিসাররা পালা করে টাওয়ারটা থেকে দিনরাত কয়েদিদের ওপর নজরদারি করত। কেউ কোনও মতলব আঁটছে কি না সেটা বুঝতে চেষ্টা করত। তাছাড়া প্রতিটি ব্লকের সামনের খোলা চত্বরে অন্য সেন্ট্রিরা তো ছিলই। তাদের কেউ কেউ ব্রিটিশ, তবে বেশিরভাগই ইন্ডিয়ান।

বারান্দায় শেখরনাথ আর বিনয়ের পায়ের আওয়াজ ছাড়া কোথাও বিশেষ শব্দ নেই। তবে সামনের খোলা চত্বরের ঘাসবন আর আগাছার জঙ্গল থেকে ঝিঁঝিদের একটানা কনসার্ট উঠে আসছে; মাঝে মাঝে কোনও গাছের ডালে কাঠঠোকরারা ধারালো ঠোঁটে সমানে তুরপুন চালাচ্ছে। ঠক ঠক ঠক ঠক।

বিনয় বলল, 'মাঝখানে উঁচু টাওয়ারটা থেকে পাহারাদারির কথাটা আমি দু-একটা বইয়ে পড়েছি।'

শেখরনাথ বললেন, 'তাছাড়া, একতলা থেকে তেতলা অব্দি প্রতিটি ফ্লোরের বারান্দায় টহল দিত টিন্ডাল আর পেটি অফিসাররা। তাদেরও একটা বড় কাজ ছিল কয়েদিদের ওপর নজর রাখা। ব্রিটিশ কি ইন্ডিয়ান সেন্ট্রিদের তুলনায় এরা ছিল আরও মারাত্মক। পরে তাদের মহিমা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।'

বিনয় জিগ্যেস করল, 'টিন্ডাল আর পেটি অফিসার কাদের বলা হত? নজরদারি ছাড়া তাদের কী কাজ ছিল?'

শেখরনাথ জানালেন, পুরনো সাংঘাতিক কয়েদিদের ভেতর এদের বাছাই করে নেওয়া হত। যে যত ভয়াবহ বাছাইয়ের ব্যাপারে তাদের প্রেফারেন্স ছিল বেশি। এদের শতকরা নব্বই জন পাঠান কি জাঠ। এদের মতো নিষ্ঠুর অত্যাচারী ভূ-ভারতে খুব কমই জন্মেছে। নতুন কয়েদিদের মধ্যে কেউ জেলের নিয়ম একচুল ভাঙলে ওদের দিয়ে প্রচণ্ড নির্যাতন চালানো হত। পেটি অফিসারদের মাইনে ছিল এক টাকা থেকে দেড় টাকা, টিন্ডালদের বারো থেকে চোদ্দো আনা। এর জন্যে তারা না পারত এমন অপকর্ম নেই। এইসব সাক্ষাৎ শয়তানের অবতারদের একমাত্র কাজ ছিল পদে পদে কয়েদিদের খুঁত ধরা। এতটুকু এদিক ওদিক চোখে পড়লে টিকটিকিতে চড়িয়ে বেতের বাড়ি। অবশ্য ব্রিটিশ ডেপুটি জেলারকে কার কতটা অপরাধ হয়েছে তার ফিরিস্তি দিতে হত। অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী কাকে কত ঘা বেতের বাড়ি বরাদ্দ করা হবে সেটা ঠিক করে দিত ওই ডেপুটি জেলার। তাছাড়া আরও নানারকম শাস্তির ব্যবস্থাও ছিল।

তালাবন্ধ সেলগুলোর পাশ দিয়ে যেতে যেতে বিনয় বলল, 'কাকা, জেফ্রি পয়েন্টে আপনি একদিন বলেছিলেন নাইনটিন টোয়েন্টি এইট আপনি সেলুলার জেলে এসেছিলেন।'

'হ্যাঁ, বলেছিলাম তো। তোমার কি এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন আছে?' চলার গতি থামাননি শেখরনাথ। বিনয়ের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে জিগ্যেস করলেন শেখরনাথ।

বিনয় বলল, 'প্রশ্ন ঠিক না, কৌতূহল।'

'বল, কী জানতে চাও—'

'কত বছর এখানে কাটিয়েছেন?'

'উনিশ বছর। নাইনটিন টোয়েন্টি এইট থেকে ফর্টি সেভেন। দেশ স্বাধীন হবার পর মুক্তি পেয়েছিলাম।'

'যতদিন এখানে ছিলেন কীভাবে দিনগুলো কেটেছে, জেলখানার তখনকার পরিস্থিতি কেমন ছিল, কয়েদিরা বা জেলের কর্তারা আপনাদের মতো রাজবন্দি রেভোলিউশনারিদের কীরকম ব্যবহার করত, জানতে ইচ্ছা করে।'

একটু চুপ করে রইলেন শেখরনাথ। তারপর একটু হেসে বললেন, 'শোনার যখন এত আগ্রহ, বলছি। তুমি তো 'স্টিমলিপ মহারাজা'য় রিফিউজিদের সঙ্গে আন্দামানে এসেছ।'

'হ্যাঁ—'

'ওই জাহাজটা এই রুটে বহু বছর ধরে চলাচল করছে। আমিও ওই 'মহারাজা'তেই আরও দু'জন বিপ্লবীর— ইংরেজ গভর্নমেন্টের ভাটায় 'টেরোরিস্ট'— সঙ্গে কালাপানির সাজা নিয়ে এসেছিলাম। ওই জাহাজে একশো পঞ্চাশ জন খুনি ডাকাতকেও দ্বীপান্তরী পানিশমেন্ট খাটতে পাঠানো হয়েছিল। ইংরেজদের চোখে টেরোরিস্টরা অন্য সব ক্রিমিনালদের চেয়েও অনেক বেশি ভয়ংকর। অনেক বেশি বিপজ্জনক। আমাদের তিনজনকে রাখা হয়েছিল দোতলার ডেকে তিনটে পাশাপাশি কেবিনে। দরজার সামনে রাইফেল হাতে ইংরেজ সার্জেন্ট। রাতদিন পালা করে তিন শিফটে আমাদের পাহারা দিত। আমাদের পায়ে কিন্তু ডান্ডাবেড়ি লাগানো থাকত। ভাবো তো, হুগলি নদী পেরিয়ে, স্যান্ডহেড

pathagar.n

banglabooks.in

পেছনে ফেলে 'বে অফ বেঙ্গল'-এ জাহাজ আসার পর কেবিনের দরজা জানলা হাট করে খুলে দিয়ে পাহারা তুলে নিলেও পালাব কোথায়? মুক্তির একমাত্র উপায় তো পায়ে বেড়ি নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়া। কিন্তু সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে হাঙর ঘুরে বেড়াচ্ছে। না, হাঙরেরা আমাদের নিয়ে ভোজসভা বসাক, এটা কি মেনে নেওয়া যায়? পৈতৃক প্রাণটা এভাবে খোয়াতে কেউ রাজি ছিলাম না। সে যাক গে আমাদের কেবিনের ধারেকাছে অন্য কয়েদিদের ঘেঁষতে দেওয়া হত না। তাদের রাখা হয়েছিল লোয়ার ডেকের তলায় জাহাজের খোলের ভেতর। সেখান থেকে ওদের উঠে আসতে দেওয়া হত না। আমাদের কাছাকাছি এলে যদি ওই কয়েদিদের রক্তে বিপ্লবের বিষ ঢুকে যায়— এমনটাই ছিল ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ভয়। বোঝো, পায়ে লোহার বেড়ি নিয়ে তিন নিরস্ত্র যুবক ইংরেজদের কাছে কতটা ভয়ংকর ছিলাম। শুনলে হাসি পায় না?'

'সেটা ছিল খুব সম্ভব অক্টোবর মাস। মনসুনের দাপট আর নেই। পুজো শেষ হয়েছে তার কয়েকদিন আগে। সমুদ্র শান্ত থাকার কথা। কিন্তু বে অফ বেঙ্গল আর বে অফ বিস্কে সৃষ্টিছাড়া সমুদ্র। মনসুনই হোক বা বছরের অন্য যে কোনও সময়ই হোক, কখন যে খেপে উঠবে, আগে তার আঁচ পাওয়া যায় না। খিদিরপুর থেকে জাহাজ ছাড়ার পরের দিন বিকেলের দিকে উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে হঠাৎ কালো কালো পাহাড়ের মতো মেঘ ধেয়ে এসে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলল। বঙ্গোপসাগর চোখের পলকে উন্মাদ হয়ে উঠেছে। তার ঘাড়ে যেন লক্ষ কোটি অশরীরী জিন কয়েদিদের ভর করেছে। পারাপারহীন, খোলা সমুদ্রের ওপর দিয়ে প্রায় একশো মাইল বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে লাগল। আট দশ মাইল জুড়ে ঢেউয়ের পর ঢেউ দেড়শো দু'শো ফিট উঁচু হয়ে মোচার খোলার মতো 'মহারাজা' জাহাজটাকে একবার মহাশূন্যে তুলে পরক্ষণে পাতালে আছড়ে ফেলছে। ঝড়ের সঙ্গে শুরু হয়েছে তুমুল বৃষ্টি। বৃষ্টির ঝাপটা তো আছেই, সেই সঙ্গে ঢেউগুলো প্রবল আক্রোশে একতলা দোতলা তেতলার ডেকের ওপর দিয়ে সাঁই সাঁই আওয়াজ করে বয়ে যাচ্ছে। শরৎচন্দ্রের লেখায় সাইক্লোনের কথা পড়েছি। সেটা যে কতখানি ভয়ংকর, সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম।

'মনে হয়েছিল, আমাদের অদৃষ্টে আর সেলুলার জেলে বাকি জীবন কাটাবার সৌভাগ্য হবে না। তার আগেই অত বড় দশ বারো টনের বিশাল জাহাজটা কয়েদি এবং জাহাজের ক্যাপ্টেন, ছোট বড় নানা অফিসার এবং কয়েক ডজন লস্করসুদ্ধ জলের তলায় ডুবে যাবে। যদি তাই হত, একরকম বেঁচে যেতাম। কিন্তু কপালে উনিশ বছর সেলুলার জেলের নরকযন্ত্রণা লেখা আছে, সেটা খণ্ডাবে কে?

অফুরান আগ্রহে শুনে যাচ্ছিল বিনয়। বলল, 'আমি যখন আসি তখনও সমুদ্রে সাইক্লোন হয়েছিল। সেটা কিন্তু মনসুনের সময় নয়।'

শেখরনাথ বললেন, 'এটাই বে অফ বেঙ্গলের ক্যারেক্টার তার মতিগতি বোঝা ভার। কখন যে কী করে বসবে তার ঠিক ঠিকানা নেই। তারপর শোন। আগে দু'চারবার লঞ্চে যে চড়িনি তা নয়। কিন্তু সেগুলো চলত নদীর ওপর দিয়ে। মাত্র দু-এক ঘণ্টার ব্যাপার। জাহাজে সমুদ্রযাত্রা আমার সেই প্রথম। সাইক্লোনের মধ্যে পড়াও প্রথম। কেবিনের পুরু কাচের জানলা জাহাজের গায়ে শক্ত করে ঠেসে আটকানো ছিল। সেটা দিয়ে বাইরে তাকিয়েই ছিলাম। কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অন্ধকার। যেন কালো পিচে ঢাকা। এদিকে রোলিং আর পিচিংও শুরু হয়েছে। জাহাজের ক্যাপ্টেন, অফিসার আর লস্কররা ছিল এক্সপার্ট। এবং দুঃসাহসীও। সাইক্লোনের মুখে কী করতে হয় তারা জানে। বিশাল বিশাল ঢেউ কাটিয়ে কাটিয়ে কখনও ওপরে উঠে, কখনও নিচে নেমে জাহাজ এগিয়েই চলছিল। কোন দিকে যাচ্ছে কিছুই

রানা রক্ষিত পরিচালিত
কলিকাতার সুবিখ্যাত- রক্ষিত স্পেশ্যাল
১নং আর.এন.মুখার্জ্জী রোড, (মার্টিন বার্ন বিল্ডিং) কলি-১
২০১১-১২ বর্ষের ভ্রমন সূচী
শ্রী শ্রী বৈষ্ণদেবী সহ ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর, ভূটান, ডুয়ার্স ও ভূটান, অরুণাচল প্রদেশসহ কাজিরাঙা, শ্রী শ্রী দ্বারকাধাম রাজস্থান গুজরাট, শ্রী শ্রী রামেশ্বর ধাম-কন্যাকুমারী সহ দক্ষিণ ভারত, সমগ্র কেরালা, হায়দ্রাবাদ সহ উটী-মহীশূর-ব্যাঙ্গালোর, গোয়া-মহারাষ্ট্র, উত্তর ভারত, সমগ্র মধ্যপ্রদেশ, আন্দামান।
এছাড়াও বিশদ জানতে- (০৩৩) ২২৩১-৯০৬৫/০৯৬৭
আপনার কোন না কোন প্রতিবেশীর কাছেই আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

The best address on the beach Ph. (06782) 270025/226/381
HOTEL SHUBHAM
CHANDIPUR-ON-SEA, BALASORE-756025
Modern A.C. & Non-A.C. Double bedrooms with Intercom and family rooms in ground floor, Car parking, Children's park, Aquaguard cold water, Hot water, Cable Channels, Laundry Service.
MODERN & ELEGANT A.C. CONFERENCE HALL
SWAGAT : THE ONE & ONLY A.C. RESTAURANT
Contact directly with hotel or Kolkata : Gariahat - 2440-7178, Journeyy Mart-9830252843, Garia-24363006, Phulbagan-23200251, SaltLake-23372073, Jessore Rd-25297473, Holiday Makers-24733505
www.hotelshubham.com CREDIT CARD ACCEPTED

পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখে
ALPHA
Hygienic Products
হার্বাল ফ্লোর ক্লিনার ও
আলফা ব্ল্যাক ফিনাইল
জি. ডি. কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ
চন্দননগর, হুগলী
ফোন ঃ ২৬৮৩ ৩৮৪৫/৬৩৩৪
ডিলার/ডিস্ট্রিবিউটরের জন্য যোগাযোগ করুন

বাড়ির পাম্পকে অটোমেটিক করাতে আজই লাগান-
WATCHMAN
সঙ্গে বাঁচান বিদ্যুৎ, জল, সময় ও টাকা
আনন্দম
পিপুলপাতি, হুগলী
Mob: 9830109449/9339734266
www.watchman.co.in

banglabooks.in

বোঝা যাচ্ছিল না। ভেবেছিলাম যে কোনও মুহূর্তে সলিল সমাধি ঘটে যাবে। মৃত্যু একেবারে অবধারিত। কিন্তু টের পাচ্ছিলাম বেঁচে আছি, বেঁচে আছি।

'আন্দাজ ছ'সাত ঘণ্টা পর সাইক্লোনের তাণ্ডব কমে এল। সমুদ্র শান্ত হয়ে আসছে। উথালপাতাল ঢেউয়ে জাহাজের তুমুল দোলানিতে হাড়গোড় বোধহয় আস্ত ছিল না। কখন নির্জীব হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। ঘুম ভেঙে ছিল পরদিন সকালে। বঙ্গোপসাগর তখন ভারী শান্ত। আগের দিনের বিকেল থেকে কয়েকটা ঘণ্টা সেটা যে অলৌকিক এক মহাদানব হয়ে উঠেছিল, বোঝাই যায় না। গ্রামের কোনও নিরীহ জলাশয়ের মতো দিগন্ত জুড়ে সেটা পড়ে আছে। দিনের প্রথম নরম সোনালি রোদ ছোট ছোট ঢেউগুলোর ওপর ঝিলমিল করছে।

শুনতে শুনতে বিনয় অবাক। কলকাতা থেকে আসার সময় এমন অভিজ্ঞতাই হয়েছিল তারও। সাইক্লোনের সময় সমুদ্র বুঝি বা এইভাবেই জাহাজের যাত্রীদের সঙ্গে একইরকম মশকরা করে থাকে। সে জিগ্যেস করল, 'তারপর কী হল কাকা?'

শেখরনাথ বলতে লাগলেন, 'ফোর্থ ডে বিকেলে আমরা পোর্ট ব্লেয়ার পৌঁছলাম। চ্যাথাম জেটিতে তখন কলকাতা কি মাদ্রাজের জাহাজ এসে ভিড়ত। কখনও কখনও রস আইল্যান্ডের জেটিতে। কিন্তু সেইসময় কী একটা অসুবিধা হওয়ায় 'মহারাজা জাহাজ রস বা চ্যাথামে ভেড়েনি। রস-এর উলটো দিকে সিসোস্ট্রেস বে'র এধারে যে জেটিটা রয়েছে সেখানে এসে নোঙর ফেলেছিল। তখন এই জেটিটা ছিল অনেক বড়।

বিনয়ের মনে পড়ল সে যখন রিফিউজিদের সঙ্গে আন্দামান আসে জাহাজ রস আইল্যান্ডে ভেড়ে। সেখান থেকে ছোট ছোট লঞ্চে তাদের তুলে কয়েকবারে সেসোস্ট্রেস বে'র এধারের জেটিতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল।

শেখরনাথ বলেছিলেন, 'সেই আটাশ সালে আমাদের তো জাহাজ থেকে নামানো হল। সঙ্গে অন্য কয়েদিদেরও। পায়ের বেড়ি অবশ্য খুলে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের অভ্যর্থনার জন্য অনেক আগে থেকেই প্রচুর আর্মড পুলিশ মোতায়েন ছিল। পুলিশে পুলিশে জেটির চারপাশ ছয়লাপ। তারা দুটো দলে ভাগ হয়ে একটা দল সাধারণ কয়েদিদের ঘিরে ফেলল। আমাদের তিনজন রেভোলিউসনারির জন্যে রাজকীয় বন্দোবস্ত। শ'দেড়েক সাধারণ কয়েদির জন্যে চল্লিশ জন পুলিশ এবং একজন ব্রিটিশ অফিসার। আমাদের তিনটি প্রাণীর জন্য বারোজন পুলিশ এবং তিনজন ইংরেজ অফিসার। কতখানি মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল ভেবে দেখ। অন্য কয়েদিদের দু'পাশে এবং পেছনে পুলিশ, সামনে অফিসার। আমাদেরও তাই। তবে একসঙ্গে অন্য কয়েদিদের সঙ্গে আমাদের আনা হয়নি। শোভাযাত্রা করে টিলার পর টিলা পেরিয়ে ওরা খানিকটা এগিয়ে যাবার পর, আমাদের যাত্রা শুরু হল।

আধঘণ্টার মতো হাঁটার পর আমরা সেলুলার জেলের গেটের সামনে চলে এলাম। বাংলাদেশে আরও দু-চারটে জেলে কিছুদিন থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কিন্তু ভয়ংকর চেহারার মজবুত লোহার ফটক আগে কখনও দেখিনি। তিরিশ-চল্লিশ জনের একটা পুলিশ বাহিনী সেখানে রাইফেল হাতে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। কঠোর, নিষ্ঠুর মুখ। মনে হয় পাথরে তৈরি। দু-চারজন ইংরেজ অফিসারও চোখে পড়ল। বিপ্লবীদের সঙ্গে জীবনমৃত্যুর মাঝখানের তফাতটা এক চুলও নয়, তবু এদের তদারকিতে বাকি জীবন কাটাতে হবে ভাবতেই বুকের ভেতরটা আমূল কেঁপে গেল। নির্মম দৃষ্টিতে তারা আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। মুখে একটা কথাও নেই। যে বাহিনীটা জেটি থেকে আমাদের নিয়ে এসেছিল, গেটের একজন অফিসার তাকে ভেতরে যাবার জন্যে হাত নেড়ে ইশারা করল।

'গেট পেরিয়ে সেলুলার জেলে পা রাখলাম। ভেতরে চত্বরে তখন অনেক পুরনো কয়েদি লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সবার গলায় কালো মোটা সুতোয় লোহার চৌকো ফলক ঝুলছে। দু' ইঞ্চির মতো লম্বা, দেড় ইঞ্চির মতো চওড়া, একই মাপের প্রতিটি ফলক। সেগুলোতে নম্বর খোদাই করা রয়েছে। এক, দুই, তিন, চার...। দাড়ি পাগড়ি দেখে কে শিখ, কে মুসলমান আন্দাজ করা যাচ্ছিল। মোঙ্গোলিয়ান মুখ দেখে বর্মি আর কারেনদের চিনতে পারছিলাম। অন্য সবাই কারা কোন প্রভিন্স থেকে এসেছে বোঝা যায়নি। তবে এদের সঙ্গে বাকি জীবন যখন কাটাতে হবে তখন নিশ্চয়ই চিনতে পারব। রাইফেল হাতে এক দঙ্গল পুলিশ কাছাকাছি দাঁড়িয়ে তাদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছিল। তিন-চারজন ইংরেজ অফিসারও রয়েছে। একজন কয়েদি, তার গলায় ফলকে লেখা 'পেটি অফিসার'—স্কুলে যেমন রোল কল করা হয় সেইভাবে হেঁকে যাচ্ছিল, 'সাত-আট-নে- দশ' সঙ্গে সঙ্গে ওই সব নম্বরধারী কয়েদিরা 'হাজির' বলেই লাইন থেকে বেরিয়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছিল। এই বিচিত্র রোল কলের কারণটা সেদিন বোধগম্য হয়নি, পরে বুঝতে পেরেছিলাম।

'আমাদের দেখে পুরনো কয়েদিদের মধ্যে তুমুল চাঞ্চল্য দেখা দিল। তারা হই হই করে উঠল, 'নয়া মেহমান আ গিয়া রে, নয়া মেহমান আ গিয়া—'

'কঁহাসে আয়া তুলোগ? বঙ্গালি, বিহারি, পাঠান, মারাঠি? কিতনা আদমিকো খতম কিয়া রে?

অর্থাৎ আমরা যারা সেলুলার জেলে প্রথম পা ফেললাম তারা ইন্ডিয়ার মেনল্যান্ডে কে ক'টা খুন করে এসেছি সেটাই তারা জানতে চাইছে। পরে জেনেছিলাম, যে যত বেশি হত্যা করেছে, কালাপানির এই জেলখানার বাসিন্দাদের চোখে তার কদর, তার কৌলীন্য অন্যদের তুলনায় শতগুণ বেশি।

এদিকে ইংরেজ অফিসাররা কোমরের খাপ থেকে পিস্তল বের করে কয়েদিদের দিকে তাক করে গর্জে উঠেছে, 'শাট আপ শালেলোগ—' পেটি অফিসার গলার স্বর আরও সাত পর্দা চড়িয়ে দিল। —'কুত্তাকা বাচ্চা, বিলকুল খামোস। মুহসে আওয়াজ নিকালে তো গলার নলিয়া ছিঁড়ে ফেলব।' তারপর পুরনো কয়েদিদের বাপ-মা চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করে একটানা কিছুক্ষণ বাছা বাছা খিস্তি চলল।

আমরা যারা নতুন আন্দামানে এলাম, জাহাজে এবং জাহাজ থেকে নামার পর যেমনটা করা হয়েছিল, জেলখানাতেও তার তফাত কিছু ঘটল না। অন্য কয়েদিদের পাহারা দিয়ে ডানপাশের অন্য একটা ব্লকের দিকে নিয়ে যাওয়া হল। আর আমাদের তিন বিপ্লবীকে পুলিশরা চারপাশ থেকে ঘিরে বাঁ-ধারের অন্য একটা ব্লকে আনাল। ইংরেজ গভর্নমেন্টের চোখে সশস্ত্র বিপ্লবীরা যে কতটা ভয়ংকর, কতখানি বিপজ্জনক, 'মহারাজা' জাহাজে ওঠার সময় থেকেই টের পেয়েছিলাম। কলকাতা থেকে আটশো মাইল দূরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন আন্দামান দ্বীপে এসে দেখা গেল, হাল একই। যতই পৃথিবী নামে গ্রহটির সবচেয়ে শক্তিধর জাতি হিসেবে ওরা দম্ভে ফেটে পড়ুক, ভারতীয় বিপ্লবীদের ওরা মনে মনে যমের মতো ভয় পায়।

আমাদের যে ব্লকটার সামনে নিয়ে আসা হল সেখানেও খোলা চত্বরে পুরনো কয়েদিদের লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে রোল কল করা হচ্ছিল। চেনা দৃশ্য। একটু আগেই এমনটা দেখে এসেছি। এই কয়েদিরা কিন্তু কোনও আগ্রহ দেখাল না। আমাদের দিকে নিস্পৃহ চোখে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল।

এধারের ব্লকটার পাশে একটা বড় দোতলা বিল্ডিং। সেটার চারপাশে রাইফেল হাতে পঁচিশ-তিরিশ জন সেন্ট্রি। এদের কেউ ভারতীয় নয়, সব ব্রিটিশ। পঁচিশ-তিরিশ হাত দূরে দূরে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

যারা পাহারা দিয়ে নিয়ে এসেছিল তাদের অপেক্ষা করতে

pathagar.net

banglabooks.in

বলে তিন ইংরেজ পুলিশ অফিসার আমাদের বলল, 'কাম অন—'

দোতলা বিল্ডিংটার গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলে ফুলের বাগান। মাঝখান দিয়ে সুরকির পথ সোজা বাড়িটায় গিয়ে থেমেছে। অফিসারদের সঙ্গে পথটা পেরিয়ে তিনটে স্টেপ ওপরে উঠতেই দেখা গেল চওড়া বারান্দা। সেটার একধার দিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। অফিসাররা আমাদের দোতলায় একটা ঘরের দরজার সামনে এনে দাঁড় করাল। দরজার পাশের দেওয়ালে পেতলের চকচকে মস্ত ফলকে লেখা: জেলর। সেলুলার জেল। পোর্ট ব্লেয়ার।

দরজায় দামি পর্দা ঝুলছিল। বাইরে থেকে একজন অফিসার সসম্ভ্রমে বলল, 'মে উই কাম ইন স্যার—'

ভারী গমগমে স্বর ভেসে এল। 'কাম ইন—'

পরদা ঠেলে তিন অফিসার আমাদের নিয়ে ভেতরে বুটে বুট ঠুকে স্যালুট করল।

কামরাটা বিশাল। ভারী ভারী ক্যাবিনেট দিয়ে সাজানো। সিলিং থেকে চার ব্লেডওয়ালা ফ্যান ঝুলছে। তাছাড়া হাতে টানা মস্ত পাখাও আছে। পুরো মেঝে জুড়ে দামি পার্সিয়ান কার্পেট। মাঝখানে মস্ত সেক্রেটারিয়েট গ্লাসটপ টেবিলের ওধারে গদিমোড়া হাতলওলা চেয়ারে যিনি বসে আছেন তাঁর দিকে তাকালে রক্ত হিম হয়ে যায়। বিপুল শরীরের ওপর বুলডগের মতো প্রকাণ্ড একটা মুণ্ডু ঠেসে বসিয়ে দিলে যেমন দেখায়, হুবহু সেই রকম। চোখের তারা দুটো বাদামি। ছড়ানো চৌকোনো চোয়াল। বাঘের থাবার মতো দুটো হাত। পুরু ঠোঁট।

টেবিলের এধারে কয়েকটা আরামদায়ক চেয়ার। সেগুলো আপাতত ফাঁকা। স্যালুটের জবাবে কোনওরকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। তিন অফিসারের দিকে ফিরেও তাকালেন না জেলর। তাঁর চোখ দুটো আমাদের মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে। এমন চাউনি আগে কখনও দেখিনি। মনে হচ্ছিল হাড়মাংস ভেদ করে আমাদের বুকের ভেতর অবধি দেখে নিচ্ছে।

চোখের পাতা পড়ছিল না লোকটার। আমাদের শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে অদ্ভুত এক কনকনে শিহরণ খেলে যাচ্ছিল। অনেকক্ষণ পর জেলর বললেন, 'ওয়েলকাম টু সেলুলার জেল। মনে রেখো, ইন্ডিয়ায় এর চেয়ে বড় নরক আর কোথাও নেই। এটা অ্যাবসোলিউটলি আমার রাজ্য। এখানে কোনওরকম বজ্জাতি আমি বরদাস্ত করি না।'

আমরা কোনও উত্তর দিলাম না।

জেলর বলতে লাগলেন, 'তোমাদের মতো টেররিস্টরা স্বাধীনতার খোয়াব ইন্ডিয়ার মেনল্যান্ডে ফেলে এখানে আসে।'

আমাদের মধ্যে চরম দুঃসাহসী ছিল রাজনাথ চক্রবর্তী। ফরিদপুরের ছেলে। একুশ-বাইশের বেশি বয়স হবে না। সে হঠাৎ বলে উঠল, 'আমরা টেররিস্ট নয়, ফ্রিডম ফাইটার।'

আমার সমস্ত অস্তিত্ব আমূল কেঁপে গিয়েছিল। আমরা কেউ ভীরু, কাপুরুষ নই। কিন্তু ওই হিংস্র বুলডগের মুখের ওপর কেউ ওভাবে বলতে পারে কল্পনা করতে পারিনি। চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ করলাম, জেলরের লাল মুখটা গনগনে হয়ে উঠেছে। বারুদের স্তূপে যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে রাজনাথ। সেই মুহূর্তে যেন বিস্ফোরণ ঘটে যাবে। আমার বুকের ধুকধুকুনি থেমে গিয়েছিল। কিন্তু না, তেমন কিছুই হল না। জেলর যেন বেশ আমোদই বোধ করলেন। চোখ ছোট করে ব্যঙ্গের সুরে বললেন, 'ফ্রিডম ফাইটার! তোমাকে কেউ বলেনি ইংরেজ রাজত্বে কোনও নেটিভের মুখ থেকে ফ্রিডম শব্দটা বেরুনো ক্রাইম!'

রাজনাথ চুপ করে থেকেছে, জবাব দেয়নি।

জেলর বলেই যাচ্ছিলেন, 'তোমার বয়স কম, এখনও তেজ একটু-আধটু থেকে গেছে। কালাপানি কী বস্তু তুমি জানো না। শান্তশিষ্ট হয়ে থাকলে কোনও সমস্যাই নেই। আনন্দে বাকি জীবনটা জেলখানার সেলে কাটিয়ে দাও।'

রাজনাথ পলকহীন জেলরের তাকানো, কথা বলার ভঙ্গি, থুতনি এবং ঠোঁটের নড়াচড়া লক্ষ করছিল। বলল, 'বাকি জীবন কাটানোর মতো ধৈর্য আমার নেই জেলর স্যার। তার

banglabooks.in

আগেই ইন্ডিয়া স্বাধীন হয়ে যাবে।'

জেলরের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। 'পৃথিবীজোড়া মহান ব্রিটিশ এম্পায়ারে কোনও কলোনি কোনওদিন স্বাধীন হয়নি; হবেও না। তুমি কেন, তোমার পর হানড্রেড জেনারেশন পার হয়ে গেলেও ইন্ডিয়া ইংল্যান্ডের বুটের তলায় থেকে যাবে। আগেও বলেছি, এখনও বলছি, গোলমাল পাকাবার চেষ্টা কোরো না।' আমাদের ডানপাশে যে ব্রিটিশ পুলিশ অফিসারটি দাঁড়িয়ে আছে তাকে বললেন, 'এই নোংরা পোকাগুলোকে নিয়ে যাও। দু-একদিনের মধ্যে সেলুলার জেলে যে তিনটি ফাঁসিঘর আছে ওদের দেখিয়ে দিও।' ফের তাঁর চোখজোড়া রাজনাথের দিকে ফিরে এল। — 'বুঝলে ছোকরা, এই জেলখানা তৈরি হবার পর তোমার মতো কয়েকশো বেয়াদপ কয়েদিকে এখানে ফাঁসিতে চড়ানো হয়েছে। বি কেয়ারফুল।' নাউ স্টিফেন গো—' বলে আঙুল তুলে দরজা দেখিয়ে দিল।'

প্রায় এক নিঃশ্বাসে পুরনো দিনের কথা বলতে বলতে একটু হাঁপিয়ে পড়েছিলেন শেখরনাথ। অফুরান কৌতূহল নিয়ে শুনে যাচ্ছিল বিনয়। উনিশশো আটাশ সালের সেলুলার জেলের টুকরো টুকরো ছবি অদৃশ্য সিনেমার পর্দায় যেন ফুটে উঠছিল। মোহনবাঁশির স্ত্রী ছেলেমেয়েদের এক নম্বর ব্লকে হাসপাতালের বারান্দায় বসিয়ে তারা নির্জন তিন নম্বর ব্লকে চলে এসেছিল। একতলার টানা বারান্দা ধরে দোতলার দিকে যেতে যেতে কখন যে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, খেয়াল নেই।

বিনয় বলল, 'তারপর?'

ফের শুরু করতে গিয়ে হঠাৎ আকাশের দিকে চোখ চলে গেল শেখরনাথের। সূর্য মাথার উপর উঠে এসেছে। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। তিন নম্বর এবং চার নম্বর ব্লকের ফাঁক দিয়ে সিসোস্ট্রেস উপসাগরের লম্বা একটা ফালি চোখে পড়ে। রোদে ঝলকাচ্ছে সমুদ্রের উঁচু উঁচু ঢেউগুলো। সেখান থেকে তীব্র ঝাঁঝ।

হঠাৎ শেখরনাথের মনে পড়ল, মোহনবাঁশির বউ ছেলেমেয়েদের দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁর নিজেরও খিদে পেয়েছে। নিশ্চয় বিনয়েরও। ব্যস্তভাবে বললেন, 'আজ আর না; খাবার কিনতে এবারডিন মার্কেটে যেতে হবে। কাল আবার এখানে আসব। তখন পুরনো দিনের আরও ইতিহাস শোনাব।'

বিনয় আর কিছু বলল না। সিঁড়ি দিয়ে নিচের চত্বরে নেমে হাসপাতালের দিকে এগিয়ে চলল।

সাত

পরদিন সকালে স্নানটান সেরে কিছু খেয়ে জ্যোৎস্না এবং তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে আবার হাসপাতাল।

আজ মোহনবাঁশি অনেকটা ভালো। নাক থেকে অক্সিজেনের নল সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে স্যালাইন চলছে। বিপদ প্রায় কেটেই গেছে।

ডাক্তার চট্টরাজ বললেন, পুরোপুরি চিন্তামুক্ত। হাসিমুখে শেখরনাথকে বললেন, 'কাকা, মোহনবাঁশি বেঁচে গেল। তবে পুরোপুরি সুস্থ হতে সময় লাগবে। আরও একটা উইক তাকে হাসপাতালে রাখব। তারপর ছুটি।'

শেখরনাথ বললেন, 'এক উইক কেন, যতদিন তাকে রাখা দরকার ততদিন থাকবে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই।'

'আজ দু-একটা কথা বলতে পারছে। ওর স্ত্রী ছেলেমেয়েরা নিশ্চয় এসেছে?'

'হ্যাঁ—'

'চলুন, ওদের সঙ্গে মোহনবাঁশির দেখা করিয়ে দিই। স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে পারলে তার দুশ্চিন্তা কাটবে।'

হ্যাঁ, চল—'

বিনয় নীরবে একটা চেয়ারে বসে ছিল। মোহনবাঁশি যমের ঘর থেকে ফিরে এসে কথা বলতে পারছে, এটা বিরাট সুখবর। তার বউ ছেলেমেয়েদের পক্ষে তো বটেই, আন্দামানের উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের পক্ষেও। লোকটা মরে গেলে জেফ্রি পয়েন্টের রিফিউজিদের সেই বিজন অরণ্যে ধরে রাখা যেত না। তারা কলকাতায় ফিরে যাবার জন্য তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে ছাড়ত। আর এই খবরটা কোনওভাবে কলকাতায় পৌঁছে গেলে সেখান থেকে আর উদ্বাস্তু আনা সম্ভব হত না। এত বড় একটা পরিকল্পনা, এত মানুষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেস্তে যেত। বিনয়ের কী ভালো যে লাগছিল। সে পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের সঙ্গে যেন সাতপাকে জড়িয়ে গেছে। এদের ভালো হলে তার অপার আনন্দ, এদের অনিষ্ট হলে সেটা যেন তার নিজস্ব ক্ষতি।

তেতলার কেবিনেই রাখা হয়েছিল মোহনবাঁশিকে। এ ক'দিন সে ছিল অচৈতন্য, চোখ বোজা। আজও আচ্ছন্নতার ঘোর পুরোপুরি কাটেনি। তবে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে।

জারোয়াদের তির মোহনবাঁশির বুকে বেঁধার পর থেকে জ্যোৎস্না যেন উন্মাদের মতো হয়ে গিয়েছিল। কখনও অঝোরে কাঁদত, কখনও বা নিঝুম বসে থাকত।

আজ মোহনবাঁশিকে তাকাতে দেখে বিপুল আবেগে আনন্দে জ্যোৎস্না তার উপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, সেই সঙ্গে সমানে ফুঁপিয়ে চলেছে। ডাক্তার চট্টরাজ তার দু'হাত ধরে ফেললেন, 'না, না, ওর কাছে যেও না; দূর থেকে একটু কথা বল—'

জ্যোৎস্নার চোখ বেয়ে অঝোরে জল ঝরছে। সে বলল, 'অহন কেমুন লাগতে আছে তুমার?'

নির্জীব, ভঙ্গুর একটু হাসি আবছাভাবে ফুটে ওঠে মোহনবাঁশির মুখে। —'ভালা। এই যাত্রা বাইচা গেলাম।'

ডাক্তার চট্টরাজ তাড়া দিলেন। —'দেখা হয়েছে, কথা বলেছ। আর নয়। সবাই নিচে চল—'

'আমারে হের কাছে আরেট্টু থাকতে দ্যান ডাক্তারবাবু। কতদিন মানুষটা কথা কইতে পারে নাই। বেহুঁশ হইয়া আছিল—' জ্যোৎস্না কাকুতি মিনতি করতে লাগল।

'না। বেশি কথা বললে মোহনবাঁশির ক্ষতি হবে। এখন চল। বিকেলে আবার তোমাদের ওর কাছে নিয়ে আসব।'

দোতলায় নেমে একবার জ্যোৎস্না ডাক্তার চট্টরাজের পায়ে পড়ে, একবার শেখরনাথের। এমনকী বিনয়ের পায়েও। সমানে অধীরভাবে বলে যেতে থাকে, 'আপনেরা ভগমান। মানুষটারে বাচাইয়া দিলেন। আপনেগো দয়া কুনুদিন ভুলুম না।' কৃতজ্ঞতা জানাতে একটি অশিক্ষিত, সরল রমণী আর কী-ই বা করতে পারে।

শেখরনাথ জ্যোৎস্নার মাথায়, পিঠে হাত বুলিয়ে সদয় কণ্ঠে বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। দেখলে তো মোহনবাঁশি আজ দু-চারটে কথা বলেছে। দেখবে ওবেলা আরও বেশিক্ষণ বলতে পারবে। সব ভয় কেটে গেছে। তোমরা শান্ত হয়ে এখানে বসে থাকো। আমরা একটু ঘুরে আসি। দুপুরে তোমাদের জন্য খাবার নিয়ে আসব।'

জ্যোৎস্না আস্তে মাথা হেলিয়ে দেয়। —'আইচ্ছা—'

শেখরনাথ এবার বিনয়ের দিকে তাকালেন। —'চল, তোমাকে নিয়ে তিন নম্বর ব্লকটায় যাওয়া যাক। কাল তোমাকে সেলুলার জেলে আমার অভিজ্ঞতার কথা সামান্য একটু শুনিয়েছিলাম। আজ তারপর থেকে কিছুটা শোনাব। এত বছরের এত অজস্র ঘটনা তো দু-একদিনে বলে শেষ করা যায় না। রোজ জেলখানা দেখাতে দেখাতে কিছু কিছু শুনিয়ে যাব। তাহলে ব্রিটিশ আমলের এই সেলুলার জেল, —যাকে বলা যায় ইস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের বাস্তিল—, সম্বন্ধে তোমার মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে

pathagar.net

banglabooks.in

যাবে।'

হাসপাতালের ব্লকটা পেছনে ফেলে শেখরনাথের সঙ্গে জনমানবহীন তিন নম্বর বিশাল বিল্ডিংটায় পৌঁছে গেল বিনয়।

সামনের আগাছায় ভরা মস্ত চত্বরটা পেরিয়ে কয়েকটা স্টেপ ভেঙে ওপরের টানা অলিন্দে উঠে এল দু'জনে।

শেখরনাথ জিগ্যেস করলেন, 'কাল কোন অবধি যেন শুনেছিলে?'

বিনয় মনে করিয়ে দিল। সেলুলার জেলের জেলর বিপ্লবী রাজনাথ চক্রবর্তীকে শাসিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন, এই জেলখানার ভেতর কয়েদিদের, বিশেষ করে টেরোরিস্টদের শায়েস্তা করার জন্য তিনটে ফাঁসিঘর আছে। একজন জুনিয়র অফিসারকে বলেছিলেন, সেগুলো শেখরনাথদের দেখিয়ে দিতে। তারপর তাঁর চেম্বার থেকে সবাইকে বের করে দিয়েছিলেন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। এদিকে এসো—' তালাবন্ধ কুঠুরির পর কুঠুরির পাশ দিয়ে উত্তর দিকের শেষ মাথায় বিনয়কে নিয়ে এলেন শেখরনাথ। এখান থেকে কোনাকুনি সমুদ্র চোখে পড়ছে। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি শুরু করলেন, 'জেলরের চেম্বার থেকে সেই দুই জুনিয়র পুলিশ অফিসার জেলের অন্য একটা অফিসে নিয়ে গিয়েছিল। ফেউয়ের মতো আর্মড গার্ডরাও আমাদের পিছু পিছু গেছে।'

'সেখানে যে অফিসারটি ছিলেন তার আকৃতি জেলরের মতো বিপুল না হলেও তাগড়াই মজবুত চেহারা। মুখটা বুনো শুয়োরের মতো। চুলের মাঝখান দিয়ে সিঁথি। কুতকুতে চোখের চাউনি এত তীব্র যে তার দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। রাজনাথের মতো দুঃসাহসিক ছেলেও একবার তার দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিয়েছিল।

'এই চেম্বারে অফিসারটি ছাড়া আরও দু'জন কেরানি ধরনের কর্মচারী ছিল। তারা ভারতীয়। তাদের একজনকে ঘোঁত ঘোঁত করে অফিসার বললেন, 'রেকর্ড বুক দেখে এই বাস্টার্ডদের নাম-ঠিকানা মিলিয়ে নাও।'

এর আগে 'রেগুলেশন অ্যাক্ট থ্রি' আর 'বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট'-এ বারকয়েক ধরা পড়ে আলিপুর জেল, দমদম জেল, মেদিনীপুর জেল— এমনি নানা কয়েদখানায় কয়েকবছর কাটিয়েছি কিন্তু কোনও জেলর বা ডেপুটি জেলর আমাদের বেজন্মা বলে গালাগাল দেয়নি। শরীরের সব রক্ত মাথায় উঠে টগবগ করে ফুটছিল। দাঁতে দাঁত চেপে কোনওরকমে প্রচণ্ড ক্রোধটা সামলাচ্ছিলাম।

এদিকে কেরানিটা মস্ত ঢাউস বাঁধানো খাতা বের করে আমাদের নাম এবং বাড়ির ঠিকানা পড়তে পড়তে আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল। শেখরনাথ রাহা, রাজনাথ চক্রবর্তী, মুকুন্দ বসাক ইত্যাদি ইত্যাদি।

'আমরা সেলুলার জেলে পৌঁছুবার আগেই আমাদের নামধাম কলকাতা থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেকের নাম-ঠিকানা বলার সঙ্গে সঙ্গে একে একে ঘাড় কাত করে সায় দিয়ে যাচ্ছিলাম। অর্থাৎ কেরানি হেঁকে হেঁকে যা বলছে সব সঠিক।

'এবার শূকর-মুখ অফিসার অন্য কেরানিটিকে বলল, 'সনস বিচদের জেলের উর্দিটুর্দি দাও—'

'প্রথমবার গালাগালিটা শুনেও চুপ করে থেকেছি। কিন্তু দ্বিতীয়বার আর পারা গেল না। সহ্য করার শক্তিটা ফেটে চৌচির হয়ে গেল। বললাম, 'বাবা-মা তুলে গালি দিচ্ছেন কেন?'

রাজনাথ আর মুকুন্দও চিৎকার করে উঠেছে, 'উই প্রোটেস্ট। আমাদের বাবা-মা'দের এভাবে নোংরা ভাষায় অপমান করতে পারেন না। আপনারা সিভিলাইজড নেশন বলে গর্ব করেন, এই তার নমুনা?'

রাজনাথ গলার স্বর আরও কয়েক পর্দা চড়িয়ে বলল, 'ইউ মাস্ট অ্যাপোলোজাইস— ইউ মাস্ট অ্যাপোলোজাইস—' সে যেন উন্মাদ হয়ে গেছে। তার গালের কষ বেয়ে ফেনা বেরিয়ে আসতে লাগল। —'তোমার মা-বাবাকে যদি এভাবে উদ্ধার করি, কেমন লাগবে?'

'অফিসার প্রথমটা একেবারে থ হয়ে গেল। বঙ্গোপসাগরের মাঝখানে এই সেলুলার জেলে এসে সবাই আতঙ্কে কুঁকড়ে থাকে। কিন্তু তিন টেরোরিস্ট, বিশেষ করে রাজনাথের মতো একজন সদা লাপীর যে এমন সৃষ্টিছাড়া স্পর্ধা হতে পারে, কে ভাবতে পারে। উত্তেজনায় ক্রোধে মুখটা রক্তবর্ণ হয়ে উঠল অফিসারের। দুই চোখ থেকে আগুনের হলকা ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। বাজ পড়ার মতো আওয়াজ করে চেঁচিয়ে উঠল, 'ব্লাডি ডগস, শাট আপ।' তারপর সেই কেরানিটিকে বলল, 'এই জানোয়ারগুলোকে পাশের ঘরে নিয়ে যাও।' যে দু'জন যুবক ব্রিটিশ অফিসার আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল তাদের বলল, 'পায়ে বেড়ি দিয়ে এদের সলিটারি সেলে রাখবে। আর কাল দুপুরে 'টিকটিকি'তে চড়াবে। টেন ল্যাশেস ইচ।'

'টিকটিকি' বস্তুটির কী মহিমা, তখনও জানি না। ল্যাশ শব্দটা অজানা নয়। সেটা হল কষাঘাত। শুনে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠেছিল।

আমাদের পাশের ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। দু'জোড়া করে নতুন উর্দি, সিলভারের থালা, গেলাস ইত্যাদি দিয়ে গলায় কালো কারে বাঁধা চৌকো লোহার পাত পরিয়ে দেওয়া হল। সেটায় খোদাই করে লেখা আছে— ২৪১। অর্থাৎ তখন থেকে আমি আর শেখরনাথ রাহা নই। আমার পরিচয় ২৪১। দু'শো একচল্লিশ নম্বর কয়েদি। একই প্রক্রিয়ায় রাজনাথ হয়ে গেল ২৪২ এবং মুকুন্দ ২৪৩।

কেরানিটি তরুণ অফিসারদের কানে যাতে না যায়, এমনভাবে ফিস ফিস করল, 'পাশের কামরায় গ্রিনিজ সাহেবের সঙ্গে ওইরকম রাগারাগি না করলেই পারতেন।'

'ওই শুয়োর-মুখো অফিসারটির নাম যে গ্রিনিজ, সেই প্রথম জানা গেল। কেরানিকে বললাম, 'আমাদের কী বলে গালাগাল দিচ্ছিল, শুনেছেন তো?'

কেরানিটি বলল, 'শুনেছি।'

'এসব শোনার পর কারও মাথার ঠিক থাকে, না থাকা উচিত?'

কেরানিটি বলল, 'কী করবেন বলুন; ওরা রাজার জাত। যা বলবে মুখ বুজে সয়ে যেতে হবে।'

'বাঃ, চমৎকার! একজন ভারতীয় হিসেবে আরেকজন ভারতীয়কে চরম অপমান করছে, দেখেও প্রোটেস্ট করলেন না?'

কেরানিটির মুখ কালো হয়ে গেল। ক্ষীণ, ভীরু গলায় বলল, 'কী করব বলুন! নৌকরি করি; প্রোটেস্ট করলে নৌকরিটা তো যাবেই। টেরোরিস্ট তকমা দিয়ে আমাকে ফাটকে ভরে দেবে। বাকি জীবনটা জেলের ঘানি ঘুরিয়ে কাটিয়ে দিতে হবে। আর আমার মা বাবা বউ বাচ্চা না খেতে পেয়ে মরে যাবে।' একটু থেমে বলেছিল, 'আপনাদের জন্যে আমার খুব ভয় হচ্ছে।'

সেই যুবক অফিসার দু'টি নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিল। হঠাৎ তাদের নজর এসে পড়ল আমাদের ওপর। একজন বলল, 'অত কী বক বক করছ? চল— চল—'

কেরানিটার মুখ ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কী বিষয়ে আমাদের কথা হচ্ছিল যদি দুই অফিসার জানতে চায়, সে বিপদে পড়ে যাবে। কিন্তু অফিসাররা সে ব্যাপারে কৌতূহল দেখাল না। তারা আমাদের তিন রেভোলিউশানারিকে তাড়া দিয়ে নিয়ে চলল।'

'দুটো ব্লক পেরিয়ে এই তিন নম্বর ব্লকে আমাদের নিয়ে আসা হল। তখন সামনের চত্বরে লাইন দিয়ে অনেক পুরনো কয়েদি

pathagar.net

banglabooks.in

দাঁড়িয়ে আছে। সবার হাতে সিলভারের থালা এবং গেলাস। একধারে উঁচু টেবিলের ওপর কাঠের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কড়াতে পুরু পুরু চাপাটির স্তূপ আর বড় বড় সিলভারের বালতিতে সবজি। বিরাট দুটো ড্রামে খাওয়ার জলও রয়েছে। তিন জন পেটি অফিসার আর দু'জন টিন্ডালকেও দেখা গেল। তারা খাদ্যবস্তুগুলো দেওয়ার জ্য হাতা এবং মগ নিয়ে অপেক্ষা করছে। এছাড়া রয়েছে বন্দুক হাতে এক দঙ্গল পুলিশ এবং একজন ইন্ডিয়ান পুলিশ অফিসারও।'

'সূর্য তখন মাউন্ট হ্যারিয়েটের পেছন দিকে নেমে গেছে। তবে সন্ধে নামতে খানিকটা দেরি ছিল। দিনের শেষ ফিকে আলো চারদিকের পাহাড়, টিলা, উপসাগর আর বিশাল বিশাল মহাবৃক্ষের গায়ে আলগাভাবে লেগে আছে। সমুদ্রের ওপর দিয়ে অজস্র সি-গাল পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে পাড়ের গাছপালার দিকে উড়ে যাচ্ছে। সারাদিন সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাছ শিকার করে খেয়েছে। পেট বোঝাই, রাতটা বিশ্রাম দরকার।

'ইন্ডিয়ান সেই পুলিশ অফিসারটি— সে কোন প্রভিন্সের লোক কে জানে, —কর্কশ স্বরে হুকুম দিল। —'খানা চালু কর।'

'সঙ্গে সঙ্গে কয়েদিদের লাইনটা পেটি অফিসার আর টিন্ডালরা যেখানে চাপাটিটাপাটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে এগিয়ে চলল। পেটি অফিসাররা প্রতিটি কয়েদির থালায় চারটে করে চাপাটি দিতে লাগল। চাপাটি নিয়ে তারা এগিয়ে গেল পাশের দিকে। সেখানে রয়েছে সবজির বালতিগুলো। প্রত্যেকের থালায় দু'হাতা করে সবজি দেওয়া হল, তারপর সবার গেলাসে গেলাসে জল।

'আমাদের অবশ্য কিউতে দাঁড়াতে হল না। যে ব্রিটিশ অফিসাররা আমাদের নিয়ে এসেছিল তাদের একজন ইন্ডিয়ান অফিসারটিকে ডেকে বলল, 'এই ২৪১, ২৪২, ২৪৩ নম্বর কয়েদি আজ নতুন এসেছে, এদের আজ লাইনে দাঁড়াবার দরকার নেই। ওদের খাবার আনিয়ে দাও—'

শশব্যস্ত ভারতীয় অফিসারটি একজন পেটি অফিসারকে ডেকে আমাদের হাত থেকে থালা-গেলাস নিয়ে চাপাটি-সবজি এবং জল আনিয়ে দিল। এবার ব্রিটিশ অফিসারটি ইন্ডিয়ানটিকে বলল, 'এরা ড্রেডেড ক্রিমিনাল, টেরোরিস্ট। হায়ার অথরিটির অর্ডার, এদের পায়ে বেড়ি লাগিয়ে সলিটারি সেলে রাখতে হবে। কাল এদের টিকটিকিতে চড়িয়ে দশ ঘা করে বেতের বাড়ি। আন্ডারস্ট্যান্ড?'

'তক্ষুনি জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল ইন্ডিয়ানটি। —'ইয়েস স্যার।' ব্রিটিশ অফিসারটি বলল, 'এই ব্লকের দোতলায় সলিটারি সেল আছে। পেটি অফিসারদের চাবি আর লোহার বেড়ি আনতে বল। এখনই ওদের ঢোকানো হবে।'

'ইন্ডিয়ানটি পেটি অফিসারদের ডাকল না, নিজেই দৌড়ে গিয়ে কোত্থেকে, যেন চাবির গোছা আর লোহার বেড়ি নিয়ে এল। ব্রিটিশ অফিসারটি বলল, 'এবার চল।' একজন পেটি অফিসারকে সঙ্গে নাও।'

আমাদের পাহারা দিয়ে এই তিন নম্বর ব্লকের দোতলায় নিয়ে আসা হল। মুকুন্দ, রাজনাথ আর আমাকে পাশাপাশি রাখা হয়নি। আমার জন্যে ঠিক হল সিসোস্ট্রেস বে'র দিকের শেষ সেলটা। তারপর পঁচিশ-তিরিশটা সেল-এর পর দোতলার মাঝামাঝি জায়গায় একটা সেল মুকুন্দর আর রাজনাথের সেলটা ওধারের শেষ প্রান্তে।

ইন্ডিয়ান অফিসারটি আমার সেলের তালা খুলে দিল। তার নির্দেশে পেটি অফিসার, পায়ে লোহার বেড়ি পরাল। ব্রিটিশ অফিসারটি পেটি অফিসারকে বলল, 'এক বালতি পানি আর টাট্টির জন্য প্যান এনে দে।' আমাকে বলল, 'কাল সুবেহ হাত-মুখ ধোওয়া, টাট্টি— সব কাম এই পানি দিয়ে সারতে হবে। দু'প্রহরে আর এক বালতি পানি মিলবে গোসলের জন্যে; আউর থোড়া পিনেকো পানি।'

আমাকে সেলের ভেতর ঢোকানো হল। পাঁচ মিনিটের ভেতর জল, পায়খানার প্যান চলে এল। সামনের চত্বরে যে থালায় চাপাটি-টাপাটি দেওয়া হয়েছিল সেই খাবারের থালাটাও একধারে রাখল পেটি অফিসারটা। মেঝেতে একটা রোঁয়াওলা কম্বল আর তেলচিটে বালিশও রয়েছে। আমার জন্যে উত্তম রাজশয্যা। সেগুলো থেকে বোটকা দুর্গন্ধ উঠে আসছিল। আমার আগে আরও কত কয়েদি— বাঙালি, মারাঠি, শিখ, বর্মী — যে ওটার ওপর শুয়ে রাত কাটিয়েছে, কে জানে। আমার গা গুলিয়ে উঠল।

ব্রিটিশ অফিসার, পেটি অফিসার, ইন্ডিয়ান অফিসার এবং আর্মড গার্ডরা আর দাঁড়াল না। বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে রাজনাথ আর মুকুন্দকে নিয়ে চলে গেল।

দশ ফুট লম্বা আট ফুট চওড়া ছোট্ট কুঠুরির দু'পাশে নিরেট দেওয়াল। পেছনের দেওয়ালে অনেকটা উঁচুতে ঘুলঘুলির চেয়ে একটু বড় জানলা, তার গায়ে লোহার মজবুত শিক বসানো। সামনের দিকে দরজা। সেই দরজায় গরাদ লাগানো। দরজাটার একধারে বেশ খানিকটা দূরে এমন কায়দায় তালা দেবার বন্দোবস্ত যে ভেতরের কয়েদি যদি কোনওভাবে চাবি জোগাড় করতে পারে, কিছুতেই গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে সেই তালা খুলতে পারবে না। অবশ্য ভেতর থেকে পেছনের জানলা বা সামনের দরজার ফাঁক দিয়ে আকাশের একটা অংশ দেখা যায়। বহুদূর অবধি সেসোস্ট্রেস উপসাগর এবং ছোট ছোট কয়েকটা দ্বীপও চোখে পড়ে। এখন এই যে ব্লকের সামনে খোলা চত্বরটা দেখা যাচ্ছে সেখানে সেই আমলে ছিল লম্বা লম্বা শেড। সেইসব শেডের তলায় সারি সারি ঘানিঘর। ঘানিঘরের কী মহিমা, পরে টের পেয়েছিলাম।

যাই হোক, কুঠুরিতে তো ঢুকলাম। মৃত্যুকে ভয় পেতাম না। পেলে কখনওই বিপ্লবের পথে পা বাড়াতাম না। কিন্তু পায়ে বেড়ি দিয়ে বাকি জীবন কাটাতে হবে। এই আশি বর্গফুট এলাকায় সঙ্গে খাওয়া ঘুম পায়খানা পেচ্ছাপ— এসব ভাবতেই আতঙ্কে সারা শরীর হিম হয়ে যাচ্ছে। মনে হয়েছিল বাকি জীবন তো অনেকগুলো বছর, দু'চার দিনও কাটবে কি না, কে জানে।

মনে পড়ে কম্বল পেতে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম। তারপর দরজার কাছে এসে গরাদ ধরে বাইরে তাকালাম। নিচের চত্বরে তখনও কয়েদিদের খাবার দেওয়া হচ্ছে।

একসময় সন্ধে নেমে গেল। মাঝখানের উঁচু ওয়াচটাওয়ারটা থেকে সাত দিকে যে সাতটা ব্লক বেরিয়ে গেছে, সর্বত্র অজস্র আলো জ্বলে উঠল। এমনকী সেলুলার জেলের শত শত কুঠুরিতেও।

সব কয়েদিকে খাবার দেওয়া শেষ হলে তারা থালা এবং জল নিয়ে পেটি অফিসার আর আর্মড পুলিশের পাহারায় অনেকে গেল ব্লকের একতলায়, একদল দোতলায়, বাকি সবাই তেতলায়। চত্বরের ওধারে কোনাকুনি যে ব্লকটা দেখা যাচ্ছিল সেখানেও কয়েদিদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কয়েদিদের সেলে ঢুকিয়ে পেটি অফিসাররা তালা লাগিয়ে দিল। প্রতিটি কয়েদির জন্য একটা করে সেল।

আমাদের ব্লকের দোতলাতেও দুড়দাড় পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। সেই সঙ্গে হইচই। বুঝতে পারছি, বাঁ দিকের সিঁড়ি দিয়ে কয়েদিরা উঠে আসছে। পুলিশ অফিসার, পেটি অফিসাররা চিৎকার করে বাছা বাছা খিস্তি দিতে দিতে তাদের থামাতে চাইছিল। —'হল্লা মাত কর রেন্ডিকা বচ্চেলোগ। নেহি তো হাড্ডি তোড় দুঙ্গা। বিলকুল চোপ—'

পুলিশ এবং পেটি অফিসারদের শাসানিতে চেঁচামেচি সামান্য কমল ঠিকই, তবে একেবারে থেমে গেল না।

আমার কুঠুরি থেকে সামনের ব্লকের সেলগুলো দেখা যায়।

pathagar.net

banglabooks.in

কিন্তু আমাদের ব্লকের একতলা দোতলা বা তেতলার কোনও কুঠুরিই দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবে তালা খোলা এবং বন্ধ করার আওয়াজ কানে আসছিল। বুঝতে পারছিলাম সেলে কয়েদিদের ঢোকানো হচ্ছে।

হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল। একটি কয়েদি পাহারাদার আর পেটি অফিসারদের নজর এড়িয়ে আচমকা আমার সেলের দরজার সামনে চলে এল। চাপা গলায় বলল, 'ভাইসাব, আমার নাম বৈজু। আমি এক মামুলি কয়েদি। লেকিন আপনারা যে তিনজন আজ নয়া এই কালাপানি এলেন তারা সবাই দেশকো আজাদের জন্যে লড়াই করেছেন তাদের সবাইকে ইজ্জৎ করি। নমস্তে। এখানকার পুলিশ, টিন্ডাল আর পেটি অফিসাররা বহোৎ হারামি। আপনাদের জান বরবাদ করে দিতে চাইবে। সবার জন্যে পারব না, তবে আপনাকে আমি দেখভাল করব।

আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের তিন বিপ্লবীর সেলুলার জেলে আসার খবর তা হলে সাধারণ কয়েদিদের মধ্যেও চাউর হয়ে গেছে! আমাদের ওপর যে প্রচণ্ড অত্যাচার চালানো হবে তা আগেই টের পেয়ে গেছি। কিন্তু মামুলি এই কয়েদিটি আমাকে বেছে নিয়ে কীভাবে আমার ওপর উৎপীড়ন কম হয় তার ব্যবস্থা করবে ভেবে পাচ্ছিলাম না। তবে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সে সম্মান করে সেজন্য লোকটাকে খুব ভালো লাগল। জিগ্যেস করলাম, 'তোমার নাম কী?' সে বলল, 'বৈজু—'

বিনয় অপার বিস্ময়ে এক বিচিত্র জগতের ইতিহাস শুনে যাচ্ছিল। সে জিগ্যেস করল, 'কাল যে বৈজু আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে সেলুলার জেলে এসেছিল, এ কি সেই বৈজু?'

শেখরনাথ মাথাটা সামান্য নাড়লেন 'হ্যাঁ'। তারপর শোন—' তিনি আবার পুরনো স্মৃতির ভেতর ফিরে গেলেন। বলতে লাগলেন, 'বৈজুকে জিগ্যেস করলাম, তুমি কত বছর আগে এখানে এসেছ?' সে বলল, 'হোগা, লগভগ চার সাল।' বাকি জিন্দেগি কালাপানিতেই কাটাতে হবে।' কোন অপরাধে তাকে এই বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে জানার জন্য ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল। কিন্তু সে প্রশ্ন আর করলাম না। বেশ কয়েকটা খুন না করলে যে এখানে আসা যায় না, তা আগেই শুনেছি। তেমনই কিছু একটা করে থাকবে বৈজু।

আমি তখন অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলাম। —'আচ্ছা, বৈজু, আমাদের মতো রেভোলিউশানারি আর কেউ এখন সেলুলার জেলে আছে?' সে একটু অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'রিভোলিশান কিয়া হ্যায়।' বুঝলাম, রেভোলিউশানারি শব্দটা তার অজানা। বললাম, 'দেশের আজাদির জন্যে যারা লড়াই করছে তাদের কথা বলছি।' ব্যাপারটা এবার মাথায় ঢুকল বৈজুর। সে বলল, 'জেলের অফিসাররা যাদের টিরোরিস (টেরোরিস্ট) বলে?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' বৈজু জানাল, এই তিন নম্বর ব্লকের তেতলায়, চার নম্বর ব্লকের একতলায়, আর সাত নম্বর ব্লকের দোতলায় আরও কয়েকজন রয়েছে। বলল, 'যদি তাদের কাছে আপনারদের খবর পৌঁছে দিতে বলেন তার ব্যওস্থা করতে পারি। ওদের খবরও আপনাদের কাছে পাঠাতে পারি।'

শুনে আমি স্তম্ভিত। সেলুলার জেলের ভেতর চতুর্দিকে যেখানে শ'য়ে শ'য়ে সেন্ট্রি, রাইফেল উঁচিয়ে পাহারা দিচ্ছে, ওয়াচটাওয়ার থেকে চব্বিশ ঘণ্টা নজরদারি চালানো হচ্ছে, সেই কঠোর নিশ্ছিদ্র যবনিকা ভেদ করে কীভাবে খবর চালাচালি করা সম্ভব, ভেবে পেলাম না। আমাকে তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে বৈজু বলল, 'সব বন্দোবস্ত আছে। আপ বেফিকর রহিয়ে। পরে সব জানতে পারবেন।' তারপর এদিক সেদিক তাকিয়ে বলল, 'শুনলাম, কাল আপনাদের তিন 'টিরোরিস'কে 'টিকটিকি'তে চড়ানো হবে।' আমার বিস্ময়ের শেষ ছিল না। দেখা যাচ্ছে এখানে কোনও কিছুই গোপন থাকে না। সেলুলার জেলের প্রশাসন যে-সব নিরেট দেওয়াল তুলে রেখেছে তার মধ্যেও অদৃশ্য অনেক ছিদ্র রয়েছে। বৈজু বলতে লাগল, 'আপনার চোট যাতে কম লাগে সেটা আমি দেখব।' আমি উত্তর দিলাম না। এবার কাঁচুমাচু মুখে বৈজু বলল, 'এক বাত কহুঙ্গা?' বললাম, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলবে।' একটু ইতস্তত করে বৈজু বলল, 'আমার বহুৎ ভুখ (খিদে)। সুবেহসে রাত তক খালি মনে হয়, পেটে আগ (আগুন) জ্বলছে। কয়েদখানা থেকে যে খানা দেওয়া হয় তাতে পেট ভরে না। আপনাকে আজ চারঠো চাপাটি দিতে দেখেছি। তামাম কয়েদিকেই। শুনেছি বঙ্গল মুল্লুকের আদমিরা বেশি খেতে পারে না। আমাকে দোঠো দেবেন?'

'এতক্ষণে বৈজুর সমধুর বাক্যবর্ষণের কারণটা স্পষ্ট হয়ে গেল। আমি হেসে ফেললাম। তারপর দু'টো চাপাটি এনে তার হাতে দিয়ে বললাম, 'এখন থেকে রোজ আমার ভাগ থেকে দু'টো করে চাপাটি তুমি পাবে।' হাঁটু অবধি মাথা ঝুঁকিয়ে বৈজু বলল, 'আপকা মেহেরবানি।'

বৈজু আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, বলা হল না। তার আগেই বিশাল তাকদবর এক পাঠান পেটি অফিসার অলিন্দের ওধার থেকে দৌড়ে এল। ছ'সাড়ে ফিটের মতো হাইট। পাথরের পাটার মতো চওড়া বুক। সারা মুখে দাড়ি। তার চোখ থেকে রাগে আগুন ছুটছে। মোটা মোটা আঙুল দিয়ে সাঁড়াশির মতো বৈজুর ঘাড় চেপে ধরে দাঁতে দাঁত ঘষে সে গজরে উঠল, 'শালে, কুত্তার বাচ্চা, সেলে কয়েদি ঢোকাতে গিয়ে দেখি, এক হারামির পাত্তা মিলছে না। শিরে (মাথায়) বিলকুল চক্কর লেগে গেল। তারপর দেখি তুমি হারামি এখানে ভেগে এসে নয়া টিরোরিসের (টেরোরিস্টের) সাথ গপসপ (গল্প সল্প) করছ! চল শালে, চল আজ তোর হাড্ডি তুড়ে দেব।' বৈজু বারকয়েক সেলাম ঠুকে কাকুতিমিনতি করতে লাগল, 'আমার কোঈ বুরা (খারাপ) মতলব নেহী হ্যায় আসলাম ভাই। নয়া কয়েদি এসেছে, তাই ভাবলাম দেখে যাই। দেখা করতে এসে, দো-এক বাত ভি হল—' বলে আমাকে দেখিয়ে চোখের ইশারায় কিছু বলতে চাইল। ঠিক বুঝতে পারলাম না। কিন্তু তাতে কাজ হল। পরে জেনেছিলাম পেটি অফিসারটার পুরো নাম আসলাম খান। সে বৈজুর কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে ট্যারাবাঁকা লাল লাল দাঁত বের করে, চোখ কুঁচকে একটু হাসে। বলে, 'শালে হারামজাদা' তারপর নিচু গলায় কথা বলতে বলতে চলে যায়। একটু পরেই পাশের কুঠুরির তালা খোলার শব্দ কানে আসে; সেই সঙ্গে আসলাম খানের কর্কশ স্বর। —'ঘুষ যা কুত্তা।' টের পেলাম পাশের কুঠুরিটা বৈজুর। তাকে ঢুকিয়ে ফের তালা লাগিয়ে টানা বারান্দা কাঁপিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল আসলাম খান।'

একজন অত্যন্ত উৎসাহী শ্রোতা পেয়ে সেলুলার জেলের পুরনো দিনের কথা বলতে খুব ভালো লাগছিল শেখরনাথের। কিন্তু সব দিকে তাঁর নজর। বেলা এখন অনেকটাই চড়ে গেছে। বললেন, 'চল, হাসপাতালে ফেরা যাক।'

বিনয়ের কৌতূহল মিটছিল না। যত শুনছিল, মনে হচ্ছে এক আশ্চর্য, ভয়াবহ, অজানা পৃথিবীর দরজা তার সামনে খুলে যাচ্ছে। একতলার কোণের দিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। সে জিগ্যেস করল, 'পরদিন আপনাদের সত্যি সত্যিই 'টিকটিকি'তে চড়ানো হয়েছিল?'

শেখরনাথ বললেন, 'আজ আর নয়, কাল শুনো। মোহনবাঁশির বউ ছেলেমেয়েরা হাসপাতালের বারান্দায় বসে আছে। তাদের জন্যে ভাত ডাল তরকারি কিনতে এবারডিন মার্কেটে যেতে হবে। তবে—'

'তবে কী?'

'যাবার আগে দোতলায় রাজনাথ, মুকুন্দ আর আমাকে যে

pathagar.n

banglabooks.in

সেলগুলোতে রাখা হয়েছিল, দেখিয়ে দেব।'

দোতলাটা অবিকল একতলার মতোই। সারি সারি তালাবন্ধ সব কুঠুরি। কোণের দিকের সিঁড়ি দিয়ে বিনয়কে সঙ্গে করে সেখানে উঠে এলেন শেখরনাথ। তাঁদের তিন বিপ্লবীকে কোথায় কোথায় রাখা হয়েছিল দেখিয়ে তাঁরা ফিরে গেলেন হাসপাতালে।

আট

পরদিন মোহনবাঁশি আরও খানিকটা সুস্থ হয়ে উঠল। তার ছেলেমেয়ে বউ এবং বিনয়কে নিয়ে অন্য দিনের মতো আজও হাসপাতালে এসেছিলেন শেখরনাথ। ডাক্তার চট্টরাজ তাঁদের মোহনবাঁশির কাছে নিয়ে গেলেন। আগের দিন মিনিট তিনেকের বেশি মোহনবাঁশিকে কথা বলতে দেননি তিনি। আজ প্রায় আধঘণ্টা কথা বলল মোহনবাঁশি। ওর স্ত্রী জ্যোৎস্না খুব খুশি। স্বামী বাঁচবে কী বাঁচবে না—এই নিয়ে তীব্র আশঙ্কায় ক'টা দিন তার কেটেছে। খেতে পারত না, ঘুমোতে পারত না। সারাক্ষণ কাঁদত। কখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, কখনও নিঃশব্দে চোখ থেকে অবিরল জল ঝরে যেত। তার মুখে আজ হাসি ফুটেছে। সে বুঝতে পেরেছে, আর কয়েকদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ মোহনবাঁশিকে নিয়ে সে জেফ্রি পয়েন্টের রিফিউজি সেটলমেন্টে ফিরে যেতে পারবে।

মোহনবাঁশির বেডের পাশ থেকে এক সময় জ্যোৎস্নাদের দোতলায় নামিয়ে এনে অপেক্ষা করতে বললেন শেখরনাথ। মোহনবাঁশি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর পর এখানেই সকালে ন'টায় এসে সন্ধে অব্দি বসে থাকে জ্যোৎস্না এবং তার ছেলেমেয়েরা। দুপুরে এখানেই তাদের জন্য ভাত-তরকারি-মাছটাছ এনে দেন শেখরনাথ। তারপর বিকেলে ভিজিটিং আওয়ার্সে আরও একবার মোহনবাঁশিকে দেখিয়ে তাদের নিয়ে ভাইপোর বাংলোয় ফিরে যান।

জ্যোৎস্নাদের বসিয়ে রেখে বিনয়কে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়লেন শেখরনাথ। তিনি জানেন, সেলুলার জেলে তাঁর জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়টা কীভাবে ক্ষয় হয়ে গেছে, কতটা ভয়াবহ ছিল তাঁর সেই নরকবাসের অভিজ্ঞতা তা জানার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে বিনয়। পুরনো দুঃস্বপ্নের সেই স্মৃতিকথা কাল শুরু করেছিলেন। মনে হয় এই তো সেদিনের কথা!

হাঁটতে হাঁটতে আজও তাঁরা তিন নম্বর ব্লকে চলে এলেন! আজ আর একতলায় নয়; সোজা দোতলায়। শেষ প্রান্তের যে সেলটায় তাঁকে দিনের পর দিন কাটাতে হয়েছে তার গা ঘেঁষে অলিন্দের যে রেলিংটা রয়েছে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। এখান থেকে হাজার দুয়েক ফিট নিচে সিসোস্ট্রেস উপসাগর, যেটা দূর সমুদ্রের দিকে চলে গেছে। সেখানে অগুনতি সিগাল উড়ছিল।

শেখরনাথ জিগ্যেস করলেন, 'কাল কোন পর্যন্ত যেন বলেছিলাম?' পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল তাঁর। 'ও, হ্যাঁ। পাশের সেলে বৈজুকে ঢুকিয়ে দিয়ে পেটি অফিসার আসলাম খান চলে গেল। তাই তো?'

বিনয় মাথা নাড়ল। 'হ্যাঁ।'

শেখরনাথ বলতে লাগলেন। 'আমার সেলটা তো দেখতে পাচ্ছ। পেছনের জানলা এত উঁচুতে যে বাইরের কিছুই দেখা যায় না। দু'ধারে সলিড ওয়াল। সামনের দিকের দরজার গরাদের ফাঁক দিয়ে বাইরের যা একটু-আধটু চোখে পড়ে। আমি গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

'সন্ধে আগেই নেমে গিয়েছিল। সেলুলার জেলের সব কয়েদিকে আগেই যার যার কুঠুরিতে ঢোকানো হয়েছিল। তবে সামনের চত্বরে পুলিশের টহলদারি চলছে। দূরে ওয়াচ টাওয়ারের চুড়ো থেকে যেন হাজারটা চোখ মেলে প্রতিটি সেল লক্ষ করছে

উচ্চশিক্ষার সুবর্ণ সুযোগ
2 YEARS পাশ গ্র্যাজুয়েটরা সরাসরি POST GRADUATE -এ ভর্তি হোন।
সমস্ত বিষয় বাংলা মাধ্যমে পরীক্ষা হবে।
EIILM UNIVERSITY UGC DEC APPROVED
BA, BSc, BCom (All) / MA, MSc, MCom (All) / Library Sc / Social Work, Art & Craft etc.
West Bengal Board of Secondary / Higher Secondary Open Education - থেকে মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক করানো হয়
IFHSR FOUNDATION CAMPUS CENTRE CODE EU/WVS/1013
PATHAN MAHALLAH, MADRASAH
Medinipur Town : 9674934549 / 7407857135
December 2011 সেশন-এ ভর্তি চলছে TITLI-11-12

দূরাভাষ -(০৩২২২) ২৪৩২২৬ /মোবাইল -৯৪৩৪০৬০২৪৭
আপনাদের সেবায় - (গভ. রেজি.)
শ্রীমা নার্সিং হোম
সমস্ত রকম অপারেশন, (জেনারেল সার্জারী, গাইনি, চক্ষু, ই.এন.টি.) মাইক্রোসার্জারী করা হয়।
আই.সি.আই.সি.আই. হেলথ্ কার্ড ও রাষ্ট্রীয় বীমা যোজনার মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়।
ডেবরা বাজার * পশ্চিম মেদিনীপুর
TITLI-11-12

নবজাগরনের সেনাপতি -
মা মাটি মানুষের রায়ে নির্বাচিত
সর্বজনশ্রদ্ধেয়া পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী
মাননীয়া মমতা ব্যানার্জ্জীর নেতৃত্বে নতুন
বাংলা গড়ার অঙ্গীকারে আমরাও অঙ্গীকারবদ্ধ।
শ্রী রাম চক্রবর্ত্তী
মহানাগরিক
চন্দননগর পৌর নিগম
চন্দননগর

"মধ্যমগ্রাম পৌর হস্পিটাল"
সোদপুর রোড, (H.D.F.C Bank -এর পিছনে)
মা-মাটি-মানুষের চাহিদা পূরণই আমাদের একমাত্র ব্রত
O.P.D/ Emergency / Male Word / Female Word / I.C.C.U / H.D.U. / Emergency (24 Hour), Pathology (24 Hour), Medicine Shop (24 Hour) ,XRAY, E.C.G., U.S.G-র সুবিধা আছে।
সজাগ ও সতর্কতা সহ তদারকিতে
অরবিন্দ মিত্র চেয়ারম্যান-ইন-কাউন্সিল (স্বাস্থ্য)
সুদীপ মিত্র উপ: পৌরপ্রধান
শ্রী রথীন ঘোষ পৌরপ্রধান
মধ্যমগ্রাম পৌরসভা

banglabooks.in

রাতের প্রহরী। বিকেলের দিকের যখন কয়েদিদের খাবার দেওয়া হচ্ছিল তখনকার ব্যস্ততা হইচই আর নেই। ক্রমশ সব ঝিমিয়ে আসছে। আমি দাঁড়িয়ে আছি, দাঁড়িয়েই আছি। সেলের এক কোণে খাবার রয়েছে কিন্তু খিদে বা তেষ্টার বোধটাই নেই। দু-চার টুকরো চাপাটি মুখে দিয়ে জল-টল খেয়ে যে শুয়ে পড়ব তেমন ইচ্ছাটাই কেউ যেন হরণ করে নিয়েছে।

'রাত বাড়তে থাকে। ক্রমশ বিশাল কয়েদখানা আরও, আরও নিঝুম হয়ে যায়। শুধু কাছের বা দূরের অলিন্দগুলো থেকে সেন্ট্রিদের বুটের আওয়াজ ভেসে আসতে থাকে। আমাদের ব্লকেও তার ব্যতিক্রম নেই। দোতলায় একজন ইউনিফর্ম পরা পুলিশ রাইফেল হাতে অলিন্দের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একবার গিয়ে আবার ফিরে আসছে। সমস্ত রাতই বুঝিবা এমনটা চলবে।

'আমার খুব হাসি পাচ্ছিল। ওয়াচ টাওয়ারে নজরদার, খোলা চত্বরে পাহারাদার, প্রতিটি ব্লকের অলিন্দে পুলিশের টহল। মহা পরাক্রান্ত ইংরেজ, যাদের পৃথিবী জোড়া সাম্রাজ্যে নাকি সূর্যাস্ত হয় না, মাত্র কয়েকশো কয়েদি, বিশেষ করে কয়েকটি বিপ্লবী তাদের ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছে। নিরস্ত্র তালাবন্দি পায়ে বেড়ি-লাগানো ক'জন বিপ্লবী বা অন্য কয়েদিরা কখন কী করে বসে সে জন্য দুশ্চিন্তার শেষ নেই। তাই পাহারাদারির এত নিশ্ছিদ্র আয়োজন। আসলে ব্রিটিশ জাতটাকে সেদিন মনে হয়েছিল অত্যন্ত ভীরু।

'কতক্ষণ গরাদ ধরে দাঁড়িয়েছিলাম, খেয়াল নেই। সেটা খুব সম্ভব শুক্লপক্ষ। মাউন্ট হ্যারিয়েটের পেছন দিক থেকে চাঁদ উঠে এসেছে। অফুরন্ত রুপোলি জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে যতদূর দেখা যায় ছোট বড় নানা দ্বীপ, দ্বীপের গায়ে ঘন অরণ্য আর বঙ্গোপসাগর। দৃশ্যটা আশ্চর্য সুন্দর, স্বপ্নের মতো। তার মধ্যে অনন্ত দুঃস্বপ্নের মতো দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের মাথায় সেলুলার জেল। সেখানে কয়েদিরা ঘুমোয় কিন্তু শতচক্ষু মেলে জেলে থাকে ইংরেজদের পোষা পাহারাদারের হিংস্র বাহিনী।

'হঠাৎ দরজার সামনে ছায়ামূর্তির একটা লোক এসে দাঁড়াল। তার পুরো মুখটা দেখা যাচ্ছে না। তবে অলিন্দের সিলিং থেকে যে তেজি বাল্ব ঝুলছিল তার আলো এসে পড়েছে তার ডান গালের ওপর। গালটা পোড়া ঝামার মতো; মাংস শুকিয়ে, ফুলে, কুঁচকে কুঁচকে রয়েছে। নাক বলতে বিশেষ কিছু নেই। শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য শুধু দুটো সুড়ঙ্গ। ওপরের ঠোঁটটা ভেতর দিকে ঢোকানো; নিচের কালো পুরু ঠোঁটটা বাইরে ঝুলে আছে। তার ফাঁক দিয়ে ভাঙা দাঁত বেরিয়ে রয়েছে।

'আমি চমকে উঠেছিলাম। এমন বীভৎস চেহারা আগে কখনও দেখিনি। যেন একটা প্রেত।

'লোকটা একটু হেসে, ঘষা ঘষা গলায় হিন্দুস্থানিতে বলল, 'তুমি আজ নয়া এসেছ, দেখলাম। জাহাজে করে যখন নয়া নয়া কয়েদি কালাপানি আসে তখন এই কয়েদখানায় নয়া নয়া রোশনি জ্বলে ওঠে। তা ভাইয়া, তুমি মেনল্যান্ডে কী করে এসেছ—ক'টা খতম? আমি তিন আদমিকে কোতল করে এসেছিলাম।'

'লোকটাকে বেশ রসিক মনে হল। প্রথমটা চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তার কথা শুনতে শুনতে ভয় কেটে গেল। বেশ মজাও পাচ্ছিলাম। বুঝতে পারলাম, কোন অপরাধে আমাকে আন্দামানে চালান করা হয়েছে, সে জানে না। তার কথার উত্তর দিলাম না।

'লোকটা ফের শুরু করল, 'কমসে কম তিন চারঠো কোতল করে না এলে এখানকার পুরনো কয়েদিরা ইজ্জত দেয় না। মালুম হচ্ছে, তুমিও তাই করে এসেছ।'

তাকে বললাম, 'ধরে নাও, আমি পাঁচ-ছ'টা খুন করে এসেছি।'

'লোকটা কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তারপর জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে তারিফের সুরে বলল, 'ওয়াহ্, ওয়াহ্, তুমি তো শের হো জনাব!' কুর্নিশের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে কপালে হাত ঠেকাল। 'তোমাকে হাজারো সেলাম। হো ভেইয়া, তুম কোন মুল্লুককা মূর্তি?'

বললাম, 'বাংলা মুল্লুক। কেন?'

লোকটা অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে আমার পা থেকে মাথা অব্দি বার কয়েক দেখল। তারপর বলল, 'বঙ্গালির সিনায় (বুকে) ইতনা তাকত। বহুৎ তাজ্জবকি বাত।'

আমি জবাব দিলাম না। হঠাৎ খেয়াল হল, একটা কয়েদি এত রাতে সেলের দরজা খুলে কী করে আমার দরজার সামনে চলে আসতে পারল! যে আর্মড পুলিশটা অলিন্দের এ মাথা থেকে ও মাথায় সমানে চক্কর দিচ্ছে সে তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না! যা ভাবছিলাম, রীতিমতো অবাক হয়ে সেই প্রশ্নগুলো তাকে করলাম। সে ভাঙা ভাঙা দাঁত বের করে হাসল। বলল, 'আমাকে কুঠরিতে তালাবন্ধ হয়ে থাকতে হয় না। দিনে কী রাতে যখন যেখানে যাই না, কোনও পেহেরাদার আমাকে কিছু বলবে না। কুছ ভি নেহী—'

আমি হতভম্বের মতো বলি, 'তুমি খুন করে কালাপানি এসেছিলে না? কয়েদি তো?'

লোকটা বলল, 'জরুর।'

তা হলে?' আমি জিগ্যেস করলাম।

লোকটা বলল, 'কয়েদি হলেও আমি টিন্ডাল। জেলরসাব আমাকে মেহেরবানি করে টিন্ডাল বানিয়ে দিয়েছেন।'

সেদিন বুঝতে পারিনি, পরে জেনেছিলাম কয়েদিদের ভেতর থেকে কয়েকজনকে বেছে নিয়ে সেলুলার জেলের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পেটি অফিসার, টিন্ডাল এমনি সব পজিশনে বসিয়ে দেয়। তারা সরকারের বিশ্বস্ত বাহিনী। এরা মোটামুটি স্বাধীন; তবে সেলুলার জেলের চৌহদ্দির বাইরে এদের পা বাড়াবার হুকুম নেই। এদের কাজ হল অন্য বেয়াড়া, ঠ্যাঁটা, বেপরোয়া কয়েদিদের শায়েস্তা রাখা। পদমর্যাদায় টিন্ডালরা পেটি অফিসারদের চেয়ে এক স্তর নিচে। লোকটার কথাবার্তা, হাবভাব দেখে বোঝা যাচ্ছিল সে মুসলমান। জিগ্যেস করলাম 'টিন্ডাল তো বুঝলাম। তোমার নিশ্চয়ই একটা নামও আছে। সেটা কী?'

লোকটা বলল, 'জাফর আলি। খাস ইলাহাবাদি। মতিলাল নেহরু, জবারলাল নেহরুকা মহল যিস টৌনমে (টাউনে) হ্যায় উঁহাকা রহনেবালা থা। লেকিন অব সেলুলার জেল আপনা মকান। পুরা জিন্দেগি কে লিয়ে—'

আমি কিছু বললাম না। এই নিঝুম রাতে সেন্ট্রিদের বুটের আওয়াজ ছাড়া যেখানে আর কোনও শব্দ নেই, আচমকা মাটি ফুঁড়ে জাফর আলি নামে টিন্ডালটি উঠে এসেছে সেটা নেহাত আলাপ জমাবার জন্যে নয়; বৈজুর মতো তারও নিশ্চয়ই কোনও গূঢ় উদ্দেশ্য রয়েছে। অপেক্ষা করতে লাগলাম।

লোকটা ঝপ করে গলা নামিয়ে ষড়যন্ত্রকারীর মতো ফিস ফিস করল, 'জনাব, বঙ্গলকা শের, আপকো পাস চরস হ্যায়?'

চরস যে মারাত্মক কড়া নেশার জিনিস, সেটা জানতাম! বিপ্লবীদের গীতা স্পর্শ করে সে সময় প্রতিজ্ঞা করতে হত, নেশাভাং করবে না, নারীর কাছ থেকে দূরে থাকবে। জিতেন্দ্রিয় না হলে বিপ্লবী হওয়া যেত না। তেমন এক দেশব্রতীর কাছে কিনা টিন্ডাল জাফর আলি চরসের খোঁজ করছে! আমি রুক্ষ গলায় বলেছিলাম, 'নেই।'

জাফর আলি একটু যেন হতাশ হয়ে বলল, 'পিনিক হ্যায়?'

জিনিসটা কী, আগে কখনও শুনিনি। বললাম, 'পিনিক কাকে বলে?' জাফর আলি বুঝিয়ে দিল, গাঁজার সঙ্গে আরও তীব্র ধরনের কী সব মিশিয়ে সেটা তৈরি করতে হয়। সেলুলার জেলে প্রথম দিন পা দিয়েই আমার জ্ঞানের ঝুলিটি ভরে উঠতে লাগল। এতকাল চরিত্রগঠন, গীতাপাঠ এবং দেশের স্বাধীনতা ছাড়া অন্য

pathagar.n

banglabooks.in

কোনও দিকে লক্ষ ছিল না। এখানে এসে একদিনেই কত কিছুই না জানতে পারলাম।

জাফর আলি কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই একটা করুণ, কাতর, আর্ত চিৎকার সেলুলার জেলের নিস্তব্ধ রাত্রিকে ভেদ করে আকাশের দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, 'বঁচাও—বঁচাও—হো ভগোয়ান রামজি মুঝে বঁচাও—ও—ও— বঁচাও—ও—ও—'

শিউরে উঠলাম। শব্দটা আমার হৃৎপিণ্ডে যেন আমূল বিঁধে যেতে লাগল। এমন তীক্ষ্ণ, অস্বাভাবিক আর্তস্বর আগে আর কখনও শুনিনি। কাঁপা কাঁপা গলায় জিগ্যেস করলাম, 'কে কাঁদছে?'

জাফর আলি টিন্ডাল এতটুকু বিচলিত হয়নি। হাত নেড়ে মাছি তাড়ানোর মতো ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়ে নিস্পৃহ সুরে বলল, 'ও শালে, এক ফাঁসির আসামি। সাত রোজ আগে ওর ফাঁসির হুকুম হয়েছে। কাল সুবেহ আট বাজে ওকে রশির ফান্দা গলায় লাগিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।' একটু কী ভেবে ফের বলল, 'তুমি নয়া এসেছ তো। তাই ঘাবড়ে গেছ। তুমি দশ আদমিকে কোতল করেছ। তোমার এত ডরের কী আছে?' সে আরও জানাল, এরকম ফাঁসি ফি মাসে তিন-চারটে করে হয়। এমনভাবে বলল, ফাঁসিটা এই জেলখানায় যেন জলভাতের মতো ব্যাপার।

জিগ্যেস করলাম, 'কী করেছিল ও?' জাফর আলি বলেছিল, 'শালে কুত্তে, ভারী কসুর কিয়া। লোকটার অপরাধ কী সেটা আর বলল না; আমিও জানতে চাইলাম না।

'জাফর আলি বলল, 'ফাঁসির আগের রাতে সব আসামি এরকম চিল্লায়। কেউ খোদাকে ডাকে, কেউ ভগোয়ানকে। সমঝা? দো-চার মাহিনা এখানে থাকো। সব জানতে পারবে।' আমি উত্তর দিলাম না।

কাল সকালে যে লোকটার গলায় ফাঁসির দড়ি পরানো হবে, জাফর আলি টিন্ডাল তাকে নিয়ে আর মাথা ঘামাতে চাইল না। আকছার এখানে এসব ঘটছে। এতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে।

'ফাঁসির আসামিটা সমানে চেঁচিয়ে চলেছে। বুকফাটানো প্রবল সেই আর্তনাদ। জাফর আলি সেটা পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে বলল, 'তোমার কাছে পাইসা (পয়সা) আছে?' তাকে বললাম, 'পয়সা কোথায় পাব? না—নেই।'

জাফর আলি বিশ্বাস করল না। বলল, 'বহুৎসে কয়েদি গলার অন্দর থলিয়া বানিয়ে পাইসা রুপাইয়া সোনে চাঁদি ভি ছিপাকে নিয়ে আসছে। আর তুমি আনোনি, এটা আমি মানব?'

আমি হাঁ হয়ে গিয়েছিলাম। গলার ভেতর কোন কৌশলে গোপন থলি বানানো যায় এবং তার ভেতর সোনাদানা টাকা-পয়সা ঢুকিয়ে আনা যায় আন্দামানে না এলে জানতে পারতাম না। বললাম, 'মানা, না-মানা তোমার ইচ্ছা। সাফ বলে দিচ্ছি, আমার গলার ভেতর থলেও নেই, টাকা-পয়সাও নেই।'

জাফর আলি টিন্ডালের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা ছিল না। সে বলল, 'দশঠো কোতল করতে পেরেছ, আর গলায় একটা থলিয়া বানাতে পারোনি! ছোঃ—' প্রবল ঘৃণায় অলিন্দে থুতু ফেলে বলতে লাগল, 'পিনিক নেই, চরস নেই, পাইসা নেই। তোমার কাছে বেকার এসে টেইম (টাইম) বরবাদ করে গেলাম।' বলে আর দাঁড়াল না; বাঁদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জাফর আলি চলে যাবার পরও আমি গরাদ ধরে দাঁড়িয়েই আছি। ঘুম আসছিল না। সেই কয়েদিটা খুব কাছাকাছি কোনও একটা সেলে রয়েছে। তার কান্নার আওয়াজ শুনে তাই মনে হয়। তখন কত রাত কে জানে। যদি মধ্যরাতই হয়, আর কয়েক ঘণ্টা পর তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হবে। মৃত্যু পায়ে পায়ে যত এগিয়ে আসছে ততই তার আর্তনাদ আরও আরও তীব্র হয়ে উঠছে। 'হো ভগোয়ান রামজি, মুঝে বঁচা দে—'

সেলুলার জেলে সেই মুহূর্তে আমি ছাড়া আর বুঝিবা কেউ জেগে নেই। প্রায় হাজারটা সেলের সব কয়েদি ঘুমিয়ে পড়েছে। জাফর আলির মতো তারাও এরকম কত ফাঁসির আসামির বুক কাঁপানো কত আর্তনাদ শুনেছে। এতে তাদের কিছু আসে যায় না। নিশ্চিন্ত, বিঘ্নহীন তাদের রাতের ঘুম। অতন্দ্র শুধু ওয়াচ টাওয়ারের পাহারাদার আর রাইফেলধারী সেন্ট্রিরা।

রামজির কাছে জীবনদানের প্রার্থনা করতে করতে কয়েদিটার গলা চিরে চিরে যাচ্ছে। ভগোয়ান রামজির কানে সেই আর্জি পৌঁছচ্ছে কি না, কে বলবে। তার কান্নাটা ঘুমন্ত সেলুলার জেল জুড়ে একটা গা ছমছম-করা ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে।

আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। পা ভেঙে আসছিল। চার দিনের সমুদ্রযাত্রা, সাইক্লোন, তারপর সেলুলার জেলে পৌঁছে সমস্ত দিনের ধকল—শরীর আর কতক্ষণ সইতে পারবে! আমি দরজার কাছ থেকে কুঠুরির ভেতর দিকে চলে গেলাম। একপাশে খাবারের থালাটা চাপা দেওয়া রয়েছে। আরেক পাশে পায়খানা পেচ্ছাপের জন্য বড় গামলার মতো পাত্র। বিকেলে যে চাপাটি দেওয়া হয়েছিল তা ঠান্ডা হয়ে এতক্ষণে শুকনো চামড়া হয়ে গেছে। তা চিবতে গেলে দাঁতের গোড়া আলগা হয়ে যাবে। তাছাড়া খাওয়ার ইচ্ছাটা আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। চাপাটি ঢাকা দেওয়াই রইল। আমি এক গেলাস জল খেয়ে কম্বল পেতে কুঠুরির মাঝখানে শুয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম।

আমরা যারা সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী তাদের ঘুম খুব ঠুনকো। কেননা পুলিশ যে কোনও সময় তাদের আস্তানায় হানা দিতে পারে। তাই সামান্য আওয়াজেই জেগে যেতাম। পুলিশ না এলে ঠিক আছে। এলে তক্ষুনি পালাতে হবে।

'যত রাতেই ঘুমোই না কেন, ভোর হতে না হতেই উঠে পড়তাম। সেলুলার জেলেও তার ব্যতিক্রম কিছু হয়নি। পরদিন, তখনও ভালো করে সকাল হয়নি, বাইরে আবছা আবছা তরল অন্ধকার। প্রথমটা বুঝতে পারছিলাম না, কোথায় আছি। পরক্ষণে সেই ফাঁসির আসামির আর্ত চিৎকার ভেসে এল। খুব সম্ভব সমস্ত রাত সে একটানা কেঁদে গেছে। কেঁদে কেঁদে গলার স্বর এখন আরও বিকৃত, আরও ভাঙা ভাঙা। অলিন্দে পাহারাদারের বুটের আওয়াজ চলছেই। এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি সেলুলার জেলে রয়েছি।

আমি গামলার ওপর সে দিনের প্রথম প্রাকৃত কর্মটি সেরে নিয়ে সেটার মুখ ঢাকা দিলাম। তার খানিকটা দূরে খাবারের থালা। আরেকটু দূরে বিছানা। যেন স্বর্গালোকে চলে এসেছি। ভাবতেই মজাও লাগল, বেশ হাসিও পেল।

আমি দরজার কাছে চলে এলাম। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে ওটাই আমার একমাত্র যোগসূত্র। গরাদের ফাঁক দিয়ে দূরে তাকিয়ে থাকি। অন্ধকার আরও অনেকটা ফিকে হয়েছে। কিন্তু কাল রাতে কখন কুয়াশা পড়তে শুরু করেছিল খেয়াল করিনি। কুয়াশার ঘন স্তর চাদরের মতো মাউন্ট হ্যারিয়েট, সমুদ্র, জঙ্গল, আশপাশের ছোট ছোট দ্বীপগুলোকে মুড়ে রেখেছে। কোনও কিছুই স্পষ্ট নয়।

হঠাৎ অলিন্দের দূর প্রান্ত থেকে কর্কশ শব্দ ভেসে এল। 'ওঠ্ সালে লোগ, ওঠ্ ওঠ্। সুবেহ হো গিয়া—' আওয়াজটা ক্রমশ আমাদের এ প্রান্তের কুঠুরিগুলোর দিকে এগিয়ে আসছে। শুধু আমাদের দোতলাতেই নয়, একতলা, তেতলা এবং সামনের ব্লকেও একই রকম কর্কশ শব্দ। ব্যাপারটা এতক্ষণে বোধগম্য হল। ঘুমন্ত কয়েদিদের এইভাবে জাগানো হচ্ছে।

যে জাগাচ্ছিল তার গলাটা চেনা চেনা। কালই শুনেছি। যা ভেবেছিলাম তাই। সেই পেটি অফিসার, আসলাম খান। পাশের কুঠুরির বৈজুকে জাগিয়ে আমার কুঠুরির সামনে চলে এল। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হয়তো একটু খুশিই হল! তার প্রকাণ্ড মুখের ঘন দাড়িগোঁফের জঙ্গল ভেদ করে কোদালের

pathagar.net

banglabooks.in

মতো কয়েকটা দাঁত বেরিয়ে পড়ল। বোধহয় সেটা হাসিই। আমাকে ঘুম ভাঙাবার আগেই জেগে উঠতে দেখে সে মনে হয় খুশিই হয়েছে। সে বলল, 'শালে, টিরোরিস তেরে নিদ টুট গিয়া? শাব্বাশ!'

আমি জবাব দিলাম না। আসলাম খানের মতো আরও কত পেটি অফিসার, টিন্ডাল আর টিন্ডালদের মুখে এই মধুর শালে সম্ভাষণটুকু যে শুনতে হয়েছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে আমার নিজের একটা বোনও নেই। পৃথিবীতে ক'জনের আর এতগুলো ভগ্নীপতি পাওয়ার সৌভাগ্য হয়?

'সে যাই হোক, আসলাম খান এবার জিগ্যেস করল, 'কিয়া রে, টাট্টি (পাখানা) হো গিয়া? মুহ্ ধো লিয়া?'

'হ্যাঁ—' আমি ঘাড় কাত করলাম।

আসলাম খানের ঠোঁট দুটো আরও খানিকটা ফাঁক হয়ে আরও কয়েকটা দাঁত বেরিয়ে পড়ল। সে বলল, 'বহুৎ আচ্ছা টিরোরিস। থোড়ে টিইম (টাইম) বাদ সাফাইবালারা এসে টাট্টির বর্তন নিয়ে যাবে। সাত বাজে আমি এসে তোমাকে নিচে নিয়ে যাব। তখন সবেহকা নাস্তা মিলেগা। তৈয়ার থেকো।' সে আর দাঁড়াল না।

আধঘণ্টার মতো কেটে গেল। তারপর একজন আর্মড পুলিশ একটা সাফাইওয়ালা অর্থাৎ সুইপারকে সঙ্গে নিয়ে এল। তার হাতে চাবির গোছা। তালা খুলে পুলিশটি ছোট্ট সেলটা তীক্ষ্ণ চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল। আমার মতো একজন টেরোরিস্ট এক রাত্রির মধ্যে পায়ে বেড়ি-লাগানো অবস্থায় মহান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কোনও ষড়যন্ত্র করেছি কিনা এবং তার কোনও চিহ্ন কোথাও পাওয়া যায় কিনা সেটা দেখাই তার উদ্দেশ্য। সাফাইওয়ালা ময়লার গামলা মাথায় তুলে নিয়েছিল। তাকে নিয়ে নিঃশব্দে পুলিশটি বাইরে গিয়ে ফের তালা লাগিয়ে চলে গেল।

আমি দাঁড়িয়েই রইলাম। দেখতে দেখতে সূর্য উঠে গেল। কুয়াশার বেড়াজাল ছিঁড়ে ছিঁড়ে সোনালি রোদ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এদিকে পুরো সেলুলার জেগে উঠেছে। চারদিকে তুমুল ব্যস্ততা এবং হইচই। হঠাৎ খেয়াল করলাম, ফাঁসির আসামির চিৎকার থেমে গেছে। তবে কি তার শেষ ভরসা ভগোয়ান রামজির কাছে প্রার্থনা করেও ব্যর্থ হওয়ায় হতাশায় সে চুপ করে গেছে। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল।

আসলাম খান একজন সশস্ত্র পুলিশকে সঙ্গে করে আবার দর্শন দিল। তালা খুলে বলল, 'থালি লেকে চল টিরোরিস জনাব। নাস্তা তৈয়ার।' পায়ের বেড়ি খুলে আমাকে বাইরের টানা অলিন্দে নিয়ে আসা হল। আরও কয়েকজন টিন্ডাল আর পেটি অফিসার আর পুলিশ অন্য সেলগুলো খুলে কয়েদিদের বের করে ফেলেছে। সবার হাতেই খাবারের থালি আর জলের গেলাস।

পাশের কুঠুরির বৈজু আমার কাছে এগিয়ে এল। আমার থালিটার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে জিগ্যেস করে, 'কিয়া ভাইসাব, কাল রাত্তিরে আপনি খানা খাননি? আপনার থালিয়ায় চাপাটি পড়ে আছে?' তাকে বললাম, 'না, কাল খিদে ছিল না।' বৈজু বলল, 'আপনার থালিয়ায় চাপাটি দেখলে আজ আর নাস্তা দেবে না। ও দুটো আমি নিচ্ছি।' আমি কিছু বলার আগেই চকিতে ছোঁ মেরে আমার কালকের বাসি চাপাটি দুটো দিয়ে সবজি মুড়ে নিয়ে গরাদের ফাঁক দিয়ে নিজের কুঠুরিতে ছুঁড়ে দিল। হেসে ডগমগ হয়ে বলল, 'আপনাকে বলেছিলাম, আমার ভুখটা বহুৎ বেশি। চাপাটি দুটো আমার সেলে থাক। পরে খাওয়া যাবে।' আমি একটু হাসলাম শুধু। কিছু বললাম না।

এরপর পুলিশ, টিন্ডাল আর পেটি অফিসাররা শোভাযাত্রা করে কয়েদিদের সিঁড়ির দিকে নিয়ে যাওয়া হল। বৈজু আমার গায়ে জোঁকের মতো সেঁটে আছে। চলতে চলতে খাটো গলায় বলল, 'এখন নিচে নামিয়ে নিয়ে আমাদের নাস্তা দেওয়া হবে। ভাইসাব,আপনার ভাগ থেকে আমাকে থোড়া কুছ দেবেন।' এবারও জবাব না দিয়ে হাসলাম।

আমি আর বৈজু ছিলাম মিছিলের পেছনে। লেজের দিকে। হঠাৎ সামনের দিক থেকে রাজনাথ আর মুকুন্দ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে জিগ্যেস করল, 'পায়ে বেড়ি লাগিয়ে কালাপানির রাতটা প্রথম কেমন লাগল?' আমিও গলার স্বর উঁচুতে তুলে বললাম, 'তোফা। তোদের কেমন কেটেছে?' রাজনাথরা বলল, 'স্বর্গসুখ কাকে বলে এখানে না এলে জানতে পারতাম না।'

পুলিশ থেকে টিন্ডাল অব্দি সবাই হুমকির সুরে শাসায়, 'এ শালে লোগ, চিল্লাও মাৎ। বিলকুল খামোস। আগর চিল্লাওগে তো গলাকা নলিয়া ফাড় দুঙ্গা—'

অগত্যা সুবোধ বালকের মতো নিঃশব্দে এগিয়ে গেলাম। কাল আমাদের তিন বিপ্লবীকে অন্য কয়েদিদের ধারেকাছে ঘেঁষতে দেয়নি। দাগি আমের পাশে অন্য আম থাকলে তার গায়ে দাগ ধরতে পারে। বিপ্লবীরা কানে ফুসমন্তর দিয়ে এই কালাপানিতে যাতে দল ভারী করতে না পারে, তাই এই সতর্কতা। কিন্তু আজ কড়াকড়িটা আলগা কেন, আন্দাজ করতে পারলাম না। তাই একটু অবাকই হলাম।

অলিন্দ ধরে এগতে এগতে পাশের রেলিংয়ের ওপর দিয়ে নিচের চত্বরে নজর চলে যাচ্ছিল। সেখানে বিরাট বিরাট হাঁড়ি, হাতা, জলের ড্রাম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একদল টিন্ডাল আর পেটি অফিসার। বন্দুকওলা পুলিশে চারদিক ছয়লাপ। চোখে পড়ল উলটোদিকের ব্লক থেকে কয়েদিদের কাতার দিয়ে নামিয়ে আনা হচ্ছে। তাদের হাতেও থালা এবং গেলাস।

আমরা নিচে নেমে আসতেই হুংকার ছাড়তে ছাড়তে পেটি অফিসাররা লাইন করে কয়েদিদের দাঁড় করিয়ে দিল। দুটো লম্বা লাইন। একটা আমাদের ব্লকের কয়েদিদের; অন্যটা সামনের ব্লকের কয়েদিদের।

বৈজু আমাকে ছাড়েনি; গায়ে গায়ে লেগে পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে পারছি খাবার দেবার সময় সে কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়বে না।

কাল বিকেলে আমাদের তিন বিপ্লবীকে লাইন দিতে হয়নি। দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে পুলিশ চাপাটি-সবজি এনে দিয়েছিল। আজ মুড়ি-মিছরি সব একাকার। পুরনো কয়েদিদের ঝাঁকে আমরাও ভিড়ে গেলাম।

লাইন ঠিকঠাক দাঁড়িয়ে গেলে দুই অফিসার দুটো লাইনের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের হাতে দুটো মোটা বাঁধানো খাতা। তারা খাতা খুলে হাঁকতে লাগল, 'কয়েদি নাম্বার এক—' একজন হাত তুলে জবাব দিল, 'হাজির—' এইভাবে দুই লাইনের সব ক'টা কয়েদির নাম হাঁকার পর খাতা বন্ধ করল। অবশ্য আমাদের তিন বিপ্লবীকেও 'হাজির' বলে সাড়া দিতে হল।

আমার পেছন থেকে বৈজু নিচু গলায় বলল, 'হর রোজ সুবেহ্ সাম পুলিশ অফসাররা কয়েদি গিনতি (গুনে) দেখে। শালেদের ভয় কেউ হয়তো ভেগে গেছে। চারদিকে ইতনা ইতনা পেহেরাদার; কী করে ভাগবে বলুন ভাইসাব?'

আমি হাসলাম। বৈজু বলল, 'আমার ভুখের কথাটা মনে আছে তো?' বললাম, 'আছে, আছে—'

কয়েদি গোনা হয়ে যাবার পর একজন পুলিশ অফিসার চিৎকার করে হুকুম দিল। 'আভি নাস্তা চালু কর দে—'

'টিন্ডাল এবং পেটি অফিসাররা তৈরি হয়েই ছিল। তারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাঁড়ি থেকে মস্ত লোহার হাতায় কালচে হলুদ রঙের থকথকে তরল জাতীয় পদার্থ তুলে কয়েদিদের থালায় দিতে লাগল। প্রত্যেকের জন্য বরাদ্দ দু'হাতা। সেটা কম নয়; থালা প্রায় বোঝাই হয়ে গেল। খাবার নিয়ে প্রতিটি কয়েদি পাশের টিন্ডাল বা পেটি অফিসারের কাছ থেকে জল নিয়ে এক ধারে দাঁড়িয়ে খেতে শুরু করল। কালকের মতো সেলে নিয়ে গেল

banglabooks.in

না'।

আমাদের লাইনের সামনের দিকের কয়েদিরা একের পর এক খাবার এবং জল নিয়ে পাশের দিকে সরে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত আমার পালা এল। অন্যদের মতো আমিও প্রকাণ্ড দু'দলা থকথকে জিনিস আর জল হাতে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালাম। এক দৃষ্টে থালার দিকে তাকিয়ে আছি। এমন খাদ্যবস্তু আগে আর কখনও চর্মচক্ষে দেখিনি। তবে সেটা বেশ গরম। অল্প অল্প ধোঁয়া উড়ছিল। দু-চারটে আলু আর কুমড়োর টুকরোও চোখে পড়ছে। শুঁকে দেখলাম গন্ধটা কেমন যেন উৎকট।

একটু পরেই বৈজু ঊর্ধ্বশ্বাসে এসে হাজির। পাছে আমি খেয়ে ফেলি সেজন্য একরকম দৌড়ে এসেছে। খাবারের দিকে আঙুল বাড়িয়ে তাকে জিগ্যেস করলাম, 'এটাকে কী বলে?' বৈজু বলল, 'কাঞ্জি।' আমার নতুন প্রশ্ন। 'কী দিয়ে এটা তৈরি?' বৈজু বুঝিয়ে দিল, বহু পুরনো চালের খুদ, ভাঙা ভাঙা নানা ধরনের ডাল, আলু, কুমড়ো এবং আরও কয়েক রকম সবজি এবং মরিচ একসঙ্গে ফুটিয়ে এই বস্তুটি বানানো হয়। খুদ আর ডাল গুদামে থাকে তো। তার সঙ্গে চুহাকা টাট্টি অর্থাৎ ইঁদুরের নাদিও যে থাকবে না, হলফ করে তা বলা যায় না। রোজ প্রায় হাজারখানেক কয়েদির জন্য এত কাঞ্জি বানাতে হয়, তাই কে আর ইঁদুরের নাদি বেছে ফেলে দেবে? শুনেই আমার পেটের ভেতরটা পাক দিয়ে উঠল।

বৈজু যেন একশো বছরের খিদে পেটে নিয়ে আমার থালাটার দিকে তাকিয়ে ছিল। বলল, 'ভাইসাব, আমার হিস্যাটা দিয়ে দিন।' শুনে বেশ মজাই লাগল। কাল বিকেলে তার সঙ্গে প্রথম দেখা। কিন্তু এর মধ্যেই আমার খাবারের আধা-আধি ভাগের ওপর তার আইনসংগত অধিকার যেন জন্মে গেছে। ইচ্ছা হচ্ছিল, পুরো কাঞ্জিটাই ওর থালায় ঢেলে দিই। কিন্তু কাল দুপুরে জাহাজে শেষবারের মতো খেয়েছিলাম। তারপর পেটে এক ফোঁটা জলও পড়েনি। খিদেয় নাড়ি চুঁই চুঁই করছিল। কিছু তো একটা খেতে হবে। কাঞ্জি ছাড়া এখানে আর কিছু পাওয়ার উপায় নেই। আমার থালা থেকে অর্ধেকেরও বেশি ওর থালায় ঢেলে দিলাম। তারপর খুঁটে খুঁটে একটুআধটু মুখে দিতে লাগলাম। এখন থেকে এই বস্তুটি রোজ সকালে গলাদ্ধকরণ করতে হবে। ভাবতেই পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠতে লাগল।

খানিকটা দূর থেকে রাজনাথের গলা শোনা গেল। 'কেমন খাচ্ছিস রে শেখর?' তাকে পালটা জিগ্যেস করলাম, 'তুই কেমন খাচ্ছিস?' সে বলল, 'এমন ব্রেকফাস্ট চৌরঙ্গির গ্র্যান্ড হোটেলও তৈরি করতে পারবে না। যে রেঁধেছে, যদি কোনও দিন মুক্তি পাই, মেনল্যান্ডে ফেরার সময় তার পায়ের ধুলো নিয়ে যাব।' কিন্তু কলকাতায় আর তার ফেরা হয়নি। কিন্তু সেসব পরের কথা।

'আমি রাজনাথকে কী বলতে যাচ্ছিলাম, বলা হল না। তার আগেই কাল রাতের সেই করুণ, কাতর চিৎকার কানে এল। 'হো ভগোয়ান রামজি, মুঝে বঁচা দে—'

চমকে সামনের দিকে তাকালাম। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, মাঝারি হাইট, পরনে জেলের উর্দি, হাতে হ্যান্ডকাফ লাগানো, বয়স তিরিশের মতো একটা লোককে একজন ব্রিটিশ পুলিশ অফিসার এবং ছ'জন আর্মড পুলিশ আমাদের ব্লকের তেতলা থেকে নামিয়ে আনছে। এই কয়েদিটাই কাল অনেক রাত পর্যন্ত অবিরল কেঁদে কেঁদে ভোরের দিকে খুব সম্ভব থেমে গিয়েছিল। আবার এখন তার কান্না শুরু হয়েছে।

লক্ষ করলাম অন্য কয়েদিরাও তাকে দেখছে। কিন্তু সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। উদাসীন। তারা খেয়েই চলেছে। বৈজুও গোগ্রাসে খাচ্ছিল। খেতে খেতে বলল, 'কুছ টেইম (টাইম) বাদ ওর ফাঁসি হবে।' সেটা বুঝতেই পেরেছি। জিগ্যেস করলাম, 'ওর কী নাম?' বৈজু বলল, 'হরগোবিন।' বললাম, 'কেন ওকে ফাঁসি দেওয়া হবে?' কাল জাফর আলি টিন্ডালকে এই প্রশ্নই করেছিলাম। সে জবাবটা এড়িয়ে গেছে। বৈজু বলল, 'ওকে পুলিশ অফসর পাথর তোড়ার (পাথর ভাঙার) কাজ দিয়েছিল। ও রাজি হয়নি। তখন ওর খানা বন্ধ করে হাতে-পায়ে ডান্ডাবেড়ি লাগিয়ে কুঠুরিতে ঢোকানো হয়েছিল। হরগোবিন দো রোজ ভুখা থেকে বেহোঁশ হয়ে পড়ে। তখন পুলিশ অফসররা এসে জলটল দিয়ে হোঁশ ফেরায়। বলে আগে পাথর তোড়তে হবে, তবে খানা মিলবে। হরগোবিনের মাথার ঠিক ছিল না। সে হাতের হ্যান্ডকাফ এক পুলিশ অফসরের কানের ওপর শরীরের পুরা তাকত দিয়ে ঘা মারে। সেই চোটে অফিসার বিলকুল খতম। ইতনা বড়া কসুর জেলরসাব মাপ করেনি। হরগোবিনের ফাঁসির হুকুম হয়ে যায়।'

আমার খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মনটা বিষাদে ভরে যায়। জিগ্যেস করলাম, 'দেশে ওর কে আছে?' বৈজু একটা হাত ঘুরিয়ে বলল, 'কৌন জানে!'

'হরগোবিনকে পাহারা দিয়ে পুলিশবাহিনী সামনের ব্লকের পাশ দিয়ে ডান দিকে অদৃশ্য হয়ে যায়। হয়তো ওধারে কোথাও ফাঁসিঘর। হরগোবিনকে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু তার চিৎকার সমানে ভেসে আসছে। 'হো রামজি, মুঝে বঁচা দে।' কিন্তু সে হয়তো জানে না বঙ্গোপসাগরের এই কয়েদখানায় রামচন্দজিরও কিছুই করার নেই। এখানে তাঁর প্রবেশ নিষেধ।

একটু পরে হরগোবিনের কান্না থেমে গেল। ফাঁসিতে তার মৃত্যুর খবর হয়তো তার মা বাপ বউ বাচ্চা (যদি কেউ থাকে) কোনও দিনই জানতে পারবে না।

বেলা চড়ছিল। পেটি অফিসার এবং টিন্ডালরা কর্কশ স্বরে হাঁকতে লাগল। 'যা কুত্তেলোগ। নাস্তা হো চুকা। আভি আপনা আপনা ডিপটিমে (ডিউটিতে) চলা যা—'

'কয়েদিদের কীসের ডিউটি বুঝতে পারলাম না। ইন্ডিয়ার মেনল্যান্ডে থাকার সময় শুনেছি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা নিয়ে যারা এখানে আসে তাদের ওই জেলখানার সেলে বন্দি থেকে বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে হয়। কিন্তু এছাড়া এই নির্বাসিতদের যে আর কিছু করার আছে বা থাকতে পারে, আদৌ তেমন ধারণা ছিল না।

'লক্ষ করলাম, অন্য কয়েদিরা লাইন দিয়ে সামনের চত্বরে মাঝখানে যে লম্বা শেডটা রয়েছে একে একে তার ভেতর ঢুকতে লাগল। আর-একটা দলকে নিয়ে এক দঙ্গল আর্মড গার্ড আর কয়েকজন পুলিশ অফিসার জেল গেটের দিকে চলল।

'আমরা তিন বিপ্লবী—রাজনাথ, মুকুন্দ এবং আমি পরস্পরের কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমরাও কয়েদি। আমাদের কোনও ডিউটি দিতে হবে কি না এবং সেই ডিউটিটা কী ধরনের কেউ বলে দেয়নি।

'না, আমাদের ডিউটি দিতে হল না। একজন পুলিশ অফিসার আর কয়েকজন পুলিশ, তাদের হাতে রাইফেল'—আমাদের পাহারা দিয়ে দিয়ে তিন নম্বর ব্লকে যার যার কুঠুরিতে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে চলে গেল। সৌভাগ্যই বলতে হবে, আমাদের পায়ে এখন আর বেড়ি পরানো হল না। কিন্তু ঘণ্টা দুই-তিন পর কী ঘটবে, তখন কি আর জানতাম!

'আমার সেল থেকে আমাদের ব্লকের তিনটে ফ্লোরের অন্য কোনও সেলই দেখা যায় না। রাজনাথ আর মুকুন্দ কী করছে, জানি না। আমি জানলার গরাদ ধরে বাইরে তাকিয়ে রইলাম। একদল কয়েদিকে কিছুক্ষণ আগে পুলিশ পাহারায় জেলখানার বিশাল গেটের দিকে যেতে দেখেছিলাম। এবার চোখ পড়ল তারা গেট পেরিয়ে বাইরের রাস্তায় চলে গেছে। একটু পর তারা দূরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'হঠাৎ আবার নিচের চত্বরে হইচই শুরু হল। চমকে সেদিকে তাকালাম। আমাদের ব্লকের ষাট-সত্তরটি কয়েদি ফিরে আসছে। তাদের প্রত্যেকের কাঁধে ঢাউস-ঢাউস ভারী চটের বস্তা; হাতে কাঠের বেঁটে বেঁটে মোটা মুগুর। সামনের ব্লকের অনেক

pathagar.n

banglabooks.in

কয়েদিও বস্তা এবং মুগুর নিয়ে ওধারে যাচ্ছে। যথারীতি আর্মড গার্ড, টিন্ডাল আর পেটি অফিসাররা তো রয়েইছে।

আমাদের ব্লকের কয়েদিরা কেউ গেল তেতলায়, কেউ দোতলায়, কেউ বা একতলায়। দোতলায় যারা উঠেছে তাদের মধ্যে বৈজুকে দেখতে পেলাম কেন না সে আমার এবং তার সেলের মাঝামাঝি জায়গায় অলিন্দের রেলিং ঘেঁষে তার বস্তা আর মুগুর নামাল। পেটি অফিসার আসলাম খানকে তার পাশে দেখা গেল। আমাকে চোখের ইঙ্গিতে দেখিয়ে চাপা গলায় কিছু বললেন। তার শেষ দু'একটা শব্দ কানে এল।— 'খোদা মাত্ করো', বলে এদিক-সেদিক তাকিয়ে বড় করে হাঁ করল। তারপর গলার ভেতর হাত ঢুকিয়ে চোরা গর্ত থেকে একটা চামড়ার থলি বের করে সেটা থেকে একটা সিকি নিয়ে আসলাম খানের হাতে দিয়ে ফের থলিটা গলায় ঢোকাল। দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। চকিতে মনে পড়ে গেল কাল রাতে টিন্ডাল জাফর আলি জিজ্ঞেস করেছিল, আমার গলায় পয়সার থলি আছে কি না।

'সিকিটি নিয়ে আসলাম খান খুশি হল। চোখ কুঁচকে একটু হেসে বলল, 'তোর ভাইসাবের জন্যে ফিকর মাত্ কর। আভি ডিপটি চালু কর দে।'

'বুঝতে পারলাম আমার জন্যে পেটি অফিসারকে এই সিকিটি ঘুষ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন? একটা কারণ, আমার খাবার থেকে তাকে ভাগ দিই। বাকিটা স্পষ্ট ধরা যাচ্ছে না। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

'আসলাম খান এবং অন্য পেটি অফিসার আর টিন্ডালরা অলিন্দের নানা দিক থেকে হাঁকতে লাগল, 'শালে লোগ, ডিপটিমে বৈঠ যা। আট বাজ গিয়া—'

'আগে লক্ষ করিনি, এবার দেখলাম অলিন্দের যে পাশে রেলিং তার গা ঘেঁষে সারি সারি চৌকো পাথর এক ফুটের মতো লম্বা, এক ফুটের মতো চওড়া এবং ন'দশ ইঞ্চি পুরু সারি সারি পাতা রয়েছে। বৈজু একটা পাথর টেনে সেটার সামনে থেবড়ে বসে পড়ল। তারপর বস্তার মুখ খুলে উপুড় করে দিতেই অজস্র নারকেল ছোবড়া বেরিয়ে পড়ল। সেগুলোকে একধারে স্তূপাকার করে রেখে একেকটা ছোবড়া পাথরের পাটার ওপর রেখে মুগুর দিয়ে পিটতে শুরু করল। ধুপধাপ আওয়াজ উঠতে লাগল। অন্য কয়েদিদের দেখতে পাচ্ছি না, তবে সারা অলিন্দ জুড়ে একইরকম আওয়াজ হচ্ছে। একটানা, অবিরল।

'দেখতে লাগলাম, বৈজু নারকেল ছোবড়া পিটিয়ে ঝুরো থেকে সরু সরু সুতোর মতো আঁশ বা কয়ার বের করে একধারে রাখছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'এই তোমাদের ডিউটি?' বৈজু ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ভাইসাব!, সুবেহসে সাম তক। দো সের সুতো বের করতে হবে। দুপহরকা খানাকে লিয়ে এক ঘণ্টা কাম বন্ধ। দো সের সুতো যদি না দিতে পারি, রাতের খানা মিলবে না; তার ওপর পেটি অফিসারদের ডান্ডা।' জিজ্ঞেস করলাম, 'সব কয়েদিকেই কি ছোবড়া থেকে সুতো বের করতে হয়?' বৈজু বলল, 'নেহি।' চত্বরের লম্বা শেডটা দেখিয়ে বলল, 'ওটার ভেতর ঘানি আছে। অনেকের ডিপটি পড়ে নারিয়েল (নারকেল) থেকে হাত দিয়ে ঘানি ঘুরিয়ে হর রোজ পন্দ্র (পনেরো) সের তেল বের করতে হয়। এক ছটাক কমতি নেহি। তা হলেই ডান্ডা।' জানতে চাইলাম, 'কয়েদিদের জন্যে এই দু'রকমেরই ডিউটি?' বৈজু মুগুর চালাতে চালাতে জানালো, চার-পাঁচশো কয়েদিকে রোজ নাস্তা খাওয়ার পর সেলুলার জেলের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। তারা পাথর ভেঙে রাস্তা বানায়। বাড়িঘর তৈরিতে মজুরের কাজ করে; কেউ কেউ 'ফবিস'-এ (ফরেস্ট) গিয়ে কাঠ কাটে। কারও-কারওকে নিয়ে যাওয়া হয়

pathagar.net

banglabooks.in

শিপিং ডিপার্টমেন্টের 'ডক'-এর কাজে। সারাদিন কাজের পর তাদের সেলুলার জেলে এনে 'আবার যার যার কুঠুরিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এই বন্দিশালা, পোর্টব্লেয়ার শহর, সবই আংরেজরা কয়েদিদের দিয়ে বানিয়েছে।

'বৈজু বলতে লাগল, 'ভাইসাব, নয়া এসেছেন। দো-চার রোজ যাক, আপনাকে পুলিশ পেটি অফিসাররা এইসব ডিপটিতে লাগিয়ে দেবে।' হাড্ডি-তৌড় (হাড়ভাঙা) মেহনত না করলে কালাপানিতে খানা মেলে না।' চমকে উঠলাম, রাজবন্দিদের যে সেলুলার জেলে পায়ের ওপর পা তুলে আরামে দিন কাটাতে দেওয়া হয় না, সেটা বোঝার মতো বুদ্ধি আমার ঘটে আছে! কিন্তু নারকেল ছোবড় থেকে কয়ার বের করা, ঘানি টানা, রাস্তা ভাঙা—এই জাতীয় ডিউটিতে আমাদের জুড়ে দেওয়া হবে, কে ভাবতে পেরেছিল!

'একসময় কথাবার্তা থামিয়ে নিজের কাজে আরও ব্যস্ত হয়ে পড়ে বৈজু। সন্ধের আগে তাকে নারকেল ছোবড়া থেকে দু'সের সরু তার বের করতে হবে। তার কি খোশ গল্প করার মতো সময় আছে?

'আমার কোনও ডিউটি নেই; অন্তত আজকের দিনটার মতো। সময় আর কাটতে চায় না। সলিটারি সেলে বন্ধ দরজার গরাদ ধরে দূরের সমুদ্র, আকাশ মাউন্ট হারিয়েটের চুড়ো, সামনের ব্লকের সারি সারি কুঠুরি,—এসব একঘেয়ে, ক্লান্তিকর দৃশ্য আর কতক্ষণ দেখা যায়! আমার চোখে ব্যথা হচ্ছিল। মাথা টিপ টিপ করছে।

'একবার ভাবলাম শুয়ে পড়ি। মেঝেতে তো অনন্ত শয্যা পাতাই রয়েছে। কিন্তু শোওয়া আর হল না। হঠাৎ অলিন্দ জুড়ে মুগুর পেটানোর অবিরাম ভোঁতা আওয়াজ ছাপিয়ে কয়েক জোড়া বুটের ভারী, কর্কশ শব্দ কানে এল। আমি চকিত হয়ে উঠলাম। একটু পরেই পেটি অফিসার আসলাম খান, একজন ব্রিটিশ পুলিশ অফিসার আর কয়েকটি বন্দুকধারী গার্ড আমার সেলের সামনে এসে দাঁড়াল।

'আসলাম খান নিঃশব্দে সেলের দরজা খুলে আমার হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে বাইরে বের করে আনল।

'পুলিশ অফিসারটির সাড়ে ছ'ফিটের মতো হাইট, বিশাল মাংসল শরীর। প্রকাণ্ড মাথা, চোখের তারা নীল। মুখ দেখেই টের পাওয়া যায় লোকটা ভয়ানক নিষ্ঠুর। পোর্টব্লেয়ারে নামার পর যে ক'জন পুলিশ অফিসার দেখেছি তাদের সবার চেহারা প্রায় একই রকম। হিংস্র, নির্মম, নৃশংস। খুব সম্ভব বেছে বেছে এই ধরনের অফিসারকে আন্দামানে পাঠানো হয়েছে।

'আমার সামনে যে পুলিশ অফিসারটি দাঁড়িয়ে আছে সে পেটি অফিসার আসলাম খানকে বলল, 'ইস বাস্টার্ডকো হাতমে হ্যান্ডকাফ লাগাও—' এর আগেও অন্য এক অফিসার এইভাবে নোংরা গালাগাল দিয়েছিল। অসহ্য ক্রোধে শরীরের পেশিগুলো শক্ত হয়ে উঠল। কপালের দু'পাশে রগগুলো সমানে দপ দপ করছে। টের পাচ্ছি, চোখ দু'টো লাল হয়ে উঠেছে। দাঁতে দাঁত চেপে অফিসারের দিকে তাকালাম। ইচ্ছা হল, লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি।' অফিসার আমার মনোভাবটা হয়তো টের পেয়েছে। তার মুখ থেকে তোড়ে আরও কিছু বাছা বাছা কুৎসিত খিস্তি বেরিয়ে এল। হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো কিছু একটা করতে যাচ্ছিলাম, আসলাম খান আমাকে হাতকড়া পরাতে পরাতে খুব নিচু গলায় শুভাকাঙ্ক্ষীর মতো হুঁশিয়ারি করে দিল।— 'টিরোরিস (টেরোরিস্ট) শির গরম কোর না। এ বহোৎ খতারনাক অফসর। জানমে মার ডালেগা।' বৈজু যে আমার জন্য তাকে একটি সিকি দিয়েছে সেই কারণে হয়তো এই সতর্কবাণী।

'আসলাম খান এই ব্রিটিশ অফিসারটাকে খতারনাক অর্থাৎ বিপজ্জনক বলেছে। এখন পর্যন্ত যাদের দর্শন পেয়েছি তাদের কে যে কম খতারনাক, এখনও বুঝতে পারিনি। হাত-বাঁধা অবস্থায় আমার পক্ষে কী-ই বা করা সম্ভব? প্রতিশোধের স্পৃহাটাকে মনের গোপন কোনও কুঠুরিতে পুরে রাখলাম। যদি কোনওদিন সুযোগ পাই—'

'অফিসার আমার চোখের দিকে তাকিয়ে হুংকার ছাড়ল।— ইয়াদ রাখ, আমার নাম মাইকেল স্কট। ফির বেয়াদপি করোগে তো—' কথাটা শেষ করে বলতে লাগল, 'ইয়ে সেলুলার জেল। ইহাকা কানুন আলাগ। তোর মতো কুত্তা দো-চার টেরোরিস্টকে যখন ইচ্ছা খতম করে দিতে পারি।'

'লক্ষ করেছি, এখানকার সব ব্রিটিশ অফিসার হিন্দি-উর্দু মেশানো চোস্ত হিন্দুস্থানি বলতে পারে।

'মাইকেল স্কট আসলাম খানকে বলল, 'হারামিকা বাচ্চেকো লে চল—'

'আমাকে মাঝখানে রেখে আসলাম খানরা অলিন্দ ধরে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলল। চোখে পড়ল আরও দু'জন পুলিশ অফিসার এবং সশস্ত্র পুলিশরা রাজনাথ এবং মুকুন্দকে নিয়ে একই কায়দায়, অর্থাৎ হাতকড়া লাগিয়ে একই দিকে যাচ্ছে।

'নিচে তিন নম্বর, চার নম্বর এবং পাঁচ নম্বর ব্লক পার হয়ে ছ'নম্বর ব্লকের পেছনে নির্জন একটা এলাকায় আমাদের নিয়ে আসা হল। এখানে ডজনখানেক ত্রিভুজের মতো স্ট্যান্ড দাঁড় করানো রয়েছে। সেই আমার প্রথম 'টিকটিকি' দর্শন। প্রতিটি স্ট্যান্ডের দু'টো আট ফুটের মতো লম্বা কাঠের পায়া সামনের দিকে রয়েছে। পেছনে একটা পায়া। সব মিলিয়ে জিওমেট্রির ত্রিভুজ। সামনের দু'টো পায়ায় প্রায় সবটা জুড়ে কাঠের পুরু পাটাতন আটকানো। চোখে পড়ল, ডানপাশে সলিড ইটের দেওয়াল লম্বা কাঠের ব্র্যাকেটে সারি সারি হুক লাগানো। সেই হুকগুলো থেকে চাবুক ঝুলছে। এখানে টেনে আনার মতলবটা এতক্ষণে মোটামুটি টের পাওয়া যাচ্ছে।

'যে তিন পুলিশ অফিসার এখানে রয়েছে, মাইকেল স্কট তাদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র। আরও দু'জন পেটি অফিসারকেও দেখা গেল। শরীরের বিশাল কাঠামো আর দাড়ির জঙ্গল দেখে আন্দাজ করা যায় তারা পাঠান।

'মাইকেল স্কট কোমরে দুই হাত রেখে গমগমে গলায় হুকুম দিল।—'পেটি অফিসার, এ শালে তিন টেরোরিস্টকো হ্যান্ডকাফ খুলো, উর্দি হটাকে নাঙ্গা কর, আউর 'টিকটিকি' পর চড়াও।'

'চোখের পলকে তিন পেটি অফিসার আমাদের তিনজনের হাতকড়া খুলে, উলঙ্গ করে, 'টিকটিকি'র সামনে নিয়ে এল। বুকটা কাঠের পাটাতনে ঠেকিয়ে দুই ফাঁক করে দুই পায়াতে মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে, হাতদুটো পাটাতনের পাশ দিয়ে পেছন দিকে নিয়ে বেঁধে ফেলল। তারপর তিনজনে তিনটে চাবুক এনে আমাদের তিনজনের পেছনে পজিশন নিয়ে দাঁড়াল।'

'হুকুম সুচারুরূপে পালন করা হয়েছে কি না নিরীক্ষণ করার পর মাইকেল স্কট বলল, 'শালে এই তিন টেরোরিস্ট কাল জেলর সাহেবের কাছে আজাদির কথা বলেছিল। আজাদির টেস্ট কেমন লাগে ওদের সমঝিয়ে দে। পন্দ্র (পনেরো) চাবুক—'

'কেন আমাদের 'টিকটিকি'তে চড়ানো হয়েছে, এবার তার কারণটা স্পষ্ট হয়ে গেল। চোখ বুজে পেশিগুলো পাথরের মতো শক্ত করে রইলাম।

'একটু পর খোলা পিঠে চাবুকের ঘা পড়ল। আসলাম আমাকে সজুত করে নিয়েছে। আঘাতটা তেমন জোড়াল মনে হল না। তবু বুঝতে পারলাম চামড়া কেটে গেছে। মুখটা 'টিকিটিকি'র ওপর চেপে রয়েছে এমনভাবে যে রাজনাথ আর মুকুন্দকে দেখতে পাচ্ছি না। সাঁই সাঁই আওয়াজে টের পাওয়া যাচ্ছে ওদের পিঠেও চাবুকের পর চাবুক পড়ছে। এর আগে কনফেশন আদায়ের জন্য আলিপুরে, দমদমে বা মেদিনীপুরের জেলে আমাদের ওপর কম নির্যাতন চালানো হয়নি। কিন্তু আমাদের মুখ দিয়ে টুঁ শব্দটি বেরয়নি। সেটা যেন ইংরেজের কাছে এক ধরনের পরাজয়।

pathagar.n

banglabooks.in

সেলুলার জেলেও মুখ বুজে রইলাম।

'পনেরো ঘা চাবুকের হুকুম ছিল কিন্তু দশ পর্যন্ত গুনতে পেরেছি। তারপর চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে গেল। যখন জ্ঞান ফিরল দেখি একটা বেডে শুয়ে আছি। পাশাপাশি আরও দুটো বেডে রাজনাথ আর মুকুন্দ।' তাদের তখনও জ্ঞান ফেরেনি। আমাদের তিনজনেরই বুকে পিঠে মোটা করে ব্যান্ডেজ বাঁধা। পরে জানলাম ব্রিটিশ আমলে জেলখানার ভেতর একটা ছোট হাসপাতাল ছিল। চাবুক মারার পর রক্তাক্ত, বেহুঁশ হয়ে পড়লে আমাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়।

'দিন-চারেক বাদে আমাকে আবার আমার সেলে ফিরিয়ে আনা হয়। আমার পিঠের ঘা তখন শুকিয়ে এসেছে। ভাগ্যিস বৈজু একটা চৌ-আনি ঘুষ দিয়েছিল আসলাম খানকে, তাই চাবুকটা তেমন জোরে হাঁকায়নি। কিন্তু রাজনাথ আর মুকুন্দ ফিরেছিল দশ-বারো দিন পর। ওদের ঘা শুকোতে আরও অনেকটা সময় লেগেছিল। এই ক'দিন ওদের তিনবেলার বরাদ্দ খাবার সেলেই দিয়ে যেত পেটি অফিসার, কী টিন্ডালরা।

'ঘা পুরোপুরি শুকিয়ে এলে অন্য কয়েদিদের মতো আমাদেরও ডিউটিতে জুড়ে দেওয়া হল। প্রথম দিকে বৈজুদের মতো নারকেল ছোবড়া পিটিয়ে সরু সরু তার বের করার কাজ। দিনে দু'সের। সকালে 'কাঞ্জি' খেয়ে ছোবড়ার বস্তা নিয়ে আমরা তিন বিপ্লবী কাঁধে ছোবড়ার বস্তা, হাতে মুগুর নিয়ে যে যার কুঠুরির সামনে বসে গেলাম। অন্য কয়েদিরা তো চারপাশে রয়েইছে।

'শক্ত ছোবড়ায় ঘা দিতেই প্রথম দিকে মুগুর ঠিকরে ঠিকরে উঠছে। ছোবড়া যেমনকে তেমন। বিকেল বেলায় দু'সের তার কী করে বের করব জানি না। তখন আবার কী ধরনের জুলুম চালানো হবে, কে জানে।'

'আধ ঘণ্টা মুগুর চালাবার পর যে তার বের করতে পারলাম তার ওজন আধপোয়াও হবে না। গল গল করে ঘাম বেরিয়ে জেলের উর্দি ভিজে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় হাত যেন কাঁধ থেকে খসে পড়বে।' কপালের দু'পাশের শিরাগুলো দপ দপ করছে।

'এদিকে পেটি অফিসার, টিন্ডাল আর ওয়ার্ডাররা মাঝে মাঝে এসে কয়েদিদের 'ডিপটি' (ডিউটি) তদারক করে যাচ্ছে।'

'বৈজু আমার কাছাকাছি বসে ছোবড়া পিটছিল। চার বছর সে এই জেলে আছে। ছোবড়া থেকে তার বের করাটা তার কাছে জলভাত। হঠাৎ তার নজর এসে পড়ল আমার দিকে। আমার সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে আঁচ করে নিয়ে চাপা গলায় বলল, 'ফিকর মাত্ কর ভাইসাব। তোমার খানার আধা হিস্যা নিচ্ছি। তোমার দিকটা তো দেখতে হবে।' সে হাত বাড়িয়ে আমার পাশে যে ছোবড়া স্তূপাকার হয়ে আছে, তা থেকে অনেকগুলো টেনে নিয়ে বলতে লাগল, 'রোজ তোমার জন্যে এক সের তার বের করে দেব। বাকিটা তুমি করবে।'

'বৈজু অকৃতজ্ঞ নয়। কিন্তু ভেবে অবাক হচ্ছিলাম, লোকটার গায়ে কী দানবিক শক্তিই না রয়েছে! নিজের দু'সের তার বের করার সঙ্গে সঙ্গে আমার জন্য এক সের বের করে দেবে! সেদিন থেকে এটাই চালু হয়ে গেল।

'আমার ডিউটি অর্ধেক হালকা হয়ে গেছে। কিন্তু সূর্যাস্তের আগে এক সের তার তো বের করতে হবে। সেটাও আমার বেঁচে থাকাটা বরবাদ করে ছাড়বে। আমি ফের মুগুর চালাতে শুরু করলাম।

'হঠাৎ তীক্ষ্ণ, ক্রুদ্ধ চিৎকারে সামনের দিকে তাকাই। অলিন্দের মাঝামাঝি জায়গায় নিজের কুঠুরির সামনে ছোবড়ার বস্তা এনে রাজনাথকে বসতে দেখেছিলাম। তারপর নিজের ছোবড়া নিয়ে প্রায় অন্ধকার দেখছিলাম। অন্য কোনও দিকে লক্ষ ছিল না।

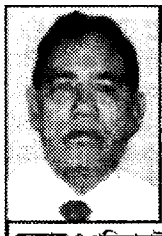

লোকে চেনে, তাই আসে
বহু জ্যোতিষীর জ্যোতিষ গুরু
জ্যোতিষ অধ্যাপক/
ডক্টর রূপেশ চক্রবর্তী
যে কোন সমস্যার সমাধানে
9830073130, 9231674828
চেম্বার ঃ গড়িয়াহাট, সল্টলেক, সিঁথিমোড়, উষাগেট, হাওড়া, এছাড়া আসাম, গুয়াহাটিতে নিজস্ব চেম্বার 'সমাধান'-এ বসবেন
অগ্রিম বুকিং (9854274257/9854726873)
Website : www.astrologerrupesh.com
সোনার বাংলা চ্যানেলে প্রতি মঙ্গল দুপুর ২টো, শনি রাত্রি ১০.৫০, রবিবার রাত্রি ১০.১০ মিনিটে অনুষ্ঠান দেখুন।

শত শত ম্লানমুখ উচ্ছ্বসিত

জ্যোতিষ, তন্ত্র ও আধ্যাত্মিক চেতনার শীর্ষে থাকা যেই মহান তান্ত্রিককে ঘিরে সমস্যায় জর্জরিত মানুষের অবিরাম স্রোত। লোভ, শঠতা ও মিথ্যাচারের উর্দ্ধে থাকা সেই অসাধারণ তন্ত্রোজ্ঞ/জ্যোতিষীই
* পি. ভট্টাচার্য্য'র পুত্র
সুমন ভট্টাচার্য্য
অহংবোধহীন, নিষ্ঠাবান এই মহা মহা-তান্ত্রিকের সুক্ষ্ম বিচার, নির্ভুল ভবিষ্যৎবাণী এবং পরশ পাথরতুল্য প্রতিকারের ছোঁয়ায় শত শত ম্লানমুখ উচ্ছ্বসিত —দুঃখ জয়ের আনন্দে।
চেম্বার ঃ হাজরা, ডানলপ, শিয়ালদহ, যাদবপুর, ব্যারাকপুর, শিলিগুড়ি ও চাকদহে নিজ গৃহ মন্দিরে।
97353 48302, 95644 64246, 95647 44092

কেষ্টপুরে প্রখ্যাত মহিলা জ্যোতির্বিদ
ভাগ্যলক্ষ্মী মঞ্জুশ্রী মা

তারা মায়ের কৃপাধন্যা যোগ, জ্যোতিষ ও তন্ত্রে কঠিন সমস্যার সমাধানে সিদ্ধহস্তা। বিদ্যায় বাধা, ব্যবসায় লোকসান, চাকরীতে উন্নতি, বাস্তুদোষ খন্ডন, কালসর্পদোষ ছাড়াও হাত, কোষ্ঠী দেখা ও তৈরী করেন।
অশুভ গ্রহের প্রতিকারও করেন।
ভি.আই.পি. কেষ্টপুর, এ.সি.-২৩২, প্রফুল্লকানন (পূর্ব), কলকাতা - ১০১
9433148752/9836627231

তন্ত্রযোগ জ্যোতিষে যিনি চিরদিনই পারদর্শিনী বাংলার জ্যোতিষ জননী

খনা মা
বোলো না কাতর স্বরে,
বৃথা জনম এ সংসারে-
জীবনে সমস্যা হতেই পারে,
ভয় কি ? আমি তো আছি সকলের তরে।
খনার বচন শুনুন ও মন্ত্র লিখুন। সোনার বাংলা শনি ১২টা, রবি রাত ৯টা। 'সৃষ্টি'তে রবি ৩টা।
ঢাকুরিয়া, হাজরা, শেওড়াফুলি, বালি, বারাসাত, সল্টলেক, সিঁথি।
25312929, 9831070429/58429

banglabooks.in

'আমাদের এই দোতলায় মোট তিনটে পেটি অফিসার। দু'জন পাঠান, একজন জাঠ। আসলাম খান, মোবারক খান আর ধর্মা সিং। ধর্মা রাজনাথের সামনে দাঁড়িয়ে সেকেন্ডে মুখ থেকে বারো-চোদ্দোটা করে কুৎসিত খিস্তি দিয়ে যাচ্ছে। —'শালে কুত্তেকে বচ্চে কালাপানিতে তোকে আরাম করার জন্যে নিয়ে আসা হয়েছে। বল্লা (মুগুর) উঠাকে লে। সামকো দো সের তার না পেলে তোর হাড্ডি ঢিলা করে ছাড়ব।'

লক্ষ করলাম, কোলে হাত রেখে নির্বিকার থেবড়ে বসে আছে রাজনাথ। এমনিতে তার মেজাজ খুব চড়া। আত্মসম্মানে এতটুকু ঘা লাগলে সে ফুঁসে ওঠে। কিন্তু এখন সে যেন সারা গায়ে পুরু এঁটে রয়েছে। বাপ-মা চোদ্দোপুরুষ তুলে ধর্মা সিং যে গালাগালের স্রোত বইয়ে দিচ্ছে তা যেন শুনতেই পাচ্ছে না। খিস্তিগুলো তার গায়ে লেগে যেন ঠিকরে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। ধর্মা সিং যতই বলে 'বল্লা (মুগুর) উঠা—' সে মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলে, 'না।'

'অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর যখন কাজ হল না, ধর্মা সিং দৌড়ে সিঁড়ির দিকে চলে গেল। কয়েক মিনিট বাদে পুলিশ অফিসার মাইকেল স্কটকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। তাকে নিশ্চয়ই রাজনাথের বিরুদ্ধে নালিশ জানানো হয়েছিল। রাগে তার লালচে মুখ আগুনের মতো গন গন করছে। রাজনাথের দিকে আঙুল বাড়িয়ে সে গজরে উঠল, 'হারামি, ডিউটি দিচ্ছিস না কেন? পিক আপ দা ক্লাব—' রাজনাথ আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে।—'নেভার?' একজন কালাপানি খাটতে আসা কয়েদির এতটা দুঃসাহস হতে পারে, বুঝিবা কল্পনা করতে পারেনি মাইকেল স্কট। তার আগুনের গোলার মতো চোখ দু'টো স্থির হয়ে যায়। হিন্দুস্থানিতে জিজ্ঞেস করে, 'মতলব?'

'রাজনাথ বলল, 'আমি ছোবড়া পিটব না। আমরা অর্ডিনারি কয়েদি নই; পলিটিক্যাল প্রিজনার।'

'দাঁতে দাঁত চেপে মাইকেল স্কট বলল, 'একবার 'টিকটিকি'তে আবার চড়ার ইচ্ছা আছে?'

'রাজনাথ বলল, 'একবার কেন, আমরা আন-আর্মড প্রিজনার, দশবার চড়াতে পার, ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতে পার, কিন্তু নারকেল ছোবড়া থেকে তার বের করাতে পারবে না।'

'আমিও বলতে যাচ্ছিলাম, 'আমরা অর্ডিনারি কয়েদি নই, পেট্রিয়ট— কিন্তু বৈজু ত্রস্তভাবে হাত বাড়িয়ে আমার মুখ চেপে ধরল, কিছুতেই বলতে দিল না। আমার ওপর তার বোধহয় বেশ মায়া পড়ে গিয়েছিল। আমি যদি রাজনাথের মতো রুখে দাঁড়াই, মাইকেল স্কটের রোষ এসে পড়বে আমার ওপরেও। সেটা বৈজু চায় না।

'ওদিকে রাজনাথের স্পর্ধায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে মাইকেল স্কট। সে অলিন্দের মেঝেতে প্রচণ্ড শব্দে বুট ঠুকতে ঠুকতে হুমকির পর হুমকি দিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু রাজনাথকে টলানো গেল না। এমন একজন ঠেঁটা বেয়াদব কয়েদিকে নিয়ে কী করবে, সে বুঝে উঠতে পারছে না।' শেষ পর্যন্ত পেটি অফিসার ধর্মা সিংকে বলল, 'এ শালেকো কুঠুরিতে ঘুসিয়ে তালা লাগাও। আজ ইসকো দুপহরকা খানা বন্ধ—'

রাজনাথকে সেলে পুরে ফেলা হল। বুঝতে পারালাম, সেলুলার জেলে বেয়াড়া কয়েদিদের টিট করার জন্যে যতরকম মোক্ষম মুষ্টিযোগ আছে তার মধ্যে একটা হল খানা বন্ধ, অর্থাৎ খেতে না দিয়ে উপোস করিয়ে রাখা।

কিন্তু রাজনাথ অন্য ধাতুতে তৈরি। সেদিন দুপুরে কেন, রাতেও তাকে খাবার দেওয়া হল না। শুধু সেদিনই নয়, পর পর তিন দিন। তাতেও তাকে শায়েস্তা করা সম্ভব হল না। কিছুতেই সে ছোবড়া পিটিয়ে তার বের করবে না। অগত্যা তাকে পোর্ট ব্লেয়ারের কাছে ছোট ভাইপার আইল্যান্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানেও জেলখানা, ফাঁসিঘর আছে। অনেক পরে জেনেছিলাম, রাজনাথ ওখানে সলিটারি সেলে থেকে থেকে পাগল হয়ে যায়।

যাই হোক, দু'তিন মাস ছোবড়া পেটানোর পর মুকুন্দ আর আমাকে চত্বরের একধারে যে ঘানিঘরের শেড রয়েছে, সেখানে ডিউটি দেওয়া হয়। হাতে ঘানি ঘুরিয়ে রোজ পনেরো সের তেল বের করতে হবে। দিনের শেষে সেই তেল মেপে নেবে মাইকেল স্কট। বৈজু খাবাবের বখরার জন্য আমার সঙ্গ ছাড়ছিল না। পেটি অফিসার আসলাম খানকে নগদ আট আনা ঘুষ দিয়ে ছোবড়া পেটানোর ডিউটি ছেড়ে ঘানি টানার ডিউটি নিয়েছিল। স্বীকার না করলে বেইমানি হবে, তাই বলছি, আমার অর্ধেক তেল সে-ই ঘানি টেনে বের করে দিত।

ঘানিঘরে এসে অন্য কয়েকজন বিপ্লবীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তাঁরা হলেন ঢাকার ব্রজ চক্রবর্তী, ময়মনসিংয়ের রাখাল দত্ত, মেদিনীপুরের চিত্তরঞ্জন পাল এবং আরও চার পাঁচজন। এঁরা সবাই আমার আর মুকুন্দর চেয়ে বয়সে বড়। তাঁদের আমরা দাদা বলতাম। ওঁরা থাকতেন চার আর পাঁচ নম্বর ব্লকে। ব্রজদা ছিলেন খুবই মজাদার মানুষ। হাসিখুশি। প্রথম দিন আলাপ পরিচয়ের পর জিগ্যেস করলেন, 'আন্দামানের জেলে কতদিন কাঞ্জি নামে উপাদেয় লাপসি ভক্ষণ করছ?' অর্থাৎ আমরা এখানে কতকাল আছি সেটাই তাঁর জিজ্ঞাস্য। কেননা পাশাপাশি ব্লকে থাকলেও ঘানিঘরে ঢোকার আগে কারও সঙ্গে কারও দেখা হওয়া সম্ভব হয়নি। তবে সেলুলার জেলে পা দিয়েই শুনেছিলাম, আরও কয়েকজন কয়েদি এখানে আছেন। খুব সম্ভব খবরটা বৈজুই দিয়েছিল। ব্রজদাকে বললাম, 'কয়েক মাস খাচ্ছি। আপনারা?' ব্রজদা বললেন, 'তিন বছর। তা এখানে কেমন লাগছে?' আমার মুখে একটু হাসি ফুটেছিল। তাতেই উত্তরটা ছিল। ব্রজদা আমাকে চাঙ্গা করার জন্য বললেন, 'মোটেও মন খারাপ করবে না। ভাববে এটাই স্বর্গ সুখ।'

রবিবার আমাদের ঘানি ঘোরাতে হত না। তবে সব কয়েদিকে চত্বরের কল থেকে বালতি বালতি জল টেনে এনে ব্লকের সেল, অলিন্দ ধুয়েমুছে ঝকঝকে তকতকে করে রাখতে হত। কোনও কোনও রবিবার জেলার কি জেল-সুপারিনটেনডেন্ট হঠাৎ হঠাৎ ইন্সপেকশনে আসতেন। সেজন্য এই ব্যবস্থা।

রবিবার বিকেলের দিকটা ছুটি। অন্য দিন ডিউটির সময়টা ঘানিঘরে কাটত, বাকি সময় সেলে। কিন্তু রবিবার বিকেলে কুঠুরিতে বন্দি থাকতে হত না। বিপ্লবীদের যার যার ফ্লোরের অলিন্দে ঘোরাঘুরির পারমিশন ছিল; কিন্তু তার বাইরে যাবার হুকুম ছিল না। তবে সাধারণ কয়েদিদের বেলায় কোনও বাধা নেই। তারা চত্বরে নেমে গিয়ে আড্ডা জমাত।

জেলখানার একঘেয়ে ক্লান্তিকর জীবনে একবার অদ্ভুত দুটো বই হাতে এসেছিল। 'আলির সঙ্গে হনুমানের লড়াই' আর 'সোনাভান বিবির কেচ্ছা'। বাজে নিউজপ্রিন্টে ছাপা, এক বিঘত মাপের চটি বুকলেট। কারা দিয়েছিল, কীভাবে জেলে এসেছিল, মনে নেই। 'আলির সঙ্গে হনুমানের যুদ্ধ'-এ কে শ্রেষ্ঠ তা প্রমাণ করার চেষ্টা ছিল। আমি অবাক হয়ে গেছি।

এক ছুটির বিকেলে আমাদের দোতলার অলিন্দে রেলিংয়ে হাতের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। পাশে বৈজু। হঠাৎ চোখে পড়ল এক শা-জোয়ান মুসলমান কয়েদি এবং এক হিন্দু কয়েদি কুস্তির তোড়জোড় করছে। দু'জনকে ঘিরে অন্য কয়েদিরা গোলাকার সার্কল তৈরি করে বসে আছে। তাদের চোখেমুখে তীব্র উত্তেজনা।

'সেলুলার জেলে আসা ইস্তক এমন বিচিত্র ঘটনা আগে আর চোখে পড়েনি। কী কারণে এই মল্লযুদ্ধ? দেখলাম বৈজু তা জানে। সে মুসলমান এবং হিন্দু দুই প্রতিদ্বন্দ্বী কয়েদিকে দেখিয়ে বলল, 'ওর নাম লিয়াকত আর ও হল ধনিরাম। ওদের মধ্যে বাজি হয়েছে।' কী বাজি, না যে লড়াইয়ে জিতবে তাকে অন্যের ধর্ম

pathagar.n

banglabooks.in

নিতে হবে।'

এমন উদ্ভট, আজগুবি পণের ব্যাপার আমার চোদ্দো পুরুষে কেউ কোনও দিন শোনেনি। নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছিল না।

ওদিকে লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছিল। একে অন্যের মাথায় মাথা ঠেকিয়ে প্রবল মুষ্টিতে একে অন্যের হাত ধরে, হাঁটুতে শরীরের সবটুকু শক্তি জড়ো করে ঠেলছে। কেউ তিন পা পিছোচ্ছে, কেউ পাঁচ পা। এইভাবে ভিড়ের দিকে চলে যাচ্ছে। তারপর আবার ঠেলাঠেলি করতে করতে সার্কেলের মাঝখানে চলে আসছে। ঘামে দু'জনেরই উর্দি ভিজে উঠেছে। কিন্তু কেউ হটতে রাজি নয়। দু'জনেরই মরণপণ প্রতিজ্ঞা কোনওভাবেই হারবে না। প্রাণ গেলেও ওই যুদ্ধ জিততেই হবে।

চারপাশের দর্শকরা সমানে উন্মাদের মতো চিৎকার করে দু'জনকেই উৎসাহ দিয়ে চলেছে। আমার চোখের পাতা পড়ছিল না। শেষ পর্যন্ত কী হত, জানি না। আচমকা এমন এক লড়াইয়ের খবর পেয়ে চত্বর কাঁপিয়ে দৌড়তে দৌড়তে পুলিশ অফিসার মাইকেল স্কট এসে হাজির। তাঁর পেছন পেছন এক দঙ্গল রাইফেলধারী পুলিশ।

ইংরেজি সিনেমার বুল ফাইটের দৃশ্যে যে ষাঁড়দের দেখা যায় তাদের মতোই অসীম শক্তি লোকটার শরীরে। চিৎকার করে ইংরেজি আর হিন্দিতে কিস্তি দিতে দিতে যারা থেবড়ে বসে লড়াই দেখছিল তাদের ভেদ করে মঞ্চে ঢুকে পড়ল। —'হারামি, সন্স অফ বিচ—' আওড়াতে আওড়াতে লিয়াকত আর ধনিরামের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু'জনেরই চুলের গোছা ধরে ধাক্কা মারতে মারতে দু'ধারে সরিয়ে দিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বলতে লাগল, 'গায়ে খুব তাকত হয়েছে— হ্যাঁ?' সেলুলার জেলের স্পেশাল পেনাল কোডে এই ধরনের অপরাধের শাস্তি কী হতে পারে, হয়তো লেখা নেই। তাই বলল, 'ফির এমন দেখলে ডান্ডাবেড়ি আর সাতরোজ খানা বন্ধ।'

সেলুলার জেলে হরেক রকম নিগ্রহের নিখুঁত বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু 'খানা বন্ধ'-এর চেয়ে বড় শাস্তি আর নেই। সেটাই আপাতত প্রয়োগ করার ভয় দেখাল মাইকেল স্কট।

অন্য কয়েদি যারা অনন্ত কৌতূহল নিয়ে লড়াই দেখছিল, মাইকেল স্কট এসে পড়ায় যে যেদিকে পারে চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল। ধনিরাম আর লিয়াকতও দাঁড়িয়ে থাকল না। একজন পালাল চার নম্বর ব্লকের দিকে। আরেকজন ঘানিঘরের পেছন দিকে। দু'জনের ধর্মই রক্ষা হল।

পরের রবিবার দেখতে পেলাম ধনিরাম আর লিয়াকত পাশাপাশি বসে খুব গল্প করছে আর কী এক মজার কথায় একজন আরেক জনের গায়ে হেসে হেসে ঢলে পড়ছে। বিচিত্র এই সেলুলার জেল।

কত রকম কয়েদি যে দেখেছি তার লেখাজোখা নেই। তখন বার্মা ছিল ইন্ডিয়ার একটা প্রভিন্স। সেই সময়ের অখণ্ড বাংলাদেশে যত বাঙালি ছিল তার চারভাগের একভাগ বার্মায়। সেখান থেকে বাংলাদেশের তুলনায় দ্বিগুণ কয়েদি আসত কালাপানিতে।

এক বর্মি কয়েদিকে দেখেছি ঘানিটানা, রাস্তার পাথর ভাঙা বা ছোবড়া পেটার ভয়ে সেলের ভেতর উলঙ্গ হয়ে সারা গায়ে কাঞ্জি মেখে বসে থাকত। যেন বদ্ধ পাগল। আরেকজন, কোন প্রভিন্সের মনে নেই— গায়ে বিষ্ঠা মেখে থাকত। দুর্গন্ধে টেকা দায়। এই ধরনের সেয়ানা পাগলরা কিন্তু কাজের কাজটি গুছিয়ে নিতে পারত। জেল অথরিটিকে ধোঁকা দিয়ে ডিউটি মকুব করিয়ে নেওয়ার ফন্দিটা তারা ভালোই বের করেছিল।

আরেক রবিবারের কথা মনে পড়ে। মুকুন্দ আর আমি বিকেল বেলায় অলিন্দে ঘুরছিলাম। আন্দামান নিকোবর ম্যানুয়েল অনুযায়ী এখানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মানে পুরো পঁচিশ বছর কাটাতে হয়। সেই দণ্ডাদেশ দিয়েই আমাদের এখানে পাঠানো হয়েছে। তাই নিয়েই দু'জনে কথা বলছিলাম। বৈজু ছুটির দিনের বিকেলটা আমার সঙ্গে কাটায়। আজ সে নেই। নিচের চত্বরে অন্য কয়েদিদের সঙ্গে আড্ডা দিতে গেছে। ওপরের অলিন্দ থেকে তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

হঠাৎ নিচে হইচই শোনা গেল। কয়েদিদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। মুকুন্দ আর আমি অলিন্দের ধারে রেলিংয়ের কাছে চলে এলাম। চোখে পড়ল, একটা কয়েদিকে কোমরে শিকল এবং হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে চত্বরের বাঁদিক থেকে ডাইনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তার সামনে মাইকেল স্কট। পেছনে জনা ছয়েক রাইফেলধারী পুলিশ। এদেরই একজন কয়েদিটার কোমরে বাঁধা শেকলের একটা প্রান্ত ধরে আছে।

আন্দামানে আসার পর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। এর ভেতর বহু কয়েদিকে চিনে গেছি। তাদের সঙ্গে আলাপসালাপও হয়েছে। কিন্তু এই কয়েদিটাকে আগে আর কখনও দেখিনি। এই ছুটির দিনে কেন, তাকে এভাবে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কী তার অপরাধ, কিছুই বুঝতে পারছি না। অবশ্য এই সৃষ্টিছাড়া জেলখানায় নিয়মকানুনই আলাদা। সামান্য পান থেকে চুন খসলেই ডান্ডাবেড়ি, খানা বন্ধ ইত্যাদি।

আমরা অবাক, তাকিয়ে আছি। ওই কয়েদিটা ইন্ডিয়ার কোন প্রভিন্সের লোক বোঝা যাচ্ছে না। দাড়িটারি দেখে পাঠান এবং শিখদের চেনা যায়। এর গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি থাকলেও সে শিখ বা পাঠান কোনওটাই নয়। বর্মিও না। তাদের মঙ্গোলিয়ান চেহারা। সে যেই হোক, মনটা খারাপ হয়ে গেল। শেকল হাতকড়া পরিয়ে যখন আনা হয়েছে তখন মাইকেল স্কট এর কী হাল করে ছাড়বে ভাবতেই মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল।

অন্য কয়েদি যারা আমাদের অচেনা কয়েদিটাকে দেখে শোরগোল বাঁধিয়ে দিয়েছিল আচমকা তাদের জটলা থেকে বৈজু দৌড়ে আমাদের ব্লকের দিকে আসছে। কোনও চাঞ্চল্যকর খবর থাকলে বৈজু আমাকে জানাবেই জানাবে। তার মুখে সেলুলার জেল সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে পেরেছি। নিশ্চয়ই সে আমাদের কাছে আসছে। আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম।

একটু পরেই হাঁফাতে হাঁফাতে উঠে এল বৈজু। প্রবল উত্তেজনার সুরে বলল, 'ভাইসাব, লছমন ধরা পড়েছে।' আমি বেশ ধন্দে পড়ে গেলাম। ইন্ডিয়ার মেনল্যান্ডে কেউ মারাত্মক ক্রাইম করে ধরা পড়লে এবং কঠোরতম সাজা হলে তবেই তাকে আন্দামানে নির্বাসনে পাঠানো হয়। এখানে আবার ধরা পড়বে কী? ব্যাপারটা বোধগম্য হল না। বৈজুকে জিগ্যেস করতে সে জটটা ছাড়িয়ে দিল। লছমন উত্তর প্রদেশের লোক। ইলাহাবাদের কাছে তার বাড়ি। ছ'বছর আগে দু দু'টো খুন করে যাবজ্জীবন 'কালাপানি'র সাজা খাটতে সে আন্দামানে এসেছিল। প্রথমদিকে বেশ শান্তশিষ্ট ছিল সুবোধ বালকের মতো জেলখানার যাবতীয় নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলত। গোড়ায় গোড়ায় তাকে অন্য কয়েদিদের মতো ছোবড়া পিটে তার বের করতে বা ঘানি ঘুরিয়ে নারকেল তেল বের করতে হত। মুখ বুজে সে তাই করে যেত। বছর চারেক পর লছমনকে 'ফরিস' (ফরেস্ট) ডিপার্টমেন্টে 'ডিপটি' (ডিউটি) দেওয়া হয়। সকালে তাকে জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হত। সন্ধের আগে আগে জেলখানায় ফিরিয়ে আনা হত। পরে জঙ্গলেই বনবিভাগের সরকারি কর্মীদের সঙ্গে থাকত। অবশ্য তার মতো আরও কয়েকজন কয়েদিও আগে থেকে সেখানে ছিল। যারা জেলারের আস্থাভাজন, তিনি মনে করেন এরা কোনও গোলমাল পাকাবে না, তাদের জেলের বাইরে নানা ধরনের ডিউটি দিয়ে ব্যারাক বা তাঁবু খাটিয়ে থাকার ব্যবস্থা করা হত। আসল ব্যাপারটা হল, বর্মা থেকে নর্থওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স পর্যন্ত বিশাল দেশ থেকে তিন চার মাস পর পর জাহাজ বোঝাই কয়েদিরা আন্দামানে আসত। সেলুলার জেলে এত

pathagar.net

banglabooks.in

কয়েদির থাকার মতো কুঠুরি কোথায়? তাদের জন্য তাহলে নতুন নতুন জেলখানা বানাতে হয়। যাই হোক, জঙ্গলে লছমন এবং অনেক কয়েদিকে বিরাট বিরাট গাছ কাটার 'ডিপটি' দেওয়া হয়েছিল। খুব মনোযোগ দিয়ে কাজটা করত সে। মাসছয়েক ঠিকঠাক চলছিল। তারপর আচমকা একদিন সে উধাও হয়ে যায়। জেলার সাহেব লছমনকে 'ভাগোয়া' (পলাতক) কয়েদি হিসেবে ঘোষণা করেন। চারদিকে তোলপাড়। পুরো দক্ষিণ আন্দামানের কোণে কোণে লছমনের খোঁজ চলতে থাকে। কিন্তু সে বিলকুল বেপাত্তা। মাসের পর মাস কাটতে থাকে। সবাই আসা ছেড়ে দিয়েছিল কিন্তু জেলার সাহেব ভীষণ জেদি। একজন কয়েদি তাঁর হেফাজত থেকে পালিয়েছে, এটা একটা বে-ইজ্জতির ব্যাপার। পুলিশের ওপর চাপ বাড়তে লাগল, যেমন করে পার, যেখান থেকে পার লছমনকে ধরে আনো।

এক নিশ্বাসে সব জানিয়ে জোরে জোরে বারকয়েক শ্বাস টানল বৈজু। তারপর ফের শুরু করল, 'কাল ভাগোয়া (পলাতক) লছমনকে মিডল আন্দামান থেকে পুলিশ পাকড়ে এনেছে।' রুদ্ধশ্বাসে মুকুন্দ আর আমি শুনে যাচ্ছিলাম। জিগ্যেস করলাম, 'এতদিন সে কোথায় ছিল! কী খেয়েছে?' বৈজু বলল, 'কোথায় আর থাকবে? জঙ্গলে জঙ্গলে কাটিয়ে দিয়েছে। ভাইসাব, আন্দামানে লাখো লাখো নারিয়েল পেঁড় (নারকেল গাছ), সমুন্দরে লাখো লাখো মছলি। খানার কি অভাব? নায়িয়েল পেড়ে, মছলি মেরে খেয়েছে।' জানতে চাইলাম, 'লছমন পালিয়েছিল কেন, কিছু শুনেছ?' বৈজু ঘাড় কাত করে বলল, 'শুনা হ্যায়। ও একটা লম্বা নারিয়েল পেঁড় খুঁদে খুঁদে নাও (নৌকো) বানিয়ে ফেলেছিল। সেটায় চড়ে সমুন্দর পাড়ি দিয়ে হিন্দুস্থানে ভেগে পড়ার মতলব করেছিল। সেই সময় ধরা পড়ে যায়। আভি মাইকেল সাব ওর জীনা (বেঁচে থাকা) বরবাদ করে দেবে।' মুকুন্দ আর আমি একেবারে থ। বলে কী বৈজু! একটা নারকেল গাছের ডোঙায় চড়ে বদ্ধ উন্মাদ না হলে কেউ সীমাহীন বঙ্গোপসাগর, যেখানে সর্বক্ষণ চার পাঁচ মাইল এলাকা জুড়ে একেকটা পাহাড়প্রমাণ ঢেউ উঠছে, পাড়ি দেবার কথা ভাবতে পারে। পাড় থেকে সিকি মাইল যেতে না-যেতেই তো ডোঙা উলটে যাবে।

বৈজু এবার বলল, 'ভাইসাব, লছমনের মতো আরও কেউ কেউ নাও বানিয়ে ভাগার কোশিশ করেছে।' জিগ্যেস করলাম, 'তাদের কী হাল হয়েছে?' বৈজু বলল, 'পতা নেহি। তবে কী আর হবে? নাও ডুবে গিয়ে ওই কয়েদিরা বদমাশ মচ্ছির (হাঙর) পেটে গেছে।' বিস্ময়কর ঘটনা বটে!

লছমনের মতো কয়েদিদের বিচিত্র রোমহর্ষক কাহিনি শুনে, লিয়াকত এবং ধনিরামের মতো কয়েদিদের আজব কাণ্ডকারখানা দেখে, সেলুলার জেলের পরম উপাদেয় 'কাঞ্জি' খেয়ে, চামড়ার মতো শক্ত চাপাটি চিবিয়ে ছোবড়া পিটে, ঘানি ঘুরিয়ে দিন কেটে যাচ্ছিল। কয়েদখানার আলুনি, বিস্বাদ, একঘেয়ে জীবন একমাত্র ব্রজদাই মাঝে মাঝে রঙ্গ-তামাশা করে মোটামুটি গ্রহণীয় করে তুলেছিলেন।

গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত— ঋতুচক্রে সময় পাক খেয়ে যাচ্ছিল। আন্দামানে আসার পর আমাদের দুটো বছর পার হল। একদিন সকালে কাঞ্জি খেয়ে ঘানি ঘুরিয়ে তেল বের করছি, বৈজুও আমার কাছাকাছি অন্য একটা ঘানি টানছে, মাঝে মাঝে এসে আমারটাও টেনে দিচ্ছে, হঠাৎ একজন জুনিয়র পুলিশ অফিসার, লোকটা ভারতীয়, ঘানিঘরে এসে হাজির। দু'বছরে সব অফিসার, সব কনস্টেবলকে চিনে গেছি। এই অফিসারটিকেও চিনি। নাম, হরীন্দ্র সিং। ছ'ফুট হাইটের তাগড়া চেহারা। সে আঙুল নাচিয়ে বৈজুকে বলল, 'মেরা সাথ আ—'।

বৈজুকে দু'বছর দেখছি। কখনও কোনওরকম ঝঞ্ঝাট বাঁধায়নি। জেলের আইনশৃঙ্খলা ভাঙেনি। আচমকা কেন তাকে তলব করা হল তার তলকূল পাচ্ছি না। রীতিমতো ঘাবড়েই গেলাম। অফিসারটাকে যে জিগ্যেস করব তেমন সাহস হচ্ছিল না। লোকটা মহা বদমেজাজি। যে ক'জন অফিসার কয়েদিদের ওপর চরম নির্যাতন চালাতে পটু সে তাদের একজন। বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা নেবার পর লক্ষ করেছি, ভারতীয় পুলিশ অফিসাররা ব্রিটিশ অফিসারদের চেয়ে এতটুকু কম অত্যাচার চালায় না। বরং কোনও কোনও সময় ইংরেজদের ছাড়িয়েও যায়। প্রভুভক্ত এই কুকুরেরা তার বদলে পায় দু-চার টুকরো মাংস। কিছু ইনাম, এক আধটা প্রোমোশন, রিটায়ারমেন্টের পর কারও কারও বরাতে খেতাব জুটে যায়।

বৈজুরা চলে গেল। আমাদের মন ভীষণ খারাপ। কিন্তু আধ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই লাফাতে লাফাতে ফিরে এল সে। চোখমুখ থেকে খুশি উপচে পড়ছে।

বৈজু দু'হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে একটানা বলতে লাগল, 'ভগোয়ানকা পাস যো মাঙ্গা ও মিল গিয়া।' ঘানিঘরে যারা ছিল তাদের কাছে গিয়ে জনে জনে একই কথা বলছে সে। তার গলার স্বরে কী যে উত্তেজনা!

লোকটা কি পাগল হয়ে গেল। জিগ্যেস করলাম, 'ভগবানের কাছে কী চেয়েছ?' বৈজু বলল, 'শাদিকা টিকট।' মানে বিয়ের টিকিট। আমি অবাক তাকিয়ে থাকি। জিগ্যেস করি, 'সেটা কী জিনিস।' বৈজু একটুকরো চৌকো পেতলের পাত দেখাল। তাতে খোদাই করা রয়েছে: ম্যারেজ সার্টিফিকেট।' কিছুই মাথায় ঢুকছে না। আমি অবাক তাকিয়ে থাকি। এবার বৈজু বুঝিয়ে বলল, 'সেলুলার জেলে ছ'বছর নিয়মশৃঙ্খলা মেনে শান্তশিষ্ট হয়ে থাকলে বিয়ের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। জেলের কর্তারা সেই বিয়ের ব্যবস্থা করে দেয়। একবার বিয়েটা হয়ে গেলে কারওকে আর সেলুলার জেলের কুঠুরিতে থাকতে হয় না। সে তখন বিয়াহি আওরতকে (বিবাহিত স্ত্রী) নিয়ে শাদিপুরে চলে যায়। যারই বিয়ে হোক তাকে সেখানে যেতে হয়। শাদিপুর পোর্টব্লেয়ারের একটা মহল্লা। বিবাহিতদের আর জেলের ঘানি

APEX ACADEMY
MADHYAHINGLI, MAHISHADAL, PURBA MEDINIPUR
Ph.-03224-242170
সেরা ইংরাজি মাধ্যম স্কুল
An academic project of APEX WELFARE TRUST
A PROPOSED H.S. ENGLISH MEDIUM SCHOOL PAR EXCELLENCE
OUR SALIENT FEATURES :
➡ LOW AFFORDABLE EXPENSES ➡ COMPETENT AND QUALIFIED TEACHERS ➡ STATE-OF-THE-ART INFRASTRUCTURE ➡ ADEQUATE CONVEYANCE ➡ MODERN TEACHING-LEARNING MATERIALS ➡ UTMOST CARE ➡ ACADEMICIAN-DOMINATED MANAGEMENT
ADMISSION WILL START FROM NOVEMBRE ● WE TAKE CARE OF YOUR CHILDREN

banglabooks.in

ঘোরাতে বা ছোবড়া পিটতে হয় না। জেলের বাইরে তাদের নানা রকম সরকারি কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়। সেজন্য তলব (মাইনে) মেলে। সেই টাকায় নিজের নিজের সংসার চালাতে হয়।

আমার বিস্ময় শতগুণ বেড়ে যায়। জানতে চাই, 'শাদি যে করবে, মেয়ে পাবে কোথায়?' বৈজু বলল, 'এখানে জেনানা ফাটক আছে না? আংরেজরা সেটাকে বলে 'সাউথ পয়েন (পয়েন্ট) জেল'। কয়েদিরা বলে 'রেন্ডিবারিক জেল'।

পোর্ট ব্লেয়ারে আসার পর সাউথ পয়েন্ট জেলের কথা ভাসা ভাসা শুনেছিলাম। কিন্তু সেটা কোথায় এবং কারা সেখানে থাকে, কিছুই জানতাম না। বৈজু বলতে লাগল, 'তামাম হিন্দুস্থান পর বর্মা মুল্লুক থেকে স্রিফ মরদ কয়েদিরা আসে না। দো-চারঠো খুন করেছে এমন জেনানা কয়েদিরাও 'কালাপানি'র সাজা খাটতে আসে। মরদদের বেলায় ছে' (ছয়) সাল আর আওরত বেলায় দো সাল। দো সাল যদি তারা ঠিকঠাক থাকে, 'শাদির টিকট পায়।'

জিগ্যেস করলাম, 'সাউথ পয়েন্ট জেলটা ঠিক কোন জায়গায়?' বৈজু বুঝিয়ে দিল সিসোস্ট্রেস উপসাগরের এক মাথায় পাহাড়ের মাথায় সেলুলার জেল, আর উপসাগর যেখানে ডান দিকে অনেকটা এগিয়ে ঘুরে ডান পাশে গেছে সেই বাঁকের মুখে সাউথ পয়েন্ট জেল।'

পরের দিনই সেই পুলিশ অফিসার হরীন্দর সিং এবং দু'জন আর্মড পুলিশ এসে বৈজুকে নিয়ে গেল। আর সে সেলুলার জেলে ফিরে আসেনি। বহু বছর বাদে, স্বাধীনতার পর আবার তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কীভাবে তার বিয়ে হয়েছে সেদিন জানতে পারলাম। কিন্তু তা অন্য কাহিনি।'

★ ★ ★

পুরনো দিনের স্মৃতির ভেতর ডুবে গেলেও সময় সম্পর্কে পুরোপুরি খেয়াল থাকে শেখরনাথের। বিনয় লক্ষ করেছে দুপুর হলে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েন তিনি। আজও তেমনটাই দেখা গেল। মুখ তুলে একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অনেক বেলা হয়ে গেল। এবারডিন মার্কেট থেকে দুপুরে খাবার কিনে হাসপাতালে ফিরতে হবে। মোহনবাঁশির বউ ছেলেমেয়েরা অপেক্ষা করছে।'

বিনয় উত্তর দিল না। সে যেন আশ্চর্য এক ঘোরের মধ্যে রয়েছে। শেখরনাথের বলার ভঙ্গিটা এমন চমৎকার যে পরাধীন আমলের সেলুলার জেলের নানা বিচিত্র ঘটনা, আজব সব কয়েদি, পুলিশ অফিসার, আর্মড গার্ডরা ছবির মতো চোখের সামনে ফুটে উঠছিল। প্রাক্তন বিপ্লবীর বর্ণনার গুণে সব যেন জীবন্ত মনে হচ্ছে।

কিন্তু সকলকে ছাপিয়ে বৈজুই বার বার চোখের সামনে এসে পড়ছে। হঠাৎ মনে পড়ল, কিছুদিন আগে জেফ্রি পয়েন্টের উদ্বাস্তু কলোনির সৃষ্টিধরের গর্ভবতী বউকে প্রসব করানোর জন্য দাই জোগাড় করতে শেখরনাথের সঙ্গে অনেকটা দূরের আরেকটা রিফিউজি কলোনিতে গিয়েছিল বিনয়। সেই কলোনিটার গা ঘেঁষে রয়েছে ব্রিটিশদের বসানো পেনাল সেটলমেন্ট। সেখানে রঘুবীর সিং এবং তার বর্মি বউ মা পোয়ের পরিচয় হয়েছিল। তারাও জেল খাটতে আন্দামানে এসেছিল বহুকাল আগে। 'ম্যারেজ সার্টিফিকেট' পেয়ে নিশ্চয়ই তাদের বিয়ে হয়। কিন্তু আন্দামানের জেলে কোন পদ্ধতিতে ওদের বিয়ে হয়েছে, শোনা হয়নি। আজও শেখরনাথ বৈজুর বিয়ের ব্যাপারে খুঁটিনাটি কিছুই জানাননি। কেননা তিনি তখন সেলুলার জেলে, সেই সময় তাঁর পক্ষে সব জানা সম্ভব ছিল না। পরে অবশ্যই জেনেছেন। কিন্তু দুপুর হয়ে যাওয়ায় তা বলা হয়নি।

বিনয় ঠিক করে ফেলল, শেখরনাথকে আর কিছু জিগ্যেস করবে না। মোহনবাঁশি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠলে তিনি তো শাদিপুরে বৈজুদের বাড়িতে যাচ্ছেনই। বিনয়কেও নিয়ে যাবেন বলেছেন। যারা নিজেরা বিয়ে করেছে তাদের মুখ থেকে শোনা আর তৃতীয় পক্ষের কাছে শোনার মধ্যে প্রচুর তফাত। অনেক কিছু বাদ পড়ে যায়। বিনয় বৈজুদের কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত জেনে নেবে।

আন্দামানে ব্রিটিশ আমলে পুরুষ এবং মেয়ে কয়েদিদের মধ্যে কীভাবে বিয়ে হত তা নিয়ে একটা চমকে দেবার মতো লেখা তৈরি করা যায়। তাতে 'নতুন ভারত'-এর পাঠকরা নিশ্চয়ই খুশি হবে। বিস্ময়কর অজানা তথ্যগুলোকে গুছিয়ে গুছিয়ে গল্পের আকার দেওয়া দরকার।

লেখাটি বেরোলে 'নতুন ভারত' সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ বেড়ে যাবে।

শেখরনাথের পাশাপাশি হাঁটতে লাগল বিনয়।

নয়

অন্য সব দিনের মতো পরদিন সকালে যথারীতি আবার এল বিনয়রা।

মোহনবাঁশিকে দেখে, ডাক্তার চট্টরাজের সঙ্গে কিছুক্ষণ পেশেন্ট সম্পর্কে কথা বলে, দোতলার অলিন্দে জ্যোৎস্না আর ছেলেমেয়েদের বসিয়ে বিনয়কে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়লেন শেখরনাথ।

সংকট আগেই কেটে গিয়েছিল মোহনবাঁশির। তার মুখচোখে অসুস্থতার যে কালচে, পুরু ছোপ পড়েছিল তা প্রায় নেই বললেই হয়। সে জায়গায় সজীবতা ফিরে আসতে শুরু করেছে। ডাক্তার চট্টরাজ বলেছেন, আর চার পাঁচ দিনের মধ্যেই তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

দু'জনে তিন নম্বর ব্লকের সামনে চলে এসেছিল। আজ আর বিল্ডিংটার ভেতর ঢুকলেন না শেখরনাথ। বললেন, 'আজ অন্য কয়েদি নয়, শুধু বিপ্লবীদের কথা তোমাকে বলব। তুমি নিশ্চয়ই জানো, আঠারোশো সাতান্নর সিপয় মিউটিনি দমন করার পর ইংরেজরা কত বিদ্রোহী সিপাহিকে আন্দামানে পাঠিয়েছিল তার কোনও হিসেব নেই। তাদের অনেকের পরিচয় আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে যেটুকু হদিশ পাওয়া গেছে তাতে মনে হয়, যাদের আনা হয়েছিল, বেশিরভাগকেই নির্মমভাবে গুলি করে খুন করা হয়। তখনও সেলুলার জেল তৈরি হয়নি।'

বিনয় বলল, 'হ্যাঁ জানি। হিস্টোরিয়ানদের লেখায় পড়েছি।'

তিন নম্বর ব্লকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেন না শেখরনাথ। তিন, চার এবং পাঁচ নম্বর ব্লকের পাশ দিয়ে বিনয়কে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে বলতে লাগলেন, 'টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির গোড়া থেকেই সারা ভারতবর্ষ জুড়েই ইংরেজদের এদেশ থেকে উৎখাত করার জন্যে সশস্ত্র বিপ্লবীদের নানা গুপ্ত সংগঠন এবং তাঁদের কর্মকাণ্ড তীব্র হতে থাকে। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট, জেলার বা পুলিশ অফিসারদের ওপর বিপ্লবীরা বোমা-পিস্তল নিয়ে আক্রমণ চালাতে লাগলেন। এঁদের অনেকে মারাও গেলেন। শঙ্কিত বিদেশি শক্তি হাত-পা গুটিয়ে বসে রইল না। তারা রুদ্র মূর্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিপ্লবীদের ওপর। নানা কৌশলে তাদের ধরে চরম নির্যাতন চালানো হতে লাগল। দেশি মিরজাফররা ইংরেজদের এ ব্যাপারে নানাভাবে সাহায্য করেছে। বিপ্লবীদের অনেকের ফাঁসি হল, বাকি সবাইকে নানা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হল নানা মেয়াদের জেল। কারওকে পাঁচ বছর, কারওকে সাত বছর, কারওকে দশ বছর। যাদের সাজা আরও বেশি হল তাদের অনেককে পাঠানো হল 'কালাপানি'তে অর্থাৎ এই সেলুলার জেলে। কোন কোন বিপ্লবী এখানে এসেছিলেন, তুমি জানো?'

বিনয় বলল, 'সবার নাম জানি না। দু'চারজনের নাম শুনেছি বা বইয়ে পড়েছি।'

শেখরনাথ সামান্য ভর্ৎসনার সুরে বললেন, 'একজন ভারতীয় হিসেবে জানা উচিত। দেশের জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছেন

pathagar.net

banglabooks.in

তাদের কথা না জানাটা অপরাধ। আমরা বাবর, হুমায়ুন, জাহাঙ্গির, চেঙ্গিস খান, মহম্মদ ঘোরি, আলেকজান্ডার কি ক্লাইভ, হেস্টিংস, ডালহৌসি, ওয়েলেসলিদের জীবনচরিত কী তাদের কীর্তিকলাপের কথা গড় গড় করে আওড়ে যেতে পারি, অথচ এই বিপ্লবীদের সম্বন্ধে কিছুই জানি না, হয়তো জানার আগ্রহই নেই। এটা গৌরবের কথা নয় বিনয়।'

শেখরনাথের দিকে তাকাতে পারছিল না বিনয়। সে চুপ করে থাকে।

শেখরনাথ বলতে লাগলেন, 'তোমাকে কয়েকজনের নাম বলছি, আলিপুর বোমার মামলায় নির্বাসনের সাজা খাটতে এসেছিলেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাস, উল্লাসকর দত্ত, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, অবিনাশ ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র সেনরা। নাসিক ষড়যন্ত্র মামলায় মহারাষ্ট্র থেকে সাভারকর ভাইরা— বিনায়ক দামোদর সাভারকর আর গণেশ দামোদর সাভারকর। তাঁদের সঙ্গে নারায়ণ যোশি এমনি অনেকে। ঢাকা থেকে পুলিনবিহারী দাস, জ্যোতির্ময় রায়, খুলনা থেকে সুধীর দে, অশ্বিনীকুমার বসু, শচীন্দ্র মিত্র, ডালহৌসি স্কোয়ার মামলায় শাস্তি পাওয়া ননীগোপাল মুখার্জি। কত নাম আর বলব!'

একটু নীরবতা।

তারপর ভেবে ভেবে ফের বলতে শুরু করলেন শেখরনাথ। বোমা-বন্দুক হাতে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে পা বাড়িয়েছিলেন যাঁরা শুধু তাঁরাই নন, দুঃসাহসী সাংবাদিক এবং রাজদ্রোহমূলক লেখালেখির জন্য যে সব খবরের কাগজের সম্পাদক অপরাধী সাব্যস্ত হতেন তাঁদের সেলুলার জেলে পাঠানো হত। যেমন এলাহাবাদের 'স্বরাজ' পত্রিকার নন্দগোপাল, হোতিলাল রামহরি বা রামচরণ লাল। যেভাবেই হোক, বিপ্লবী বা কঠোর সমালোচনা করে ইংরেজ রাজত্বের কুকীর্তি, অত্যাচার সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে চাইতেন তাঁদের বিরুদ্ধেও চরম দমননীতি নিয়েছিল সরকার। এঁদের হাত থেকে কলম কেড়ে নাও, যেভাবে হোক এঁদের কণ্ঠরোধ কর। তারা যেন সিডিশান ছড়াতে না পারে।'

বিনয় জিগ্যেস করল, 'সেলুলার জেলে এইসব সাংবাদিকের ওপরও কি টরচার চালানো হত?'

শেখরনাথের দু'চোখ কৌতুকে ঝিকমিক করে ওঠে। —'হত মানে! তোমার কি ধারণা,সম্পাদকরা সাংবাদিকরা ইংরেজদের গুরুঠাকুর?' বলতে বলতে তাঁর স্বর গম্ভীর হয়ে ওঠে— 'আমার ধারণা, বোমা-পিস্তলের চেয়ে কলমের শক্তি অনেক বেশি।'

বিনয় উত্তর দেয় না। প্রাক্তন বিপ্লবীর দিকে গভীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকে।

শেখরনাথ থামেননি। স্বদেশি ডাকাতির কথা শুনেছ নিশ্চয়ই?'

'শুনেছি।' বিনয় মাথা নাড়ে।

বিপ্লবীদের তো টাকাপয়সা নেই। গোপনে অস্ত্রশস্ত্র কিনতে ডাকাতি না করে উপায় ছিল না। দেশের কাজের জন্যেই এসব করতে হত। তাছাড়া অত্যাচারী বা ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা তো ছিলই। এই ধরনের ঘটনা কাগজে প্রচার না করা হলে দেশের লোক জানবে কী করে? মানুষের কাছে পৌঁছবার একমাত্র বাহন তো সংবাদপত্র। বেশিরভাগ পত্রিকা ছিল ইংরেজের খয়ের খাঁ। তাদের অনেকেই এসব এড়িয়ে যেত। অনেকে ছোট করে ছাপত, সেই সঙ্গে বিপ্লবীদের মুণ্ডপাতও করত। কিন্তু যাঁদের দুর্জয় সাহস তাঁরা কিন্তু ইংরেজের রক্তচক্ষু গ্রাহ্য করতেন না। কাগজে তো ছাপতেনই, সেই সঙ্গে ভারতের বীর সন্তান এইসব বিপ্লবীর দেশপ্রেমকে কুর্নিশ করে এডিটোরিয়াল বা নানারকম আর্টিকল লিখতেন। ইংরেজ এঁদের ভীষণ ভয় পেত। জেল, জরিমানা, কাগজের প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া— এসব তো ছিলই। যাঁদের কোনওভাবেই দমাতে পারা যেত না তাঁদের কালাপানি পাঠানো হত।'

'আচ্ছা—'

'বল—'

'এঁদেরও কি ঘানিটানি টানতে হত?'

শেখরনাথ হেসে ফেললেন। 'এ হল হরিহরছত্রের মেলা। এই জেলের ভাষায় এখানকার সবাই বরাবর মানে সমান। খুনের আসামি, রেভোলিউশনারি বা কাগজের বিখ্যাত সব এডিটর— জেল অথরিটির চোখে এদের মধ্যে প্রভেদ নেই। কাগজের লোক বলে বেদিতে বসিয়ে পুজো করবে তেমন বান্দাই নয় ব্রিটিশ জেলার। খুনি কয়েদিদের পাশে দাঁড়িয়ে হোতিলাল, নন্দগোপাল বা রামচরণ লালদের ঘানি ঘোরাতে, ছোবড়া পিটতে কী পাথর ভাঙতে হত। আমাদের আগে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের কপালে একই দুর্ভোগ ছিল। শুধু নির্যাতন, নির্যাতন আর নির্যাতন। সেলুলার জেলের ট্রাডিশন সমানে চলছিলই।'

বিনয় কোনও প্রশ্ন করল না।

শেখরনাথ বলেই যাচ্ছেন। 'তোমাকে রাজনাথের কথা বলেছি। সে পাগল হয়ে গিয়েছিল। তার আগে আলিপুর বোমার মামলায় যাঁরা কালাপানি এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লাসকর দত্তও ছিলেন। তিনিও উন্মাদ হয়ে যান। এঁদের মতো অসংখ্য বিপ্লবী অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে উন্মাদ হয়ে গেছেন। ইংরেজ একটা পরিকল্পনা ছকে নিয়ে সেই সিপাহি বিদ্রোহের পর থেকে মুক্তি সংগ্রামীদের আন্দামানে পাঠিয়েছিল। সেই অমানুষিক ছকটা ছিল এই দেশপ্রেমিকদের নির্মমভাবে হত্যা করা। বিনয়, তুমি শুনলে অবাক হবে দেশের প্রথম মুক্তিযুদ্ধের অর্থাৎ সিপয় মিউটিনির বীর সৈনিকদের একজনও জীবন্ত অবস্থায় ভারতের মূল ভূখণ্ডে ফিরে আসেনি। তাদের কারওকে গাছের ডালে ঝুলিয়ে, কারওকে গুলি করে, কারও পেছনে ডালকুত্তা লেলিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। ব্রিটিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেন বুঝিয়ে দিয়েছিল, তোরা স্বাধীনতা চেয়েছিলি তো? এবার মজাটা বোঝ। কী ভয়ংকর প্রতিহিংসাপরায়ণ এই নৃশংস সাম্রাজ্যবাদীরা!'

বিনয় চুপচাপ শুনতে লাগল।

শেখরনাথ থামেননি।— 'সেলুলার জেল তৈরি হবার আগে এসেছিলেন বিদ্রোহী সিপাহিরা। জেলখানা তৈরি হলে টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির গোড়ার দিক থেকে যে বিপ্লবীরা জাহাজ বোঝাই হয়ে এখানে এসেছেন তাঁদের ওপর কত নির্যাতন যে হয়েছে তার কিছু কিছু নমুনা তোমাকে জানিয়েছি। এই জেলের তিন আর দু'নম্বর ব্লকে আর খানিক দূরে ভাইপার আইল্যান্ডে ছিল ফাঁসিঘর। কত বিপ্লবীকে যে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে, তার হিসেব নেই।

বিনয় বলল, 'আমার একটা কথা জানতে ইচ্ছা করছে। যদি কিছু মনে না করেন, বলব?'

শেখরনাথ বললেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। মনে করার প্রশ্নই নেই।'

'যে সব বিপ্লবী এখানে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজা খাটতে এসেছিলেন তাঁদের তো মৃত্যুভয় ছিল না। এত নির্যাতন তাঁরা মুখ বুজে সহ্য করেছেন!'

বিপ্লবীরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, সেলের ভেতর বেশিরভাগ বন্দি থাকত। কারও কারও হাতে-পায়ে ডান্ডাবেড়ি। তবু তারই মধ্যে প্রতিবাদ অবশ্য করা হয়েছে। পুরানো নথিপত্র যেটুকু পেয়েছি সেসব ঘেঁটে জেনেছি আলিপুর বোমার মামলায় অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্তরা এখানে আসার পর ননীগোপাল নামে অল্পবয়সি যুবক বিপ্লবীকে সেলুলার জেলে পাঠানো হয়। তার আসার আগে থেকেই বিপ্লবীদের মধ্যে প্রচণ্ড অসন্তোষ জমা হচ্ছিল। তাঁরা আন্দোলন শুরু করেছিলেন। জেলে যে অখাদ্য কুখাদ্য দেওয়া হয় তার বদলে ভালো খাবার দিতে হবে, রাজবন্দিদের অমানুষিক খাটুনি বন্ধ করতে হবে ইত্যাদি। ননীগোপাল এসেই খাওয়াদাওয়া

pathagar.n

banglabooks.in

এবং ছোবড়া পেটানো বা ঘানি টানার মতো কাজ বন্ধ করে দিল। তাকে জেলের পোশাকের বদলে চটের জাঙিয়া আর জামা পরতে দেওয়া হল, কুঠুরিতে পুরে রাখা হল, কিন্তু যে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে, দুই আঙুলে সে মৃত্যু নিয়ে খেলা করে, তাকে এসব দিয়ে কি দমানো যায়? ননীগোপালের এই প্রতিবাদ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে। পরে যে বিপ্লবীরা এসেছেন তাঁরাও বারবার জেল অথরিটির বর্বর দমননীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। স্রেফ অনশন আর কাজ বন্ধ।'

বিনয় বলল, 'গান্ধীজির মতো প্যাসিভ রেজিস্টান্স?'

শেখরনাথ মৃদু হাসলেন। 'তা বলতে পার।'

'এইসব আন্দোলনের রেজাল্ট কী হয়েছিল?'

'একরকম ঢোক গিলে প্রশাসনকে একটা কমিশন বসাতে হয়। কমিশনের কর্তাদের সুপারিশ ছিল রাজবন্দিদের সঙ্গে একটু মানবিক ব্যবহার করা হোক। কিন্তু সেসব সুপারিশ বস্তায় পুরে গুদামে ফেলে রাখা হয়েছে। তার ওপর ধুলোর স্তর জমেছে। কিন্তু সিস্টেম পালটায়নি। ট্র্যাডিশন সমানে চলছিলই।'

একটু চুপ করলেন শেখরনাথ। তারপর ফের শুরু হল। 'আন্দোলন, সম্পর্কে পরে তোমাকে ডিটেলে সব বলব। এখন ইতিহাসের কথা বলছিলাম, সেখানে ফিরে যাই। আমরা সেলুলার জেলে আসার পর উনিশশো তিরিশে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার রায়ে ভগৎ সিং, শুকদেব এবং রাজগুরুকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। জয়দেব কাপুর, বিজয় সিং, কমলনাথ তেওয়ারি, বটুকেশ্বর দত্ত এমন কয়েকজনকে ট্রান্সপোর্টেশনের শাস্তি দিয়ে আন্দামানে পাঠানো হল। এলেন চট্টগ্রামের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইংরেজরা যাকে বলত চিটাগাং আর্মারি রেইড, অসমসাহসী যোদ্ধারা। দেখতে দেখতে কয়েকটা বছর কেটে গেল। আমরা যারা আগে কালাপানি এসেছিলাম তাদের আর ছোবড়া পেটানোর বা ঘানি টানার মতো হাড়ভাঙা খাটুনির কাজ করতে হত না, আমাদের সেলুলার জেলের বাইরে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বা পি ডব্লু ডি'তে ডিউটি দেওয়া হল। আমি ছিলাম পি ডব্লু'তে। কয়েদিরা পাথর ভেঙে রাস্তা বানাত; আমাকে তার তদারকি করতে হত। পাছে পালিয়ে যাই, সেজন্য পাহারাদার থাকত আর্মড পুলিশরা। ডিউটি শেষ হলে আবার আমাকে জেলখানায় ফিরিয়ে আনা হত। তবে খুব বেশিদিন নয়, কী কারণে আমার ওপর জেল অথরিটি সদয় হয়েছিল জানি না। হয়তো ভেবেছিল, ব্যাটা পালাবে কোথায়? জঙ্গলে ঢুকলে জারোয়াদের তিরে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটবে; আর সমুদ্রে নামলে সোজা হাঙরের পেটে চলে যাবে। আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল পোর্টব্লেয়ারেরই হ্যাডো নামে একটা এলাকায়।'

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা।

শেখরনাথ নিজের মধ্যে যেন মগ্ন হয়ে রইলেন। পুরনো স্মৃতি তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। বিনয় অপেক্ষা করতে লাগল।

একসময় শেখরনাথ বলতে লাগলেন 'সময় উড়ে যাচ্ছিল ঝড়ের গতিতে। উনিশশো উনচল্লিশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হল। চোখের পলকে তা ছড়িয়ে পড়ল সারা পৃথিবীতে। জাপান ছিল অক্ষশক্তি অর্থাৎ অ্যাক্সিস ফোর্সের এক বিরাট শক্তি। জার্মানি আর ইতালির শরিক। তারা দুরন্ত বেগে ধেয়ে আসছে ভারতের বিশেষ করে কলকাতার দিকে। একে একে পতন হচ্ছে সিঙ্গাপুর, মালয় এবং বার্মার। কলকাতা দখল করতে পারলে জাপানি ফৌজ হু হু করে ঢুকে যাবে সারা ভারতে। অ্যালায়েড ফোর্সের প্রধান শরিক ইংরেজরা কলকাতাসুদ্ধ সারা বাংলাদেশ ওদিকে আসামকে এমনভাবে সুরক্ষিত করে ফেলল যাতে জাপানিরা কোনওভাবেই ঢুকতে না পারে। ইংরেজ আর আমেরিকান টমিতে ছেয়ে গেল ইস্টার্ন ইন্ডিয়া।'

বিনয় বলল, 'কাকা, আপনি হয়তো শুনেছেন, আমরা আনডিভাইডেড বেঙ্গলের ঢাকা ডিস্ট্রিক্টের বিক্রমপুরে রাজদিয়া

banglabooks.in

নামে একটা জায়গায় থাকতাম। সেখানেও ইংরেজরা রাতারাতি একটা সেনা ঘাঁটি বসিয়ে ফেলল। কত যে ব্রিটিশ আর আমেরিকান নিগ্রো সোলজারকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সারাদিন, এমনকী রাতেও তারা জিপে এলাকায় টহল দিয়ে বেড়াত।'

শেখরনাথ বলতে লাগলেন, 'একদিকে তোজোর জাপ বাহিনী, অন্যদিকে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের দিকে এগিয়ে আসছিল। আজাদ হিন্দ বাহিনীর লক্ষ্য ছিল মণিপুরের ভেতর দিয়ে আসামে ঢুকে পড়া এবং দেশকে স্বাধীন করা। সে যাক, ইংরেজরা চারদিক এত তো দুর্ভেদ্য করে তুলছিল কিন্তু আন্দামান দ্বীপপুঞ্জকে রক্ষা করতে পারেনি। জাপানিরা তা দখল করে নেয়। যতদূর মনে পড়ছে সেটা উনিশশো বেয়াল্লিশ সালের গোড়ার দিক। ইংরেজরা তাদের রুখতে না পেরে ভীরু কুকুরের মতো পালিয়ে যায়। ইংরেজের যত দাপট সাধারণ নিরস্ত্র ভারতীয়দের ওপর। কিন্তু ব্রিটিশ জাতটা ধুরন্ধর। এখান থেকে পালাবার আগে, সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছু গুপ্তচর ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। এই স্পাইরা কী করেছিল, পরে বলছি।

এদিকে জাপানিরা কিন্তু আন্দামান দখল করে স্থায়ীভাবে থেকে যেতে আসেনি। জাপানের পার্লামেন্ট নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে মেনে নেয়। কিন্তু তার মধ্যেও চাতুরি ছিল। আসল ক্ষমতা কিন্তু ছিল জাপানিদের হাতেই।

নেতাজি খুব সম্ভব উনিশশো তেতাল্লিশের শেষাশেষি একটি বিমানে আন্দামানে এসেছিলেন। ভারতের মাটিতে সেটাই বোধহয় তাঁর শেষ পা রাখা।

বিনয়, তুমি নিশ্চয়ই জানো, সুভাষচন্দ্র এখানে এসে জিমখানা ময়দানে মার্কেটের সামনে এক অনুষ্ঠানে তাঁর আই এন এ'র পতাকা তুলে দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দেন। আমরা তাঁর সভায় গিয়েছিলাম। তাঁর ইচ্ছা ছিল আন্দামানের নাম হোক 'শহিদ দ্বীপ' আর নিকোবর হোক 'স্বরাজ দ্বীপ'। দেশ স্বাধীন হবার পর সেই ইচ্ছা এখনও পূরণ হয়নি।

নেতাজি সেলুলার জেল এবং পোর্টব্লেয়ারের চারপাশে বেশ কিছু গ্রামেও গিয়েছিলেন। জেলখানায় তখন রাজবন্দি একজনও ছিলেন না, ছিল প্রচুর সাধারণ কয়েদি। গ্রামে বা সেলুলার জেলে যেখানেই তিনি গেছেন, জাপানি সৈন্যরা তাঁকে এমনভাবে ঘিরে রেখেছে যাতে এখানকার মানুষের কোনও অভিযোগ বা জাপ শাসনে তাদের দিন কীভাবে কাটছে, প্রায় কিছুই জানতে পারেননি।

ওই যে গুপ্তচরদের কথা বলছিলাম, তারা গোপনে ব্রিটিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে জাপানিদের সম্বন্ধে অনেক খবর দিচ্ছিল। সেই অনুযায়ী ইংরেজরা এখানে মাঝে মাঝেই বিমান হানা চালায় এবং জাপানিদের প্রচুর ক্ষতি করে। ফলে তারা প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তাদের চরম হিংস্র চেহারাটি নখ দাঁত মেলে বেরিয়ে পড়ে।

জাপানিদের ধারণা হয়েছিল, এই দ্বীপের প্রতিটি মানুষ ইংরেজের গুপ্তচর। তারা যে ভয়ানক নির্যাতন চালিয়েছিল, ইংরেজদের দমননীতি তার কাছে প্রায় কিছুই না।

গুপ্তচর সন্দেহে অজস্র মানুষকে তারা ঠান্ডা মাথায় খুন করেছে। একবার পোর্টব্লেয়ারের কাছাকাছি হামফ্রেগঞ্জে চুয়াল্লিশ জনকে নিয়ে গিয়ে একদিনে তাদের হত্যা করে। ইংরেজ হোক আর জাপানিই হোক, সাম্রাজ্যবাদীদের চেহারা প্রায় একইরকম।

উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থামল। মিত্রশক্তির জয় হল। অক্ষশক্তি সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত। জাপানের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল মারাত্মক। হিরোসিমা নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমা ফেলে তার শিরদাঁড়া গুঁড়িয়ে ফেলা হয়। জাপান আত্মসমর্পণ করে।

আন্দামান নিকোবরে তাদের আর থাকা সম্ভব ছিল না। ইংরেজদের হাতে দুই দ্বীপপুঞ্জ তুলে দিয়ে তারা চলে যায়। তার আগে আন্দমানের বহু মানুষকে জলে ডুবিয়ে খুন করে। ইংরেজরা এখানে ফিরে আসার পর ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সেলুলার জেল চিরকালের মতো বন্ধ করে দেয়।

জাপানিরা যে কত ধূর্ত তা জানা গিয়েছিল পরে।

বিনয় উৎসুক চোখে তাকিয়ে ছিল। জিগ্যেস করল, 'কী জানা গিয়েছিল?'

শেখরনাথ বললেন, 'ওরা যে মানুষের ওপর চরম নির্যাতন চালিয়েছিল তার বিশেষ কোনও নথিপত্র পাওয়া যায়নি। প্রায় সব ডকুমেন্ট পুড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। এখানকার পেনাল সেটলমেন্টের পুরনো বাসিন্দাদের কাছে গেলে সে সব ইতিহাস জানতে পারবে। জাপানিরা যে তিন বছরের মতো এখানে ছিল, আন্দামানের ইতিহাসে সেটা কলঙ্কজনক চ্যাপ্টার।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে বিনয়।

শেখরনাথ বলতে লাগলেন, 'পঁয়তাল্লিশে যুদ্ধ থামল। ছেচল্লিশে সারা দেশ জুড়ে দাঙ্গা, পূর্ব বাংলা থেকে সুদূর লাহোর, করাচি পর্যন্ত শুধু আগুন, ধর্ষণ আর রক্তস্রোত। কত নিরীহ মানুষ যে মারা গেল; কত তরুণীর জীবনে যে সর্বনাশ ঘটে গেল! দাঙ্গার এক বছর পর পার্টিশান। আচ্ছা বিনয়—'

বিনয় বলে, 'কী কাকা?'

'সেই সিপয় মিউটিনির পর থেকে এই আন্দামান দ্বীপে কত হাজার হাজার স্বাধীনতা সংগ্রামীকে হত্যা করা হয়েছে তার হিসেব নেই। শুধু কী আন্দামানেই, সারা ইন্ডিয়াতেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট অগুনতি বিপ্লবীকে গুলি করে বা ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে। কত যে মুক্তিযোদ্ধা দেশের শত শত কয়েদখানায় বছরের পর বছর বন্দি থেকে জীবন ক্ষয় করে ফেলেছে। এত মানুষের আত্মদানের বদলে আমরা কোন স্বাধীনতা পেয়েছি? বিকলাঙ্গ, ভাঙাচোরা, পোকায়-কাটা এক ফ্রিডম।'

শেখরনাথের বুকের ভেতর কত ক্ষোভ, কত উষ্মা, কত বেদনা যে পুঞ্জীভূত হয়েছিল! সেসব ঠিকরে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে লাগল। বিনয় নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে।

শেখরনাথ বলতে লাগলেন, তাঁর মুখ উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে, কণ্ঠস্বরে তীব্র ঝাঁঝ। 'পার্টিশনের পর লক্ষ লক্ষ মানুষ, যাদের কোনও অপরাধ নেই, যারা রাজনীতির ধার ধারে না, তারা সর্বস্ব খুইয়ে সীমান্তের এপারে চলে এল। এখনও আসছে। কত বছর, কত কাল ধরে আসতে থাকবে, কেউ জানে না। যে ভূখণ্ডটি তাদের পিতৃপুরুষের বাসভূমি ছিল, ছিল তাদের জন্মস্থান, এক লহমায় সেটা আর তাদের রইল না। শিয়ালদা স্টেশনে, রিলিফ ক্যাম্পে ক্যাম্পে তারা পচে মরছে। মাথা গোঁজার একটুকরো জমির জন্যে তাদের পাঠানো হচ্ছে আন্দামানের জঙ্গলে, ওড়িশায়। শুনছি দণ্ডকারণ্যেও রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য একটা প্রোজেক্টের কথা ভাবা হচ্ছে। তাই নিয়েও কত রকমের দড়ি টানাটানি, কত পলিটিকস।— এর নাম স্বাধীনতা?'

এর পর অনেকক্ষণ নীরবতা।

গত কয়েকদিনে সেলুলার জেলের জনশূন্য নানা ব্লকের চত্বরগুলোতে ঘুরতে ঘুরতে দেশের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম সিপাহি বিদ্রোহের যোদ্ধাদের এখানে এই দ্বীপপুঞ্জে নিয়ে এসে নির্বিচারে গণহত্যা থেকে শুরু করে এই জেলখানায় সারা ভারত এবং বর্মা থেকে অজস্র কয়েদির সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লবীদের এনে চরম নির্যাতন, পাঠান, শিখ, জাঠ, বর্মি ইত্যাদি কয়েদিদের কত বিচিত্র কাহিনিই না শুনিয়েছেন শেখরনাথ। শুনিয়েছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানিদের এই দ্বীপপুঞ্জ দখল করে নেওয়া, সাধারণ মানুষের ওপর ওদের বর্বর অত্যাচার, দু'দিনের জন্য সুভাষচন্দ্রের এখানে আসা— সুদূর এবং অদূর অতীতের কত যে ইতিহাস বিনয়ের চোখের সামনে ফুটে উঠেছে!

pathagar.n

banglabooks.in

অবশেষে এসেছে দাসত্বের বেড়াজাল থেকে মুক্তি, যার গালভরা নাম স্বাধীনতা। 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা—।' কিন্তু এই স্বাধীনতার জন্য আক্ষেপের অবধি নেই শেখরনাথের। তাঁর শেষ কথাগুলো অফুরান বিষাদের মতো যেন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

কতক্ষণ পর বিনয়ের খেয়াল নেই, শেখরনাথের কণ্ঠস্বর আবার কানে এল।— 'বিনয় চল, এবার যাওয়া যাক। দুপুরের খাবার আনতে এবারডিন মার্কেটে যেতে হবে।'

নিঃশব্দে শেখরনাথের পাশাপাশি হাঁটতে লাগল বিনয়।

দশ

আজ মোহনবাঁশিকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে। প্রাণের আশঙ্কা আগেই কেটে গিয়েছিল। এখন মোটামুটি সুস্থ সে। হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ করে দেওয়া হলেও তাকে জেফ্রি পয়েন্টে নিয়ে যাওয়া চলবে না। আপাতত মোহনবাঁশিকে কয়েকদিন পোর্টব্লেয়ারেই থাকতে হবে। ডাক্তার চট্টরাজ জানিয়েছেন, রোজ একবার তাকে হাসপাতালে চেক-আপের জন্য নিয়ে যাওয়া জরুরি। তারপর সম্পূর্ণ 'ফিট' হলে রিফিউজি সেটলমেন্টে ফিরতে দেওয়া হবে।

ঠিক হয়েছে, এই ক'দিন মোহনবাঁশি বিশ্বজিতের বাংলোতেই বউছেলেমেয়ে নিয়ে থাকবে। রোজ সকাল বা বিকেলের দিকে কোনও এক সময় কেউ একজন তাকে হাসপাতালে এনে পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে যাবে।

অন্য কয়েক দিনের মতো আজও সকালে ন'টা বাজতে না বাজতেই বিশ্বজিৎ রাহার জিপে বেরিয়ে পড়লেন শেখরনাথ আর বিনয়। ঘণ্টাদেড়েক কী দুইয়ের মধ্যে মোহনবাঁশিকে নিয়ে ফিরে আসবেন তাঁরা। তাই আর জ্যোৎস্না এবং তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নেননি।

জিপটা ফুঙ্গি চাউং পেছনে ফেলে জিমখানা আর এবারডিন মার্কেটের পাশ দিয়ে যখন সেলুলার জেলের গেটের কাছাকাছি চলে এসেছে সেই সময় অনেক নিচে সেসোস্ট্রোস বে'র সেই ছোট জেটিটার দিকে নজর চলে গেল বিনয়ের। ক'দিন আগে ওখানে 'এস এস সাগর' জাহাজটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল সে। চকিতে মনে পড়ে গেল সেই জাহাজটায় উঠে মিডল আন্দামান চলে গিয়েছিল ঝিনুক। আজ সেখানেই একটা মোটর বোট দাঁড়িয়ে আছে। 'সি গাল।' ওটা সেল কালেক্টারদের বোট। তার খুবই চেনা। এই বোটে করে নানা দ্বীপের কিনার ঘেঁষে যারা ঘুরে বেড়ায় তারা সমুদ্রের জলে ডুব দিয়ে দিয়ে শঙ্খ কড়ি টার্বো ট্রোকাস নটিলাস ইত্যাদি আশ্চর্য ধরনের মূল্যবান শেল বা সিপি তুলে আনে। বিদেশের বাজারে সেগুলোর বিপুল চাহিদা। প্রচুর দামে এসব বিকোয়।

'সি গাল' বোটটার মালিক লা পোয়ে। একজন বর্মি। বহুকাল আগে বর্মার মৌলমিন থেকে সেলুলার জেলে কয়েদ খাটতে এসেছিল। ভারত স্বাধীন হবার পর আর সে বর্মায় ফিরে যায়নি, আন্দামানেই থেকে গেছে। এখানেই বিয়েটিয়ে করে পোর্টব্লেয়ারের একটা পেনাল কলোনিতে থাকে। তার কাজ হল দক্ষিণ আর মধ্য আন্দামানের দ্বীপগুলো সরকারের কাছ থেকে ইজারা নিয়ে সমুদ্র থেকে সেল তোলা। তার বোটে আছে ক'জন বর্মি আর তামিল ডাইভার, এই ডাইভাররাই জলে নেমে শেল তোলে।

দিন পনেরো-কুড়ি আগে জেফ্রি পয়েন্টে উদ্বাস্তুদের নতুন সেটলমেন্টে পাশের উপসাগরে ওরা শেল তুলতে গিয়েছিল। সেই সময় লা পোয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সে বলেছিল, পোর্টব্লেয়ারের দিকের সমুদ্রে শেল তোলা হয়ে গেলে আবার তারা জেফ্রি পয়েন্টে ফিরে যাবে। ওখান থেকে তাদের গন্তব্য মিডল আন্দামান। বলেছিল তাদের সঙ্গে বিনয়কে সেখানে নিয়ে যাবে।

মিডল আন্দামান! মিডল আন্দামান ওই দ্বীপের কোনও এক রিফিউজি সেটলমেন্টে রয়েছে ঝিনুক। বুকের ভেতর তুমুল আলোড়ন অনুভব করল বিনয়। ব্যগ্রভাবে জিপের ড্রাইভার কালীপদকে বলল, 'গাড়িটা একটু থামাও তো—'

জিপ থেমে গেল। পাশ থেকে শেখরনাথ জিগ্যেস করলেন, 'কী হল বিনয়!' গাড়ি থামানোয় তিনি বেশ অবাকই হয়েছেন।

বিনয় বলল, 'কাকা, আমি এখানে নামব। একটা কাজ সেরে পনেরো কুড়ি মিনিটের ভেতর হাসপাতালে চলে আসছি।'

শেখরনাথ আর কোনও প্রশ্ন করলেন না। জিপ থেকে বিনয় নেমে পড়ল। তারপর ডান পাশের ঢালু রাস্তা দিয়ে সোজা ছোট্ট জেটিটায় পৌঁছে গেল।

লা পোয়ে আর ডাইভাররা তাদের বোটে ছিল না, জেটিতে বসে গল্পসল্প করে অলস মেজাজে সময় কাটাচ্ছিল। বিনয়কে দেখে সবাই উঠে দাঁড়াল।

লা পোয়ে বলল, 'পত্রকারজি (সাংবাদিক), আপনি জেফ্রি পয়েন্টের রিফিউজি সেটলমেন্ট ছেড়ে কবে টাউনে এলেন?'

এখানে টাউন হল পোর্টব্লেয়ার শহর। বিনয় বলল, 'কয়েক দিন হল এসেছি।'

'কোনও কাজে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।' পোর্টব্লেয়ারের আসার কারণটা জানিয়ে বিনয় বলল, 'আপনি বলেছিলেন আমাকে মিডল আন্দামানে নিয়ে যাবেন'

লা পোয়ে বলল, 'ইয়াদ আছে। জরুর নিয়ে যাব। লেকিন—'

'কী?'

'আমরা এখান থেকে দিন-পনেরো পর জেফ্রি পয়েন্টে ফিরব। 'সেখান থেকে মিডল আন্দামান যাব। লেকিন আপনি এখানে থাকলে কী করে আমাদের সঙ্গে যাবেন?'

বিনয় মনে মনে ভেবে নিল। ডাক্তার চট্টরাজ যা বলেছেন, বড়জোর দিন ছয় সাত মোহনবাঁশিকে চেক-আপের জন্য হাসপাতালে যেতে হবে, তারপর সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে জেফ্রি পয়েন্টে ফিরতে পারবে। তাকে নিয়ে শেখরনাথ আর সেও চলে যাবে।

বিনয় বলল, 'আপনাদের জেফ্রি পয়েন্টে যাবার আগেই আমি সেখানে পৌঁছে যাব। আমাকে ফেলে মিডল আন্দামানে যাবেন না কিন্তু।'

লা পোয়ে বলল, 'আপনাকে জবান দিয়েছি। জরুর নিয়ে যাব। ফিক্‌র মাত কিজিয়ে—'

বিনয় লা পোয়ের দু'টো হাত ধরে গাঢ় গলায় বলল, 'অনেক ধন্যবাদ। এখন আমি চলি। জেফ্রি পয়েন্টে আবার দেখা হবে।'

একটু-পর চড়াইয়ের রাস্তা বেয়ে সেলুলার জেলের দিকে উঠতে উঠতে বিনয়ের মনে হচ্ছিল, লা পোয়ে তাকে মধ্য আন্দামানে ঠিকই নিয়ে যাবে, সেখানকার উদ্বাস্তু সেটলমেন্টগুলোতে ঘুরে ঘুরে ঝিনুককে খুঁজে বের করেও ফেলতে পারবে কিন্তু যে মেয়ে তার অতীতকে জীবন থেকে প্রায় মুছে ফেলেছে, অভিমানে, অসম্মানে, তীব্র গ্লানিবোধে বিনয়ের প্রতি যে চরম উদাসীন তার সামনে গিয়ে আবার দাঁড়ালে সে কী করবে? ধিক্কারে, বিতৃষ্ণায় রূঢ়ভাবে হয়তো বলবে, 'তুমি চলে যাও। আর কখনও আমার কাছে এসো না।'

ঝিনুক একের পর এক তীব্র শেল হেনে যতই ক্ষত-বিক্ষত, জর্জরিত করুক, মুখ বুজে সব সইবে বিনয়। ঝিনুককে মধ্য আন্দামান থেকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। আনতেই হবে। এক অদম্য মরিয়া জেদ যেন তার মাথায় চেপে বসতে থাকে।

অলংকরণ: অলয় ঘোষাল

॥ তৃতীয় পর্ব সমাপ্ত ॥

pathagar.net